যখন সম্পাদক ছিলাম

পরিমল গোস্বামী



রূপা অ্যাণ্ড কোং
কলিকাতা : এলাহাবাদ : বম্বাই : দিল্লী

Jakhan Sampadak Chhilam
(When I was Editor)

প্রথম প্রকাশ সেপটেম্বর, ১৯৫৯

মুদ্রাকর ও প্রকাশক :
শতদল গোস্বামী
নবগ্রন্থনা
৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

পরিবেশক :
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ ১
১১ ওক লেন, ফোর্ট, বোম্বাই ১
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী ৬

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

এবং

যাঁরা আমার নামে গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন :

অনিলবরণ ঘোষ, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, আবদুল আজিজ-আমান, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কনক মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, কালিদাস রায় (কবি শেখর), জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), তারকমোহন দাস (ডকটর), দক্ষিণারঞ্জন বসু, নবেন্দু ঘোষ, প্রাণতোষ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র(দু খানা), বনফুল, বাণী রায়, বিনয় ঘোষ(দু খানা), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রায়, মনোজ বসু, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, মায়া বসু, রণজিৎকুমার সেন, রাণু ভৌমিক, লীলা মজুমদার, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ আচার্য, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়

এঁদের সবার উদ্দেশে

ভূমিকা

এখানা আমার পঞ্চম স্মৃতিগ্রন্থ। এ স্মৃতি প্রধানত আমার সম্পাদনা জীবনের, এব নামেই অবশ্য তার প্রকাশ। সম্পাদক ছিলাম ১৯৩২ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত।

পূর্বের চারখানা স্মৃতিগ্রন্থেও আমার সম্পাদনা কালের অনেক কথা আছে, কারণ আমার সম্পাদনা জীবনের ৩২ বছরের অংশটি আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, এবং এ বইতেও আমার জীবনের অন্য অনেক কথা বলেছি, কারণ এ সময়ে আমি পরিমল গোস্বামীও ছিলাম।

সম্পাদনা কালের দীর্ঘ ৩২ বৎসরে যা দেখেছি, যা জেনেছি, তারই বিচিত্র ছবি এতে আছে। মাঝে মাঝে কিছু চিন্তাও কবতে হয়েছে, তা ছাড়া সমালোচনা (আত্মসমালোচনাও) তো স্বভাবতই আছে। আক্রমণও বেশ আছে, তবে তা ব্যক্তিগত নয় খুব।

এতে অনেক অ্যানেকডোট আছে, এবং যাই থাক—মহা কৌতুককর অথবা মহা মর্মান্তিক, সে সবকে বিধৃত করে এবং তা অতিক্রম করেও হয় তো কিছু আছে। নানা ছবিব ভিতর দিয়ে সমকালের কোনো একটা দিকের একটা রূপ অবশ্যই ফুটে উঠেছে। এক সমালোচক বলেছিলেন (আমার 'আমি যাঁদের দেখেছি' সমালোচনা উপলক্ষে) যে, আমার আদর্শবাদ কিছুই নেই। এটা প্রশংসা না নিন্দা তা বোঝা আমার সাধ্য নয়। সেই বই তো কথায় গড়া নানা ব্যক্তির ফোটোগ্রাফ মাত্র, তার মধ্যে আদর্শবাদের স্থান আমি খুঁজে পাইনি। ও জিনিস আমাব নেই বলেই মনে হয়।

আমার স্মৃতি কিন্তু ১৯৬৪তেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, স্মৃতি বর্তমান ১৯৭৩ পর্যন্ত মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়েছে। সে সবই প্রসঙ্গত এসেছে। তবু অনেক কথা অনুক্ত রইল। সে সব পরে আরম্ভ করব।

মাসিক বসুমতীর (যার আয়ু শেষ হয়েছে আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৯) সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী সেনের আগ্রহে এ স্মৃতিকথার জন্ম, এবং আমার প্রথম দশটি অধ্যায় তাতে মুদ্রিত হয়েছিল (দশম অধ্যায় ছাপা হয়েও প্রকাশিত হয়নি, কারণ সে সংখ্যাটিই প্রকাশিত হয়নি)। পরবর্তী অধ্যায়গুলি প্রেসের তাগাদায় অবিরাম লিখে যেতে হয়েছে, কারণ ইতিমধ্যে বই ছাপা আরম্ভ হয়েছিল। প্রুফ দেখার ভার ছিল সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর উপর, ১৭৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সে দেখেছিল, তারপর ১৪-৭-৭৩ তারিখে তার হঠাৎ অকাল মৃত্যু ঘটল। বাকি প্রুফ ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে আমাকেই দেখতে হয়েছে। তিনটি ভুলের কথা অন্যত্র উল্লেখ করেছি। আর একটি বাকি ছিল বলা—২৮৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ইংরেজি কবিতাটির লেখকের নাম হবে R. Bates, (R. Batas নয়)।

১সি, গোপালচন্দ্র বসু লেন,
কলিকাতা ৭০০০৫০

পরিমল গোস্বামী

পরিমল গোস্বামী রচিত গ্রন্থ তালিকা

১৯৩৬—১৯৭৩

ছোটগল্প, বড়গল্প

বুদ্বুদ ১৯৩৬
ট্রামের সেই লোকটি ১৯৪৪
ব্ল্যাক মার্কেট ১৯৪৫
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গগল্প ১৯৫৪
মারকে লেঙ্গে ১৯৫০
বারোভূতের আসর ১৯৬২
ডিটেকটিভ শিবনাথ ১৯৪৪
শুভবিবাহ ১৯৬৯
বেনামী চিঠি ও হীরের আংটি ১৯৭১

স্মৃতিকথা

স্মৃতিচিত্রণ ১৯৫৮
দ্বিতীয় স্মৃতি ১৯৬২
আমি যাঁদের দেখেছি ১৯৬৯
পত্রস্মৃতি ১৯৭১
যখন সম্পাদক ছিলাম ১৯৭৩

প্রবন্ধ রম্যরচনা ভ্রমণ

ম্যাজিক লণ্ঠন ১৯৫৫
সপ্তপঞ্চ ১৯৫৭
ইতস্ততঃ ১৯৬২
আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় ১৯৬৯
রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান ১৯৭০
পথে পথে ১৯৫৬

নাটক

দুষ্মন্তের বিচার ১৯৪১
ঘুঘু ১৯৪১
দণ্ডপ্রলয় ১৯৬৮

অনুবাদ

বারট্রাণ্ড রাসেল :
সুখের সন্ধানে ১৯৬০
আর. বীড :
ইংরেজ ডিটেকটিভের চোখে
প্রাচীন কলকাতা ১৯৬৭

ফোটোগ্রাফি

ক্যামেরার ছবি ১৯৪২
আধুনিক আলোকচিত্রণ ১৯৫১

কিশোর পাঠ্য

আষাঢ়ে দেশে ১৯৪৪
মেরুপথের যাত্রীদল ১৯৫৭
স্কুলের মেয়েরা ১৯৫৮
রোল নম্বর ২০৫, ১৯৬২

সম্পাদিত গ্রন্থ

মহামন্বন্তর ১৯৪৪
ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী ১৯৫৮

এ বইতে যা আছে

সম্পাদক রূপে শনিবারের চিঠিতে যোগদান, পূর্ব শনি-মণ্ডলের কথা, উদ্ভট ব্যক্তিগত ও বারোয়ারি ছদ্মনাম, নানা-আক্রমণে হাতে খড়ি, নবাগত বনফুলের সর্বাত্মক সহযোগিতা, তারাশঙ্করের যোগদান, মোহিতলালের বিরামহীন উৎসাহ, রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতার উৎস, শরৎচন্দ্রকে যৌথ আক্রমণ, দেবদাসের প্যারডি, রেডিওতে সাপ্তাহিক সিনেমা-থিয়েটার আলোচনা, সচিত্র ভারত সম্পাদনা, সচিত্র ভারত আক্রমণ কথা, অলকা সম্পাদনা, নূতন-পত্র সম্পাদনা, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, মহামন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ-সাহিত্য সম্পাদনা, বাংলার শিক্ষক সম্পাদনা, যুগান্তরে যোগদান, চার্লি চ্যাপলিন ও স্টিফেন লীককের প্রভাব, একটি বিশিষ্ট হনুমানের প্রভাব, নিখিলচন্দ্র দাসের সাহিত্যিকশিল্পীঘাতী ও আত্মঘাতী হাসি, জগদীশচন্দ্রের 'গাছের প্রাণ' আবিষ্কার বিষয়ে ব্যঙ্গ, মেয়েদের বয়স লুকানো বিষয়ে একটি প্রবন্ধের সূত্র ধরে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া ও তাতে উৎসাহ দান, শূলে চড়ে নলিনীকান্ত সরকারের গান গাওয়া, ভূত দেখা পর্যায়, ছাপার ভুলের কৌতুক, পাগলদের চিঠি, লেখা ছাপানোর জন্য ইংরেজি দরখাস্ত, বিবাহপ্রার্থীদের করুণ আবেদন, এ পুস্তক রচনাকালের মধ্যে যে সব বন্ধুর মৃত্যু ঘটল তাদের কথা, অ্যামেরিকার উচ্চশিক্ষা, বিলেতের নিম্ন শিক্ষা ও আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার কথা, কয়েকটি ভ্রমণ কথা, ইলিশমাছের সেকাল ও একাল, স্বামীকে প্রকাশ্যে 'মুখপোড়া' বা অন্য কি নামে ডাকা যায়, রেডিওর ভাষা ও ইডিয়ম ইত্যাদি শতরকম বিষয় বৈচিত্র্য।

নাম সূচী

স

হ

যখন সম্পাদক ছিলাম

যখন সম্পাদক ছিলাম

॥ এক ॥

স্মৃতিমূলক কিছু লিখতে বসলে প্রাণতোষ ঘটকের কথা আগে মনে পড়ে। শুধু তার সনির্বন্ধ চাপে পড়ে আমি আমার প্রথম স্মৃতিকথা (স্মৃতিচিত্রণ) ও দ্বিতীয় স্মৃতিকথা (দ্বিতীয় স্মৃতি) মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকি। আর তারই ফলে পর পর চার খানা বই আমার প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য আমার তৃতীয় স্মৃতিকথা (আমি যাঁদের দেখেছি) সাপ্তাহিক বসুমতীর তৎকালীন সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী সেনের আগ্রহে ছাপা হয়েছিল ২১ সপ্তাহ ধরে। মাসিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী—এই দুটি সাময়িকপত্রই আমার সমস্ত নির্দেশ সযত্নে পালন করেছে, অনেক সময় লেখা নির্দিষ্ট পরিসর বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে, তবু আমার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠাসংখ্যা বিষয়ে কোনো কৃপণতা করা হয় নি।

স্মৃতিচিত্রণ যখন মাসিক বসুমতীতে ছাপা হয়, তখন তার প্রতিটি কিস্তির সঙ্গে, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নিপুণ শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার দুতিনখানা করে ছবি এঁকে আমার লেখাকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিল অনেকখানি। আমার চতুর্থ স্মৃতিকথা (পত্রস্মৃতি) কোনো কাগজে সবটা প্রকাশিত হয় নি। দেশে একটি ও অমৃত সাপ্তাহিকে তার তিনটি অধ্যায় ছাপা হয়েছিল।

সাপ্তাহিক কাগজে (সুরাজ, পাবনা) মাঝে মাঝে "স্থানীয় সংবাদ" লিখেছি যখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম, তখন। বোধহয় ১৯১২ বা ১৩ সন হবে। সে লেখার সাহিত্যমূল্য শূন্য। শুধু লেখা, ছাপার অক্ষরে নাম দেখার আনন্দ ও একখানা কাগজ বিনামূল্যে পাওয়ার গর্ব। এই সময়েই আমার পিতার নির্দেশে ও শিক্ষায় প্রুফ দেখার কাজ ভালভাবেই শিখি,

যখন (১৯১৩) তিনি তাঁর শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতার ছন্দানুবাদ পুস্তকাকারে (গীতাবিন্দু নামে) ছাপছিলেন। ছাপা হত কলকাতায়। প্রুফ যেত ডাকে। বাবা প্রুফ দেখতেন ও আমাকে শেখাতেন। প্রসঙ্গত বলি, সেই শিক্ষার ফলে আমার প্রথম সম্পাদিত একখানা বার্ষিক (রূপ ও লেখা, ১৯৩২) পত্রিকায় ছাপার ভুল ছিল না। এবং আমার প্রথম গল্পের বইতে (বুদ্‌বুদ, ১৯৩৬, রঞ্জন প্রকাশালয়) দেখছি একটিমাত্র ভুল আছে। তারপর অনেক বইই ছাপা হয়েছে, এবং যত দিন যাচ্ছে তত শেষ দিকের বইতে ভুল বেশি চোখে পড়ছে। এখন নিজের লেখার প্রুফ দেখতে অনেক ভুল দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, কিন্তু অন্যের বই হলে ভুল বার করার পটুত্ব একই রকম আছে।

১৯২০—২৭ পর্যন্ত নানাবিধ ছোটবড় কাগজে লিখতে আরম্ভ করি, ছোট ছোট স্কেচ। বড় কাগজ বিচিত্রায় প্রবন্ধ লিখি ১৯২৬ সনে। ১৯২৭ সনে (চৈত্র ১৩৩৩) মাসিক বসুমতীতে প্রথম একটি বড় ব্যঙ্গ গল্প ছাপা হয় (পরে তা বসুমতী সিলভার জুবিলী সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল)। এ দীর্ঘ ইতিহাস এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। লেখার পথেই যে ক্রমে এগিয়ে আসছি এতে বোঝা যায়। এর পর ১৯৩১ সনের শেষ দিকে ফরিদপুরের ২৪ বছর বয়সের জেলখাটা কংগ্রেসকর্মী জমিদার লাল মিয়া (চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন) আদেশ করলেন বার্ষিক পত্র একখানা সম্পাদন করতে হবে। সম্পাদিকার নাম থাকবে জাহান-আরা বেগম চৌধুরী। তখন ২নং লায়ন্স রেঞ্জে চৌধুরী, দত্ত (ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ অ্যাঃ কম্পানির চীফ এজেন্টস) কম্পানির অফিসে আমি কাজ করি। তাঁদের বীমা-পুস্তিকা প্রস্তুতের কাজ, ইংরেজী থেকে বাংলা করা এবং প্রতিষ্ঠানের নানাদিকের গুণগান করা। লাল মিয়া এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। অতএব তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে হল। আমি যখন বীমা-বই সম্পাদন করি, তখন সাহিত্যপত্র সম্পাদন করতে পারব না কেন, সম্ভবত যুক্তিটা ছিল এই। বীমার বই লেখা স্থগিত রইল কিছুদিন।

শেষ পর্যন্ত বার্ষিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হল ১৯৩২এর গোড়ায়। প্রত্যেক লেখকের ফোটোগ্রাফ ছাপা হয়েছিল লেখকদের রচনার সঙ্গে। সেই বার্ষিক পত্রিকাখানা আমার নেই, থাকলে তা থেকে অনেক সংবাদও বোধ হয় পাওয়া যেত আমায় এই লেখার উপকরণরূপে।

এ সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল লাল মিয়াকে কেন্দ্র করে, তা আর প্রকাশ করা চলবে না। তবে সম্পাদনা সূত্রে আমি নিজে যেটুকু সম্পর্কিত, তার সঙ্গে তা যুক্ত নয়, যদিও উপলক্ষটা একই।

আমি থাকি তখন রজনী ফারমাসির পিছনে একটি ঘর নিয়ে। রজনী ফারমাসি আমার এক বন্ধু ডাক্তার চালাতেন। হ্যারিসন রোডের সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রীট যেখানে কেটে গেছে, তারই কাছে।

একদিন প্রুফ দেখছিলাম, এমন সময় দীর্ঘদেহ এক যুবক এলেন। নাম বললেন, জসীমউদ্দীন। তাঁর সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল না, যদিও তিনি বহু পরিচিত নাম। তাঁর কবিতা পেয়েছিলাম লাল মিয়ার কাছ থেকে। এবং লাল মিয়া বলেছিলেন, জসীমউদ্দীন নিজে প্রুফ দেখতে চান।

পরিচয় হল সেদিন। বললেন, "আমার প্রুফ কি তৈরি হয়েছে?" আমি বললাম, "আপনি দেরি করে এসেছেন, আমি আগেই দেখে দিয়েছি।" তিনি বললেন, "আপনি নতুন লোক, তাই আমার নিজের একবার দেখা দরকার।" বললাম, নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি খুব ভাল করে দেখে দিয়েছি। কিছু বানান বদলও করেছি। যেমন 'আমি' কথাটি দুতিন জায়গায় 'আমী' লিখেছিলেন, আমি ঠিক করে দিয়েছি।" কবি লজ্জিত হলেন। বললেন, "তাই নাকি? যাক আপনি যখন দেখে দিয়েছেন তখন আর আমার দেখার দরকার নেই।"—এ রকম বানান সম্ভবত পল্লীগীতি সংগ্রহ বা নকলের ফলে।

আমি এ পথে যে সম্পূর্ণ নতুন নই, তা হয় তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আমি অবশ্য নিজের দায়িত্বেই ঐ সব বদল করেছিলাম। শুনেছিলাম জসীমউদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক। তিনি এম-এ পাস ছিলেন। তারপরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এবং আমাদের ভিতরে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁকে শেষ দেখেছি শিশিরকুমার ভাদুড়ির শ্রীরঙ্গমের গ্রীনরুমে—১৯৫১ বা ৫২ সনে। বেশ সদাশয় সরলপ্রাণ এবং ভাল মানুষ রূপেই তাঁকে মনে রেখেছি। শিশিরকুমারকে এই কবি যে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন তা নিজ চোখেই সেদিন দেখলাম। তাঁর পায়ে মাথা নত করে প্রমাণ করলেন জসীমউদ্দীন। দুজনেই শিল্পী

এর মধ্যে তখনকার অপেক্ষিত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির স্থান কোথায়? জসীমউদ্দীনের মনে তা কোনো দিনই ছিল না।

জীবনে যা কিছু ঘটেছে তারই অব্যবহিত পিছনে নানা ঘটনার অপরিকল্পিত যোগাযোগ থাকে। জাহান-আরার রূপ ও লেখা উপলক্ষ করে অনেক নতুন লেখকের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। তার মধ্যে সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে আগে সামান্য পরিচয় ছিল। ১৯৩১ সন ও পরের ঘটনা এসব। তার আগে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত উপাসনা মাসিকের আমি প্রায় নিয়মিত লেখক। উপাসনার মালিক তখন সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। উপাসনা উপলক্ষেই আমার পরিচয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হয়েছিল। শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের স্থাপিত মেট্রোপলিটান ইনশিওর‍্যানসের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে এমন কিছু মন্তব্য শনিবারের চিঠিতে করেছিলেন। সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গে এই উপলক্ষে সজনীবাবুর যোগাযোগ ঘটে। শেষ পর্যন্ত সজনীবাবুকেই ডেকে উপাসনা সম্পাদনের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। সজনীবাবু উপাসনার নাম বদল করে রাখলেন বঙ্গশ্রী। এটি ১৯৩২ সনের ঘটনা।

১৯৩১ সনে আমার পিতার মৃত্যু ঘটে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রবাসীতে ছাপার জন্য রবীন্দ্রনাথ মৈত্র আমাকে উৎসাহিত করেন। এবং আমি তাঁর নির্দেশে একটি লেখা তৈরি করলে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র আমাকে প্রবাসীতে তখনকার সহকারী সম্পাদক সজনীবাবুর কাছে নিয়ে যান। এই উপলক্ষে সজনীবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় এবং তা আধঘণ্টা কাল স্থায়ী। প্রবাসী ১৩৩৮ ভাদ্র সংখ্যায় আমার পিতা বিহারীলাল গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ফোটোগ্রাফ সহ ছাপা হয়। তাঁর প্রসিদ্ধ হাতের লেখার নমুনা ও রবীন্দ্রনাথ আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাও এই সঙ্গে ছাপা হয়।

আর এদিক থেকে রূপ ও লেখা সম্পাদনা উপলক্ষে সজনীবাবুর সঙ্গে নতুন করে পরিচয়। কিরণকুমার রায় সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্নের সহকারী সম্পাদক ছিল, বঙ্গশ্রীতে সজনীবাবুরও সহকারী রূপে সে রয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ও কিরণকুমার এই দুজনেই আমার পরম বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র আমার আত্মীয়ও ছিলেন, এবং কিছুকাল একই গ্রামে বাস করেছি আমরা। ১৯৩২ সনে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আমাদের পক্ষে বিষম দুঃখের

কারণ হয়েছিল। তাঁর থার্ড ক্লাস প্রভৃতি বইতে সাধারণ মানুষকে নিয়ে লেখা সব গল্প এখন হয় তো কারো জানা নেই। তাঁর মানময়ী গার্লস স্কুল মঞ্চে অসাধারণ সাফল্য লাভ করায়, নতুন উৎসাহে তিনি আরো নাটক লিখবেন, এমন সময় মৃত্যু এসে জীবনের মধ্যপথে যবনিকা টেনে দিল।

আমার সম্পাদন ক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের প্রস্থান আমার মনে একটা গভীর বেদনাময় স্মৃতি রেখে গেছে। ১৯৩২ সনের নবেম্বরে সজনীকান্ত বঙ্গশ্রী অফিসে আমাকে অন্তরালে ডেকে বললেন শনিবারের চিঠির ভার আপনাকে নিতে হবে। এসব কথা আমি অন্যত্র বলেছি। তবে কিভাবে কত ঘটনার ভিতর দিয়ে এই যোগাযোগ ঘটল, কিভাবে কিরণ-কুমার রায় সজনীবাবুর ইচ্ছাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিল, সে সব কথা বিস্তারিত বলবার দরকার নেই। শনিবারের চিঠির মতো তখনকার বহু পরিচিত, এবং পাঠকমহলে সাড়া জাগানো, মাসিকের সম্পাদক হয়ে গেলাম হঠাৎ। এ মাসিকের আর্থিক অবস্থা তখন খুব ভাল ছিল না, কিছু দেনাও ছিল। কিন্তু দুজন অতি নিষ্ঠাবান কমপোজিটার এবং প্রবোধ নান নামক অতি নিষ্ঠাবান সহকারী পেয়ে নিশ্চিন্ত এবং খুব উৎসাহিত বোধ করেছিলাম।

শনিবারের চিঠির ধারা কিছু পরিমাণ বজায় রাখা খুব কঠিন হয়নি, কারণ আমাকে সাহায্য করার জন্য শনিমণ্ডলের অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। এবং ঐ মাসিককে ঘিরে কি উৎসাহ, কি প্রাণোচ্ছলতা, তার প্রথম স্বাদ গ্রহণ করলাম ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশের সময় থেকে। আমি অগ্রহায়ণ মাসেই এসে গিয়েছি শনিবারের চিঠিতে—পৌষ সংখ্যা থেকে আমার নাম সম্পাদকরূপে ছাপা হল। অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত (১৩৩৯) সম্পাদক সজনীকান্ত। কিন্তু ঐ সংখ্যাতেই আমি লিখলাম 'প্রসঙ্গ কথা।' এই সংখ্যাটিতে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধ লেখেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। আমি প্রসঙ্গ কথায় এ বিষয়ে আরো রচনা আহ্বান করলাম এবং শেষ দিকে আলোচনা করলাম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্য প্রকাশিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা নিয়ে। তখন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মতো শক্তিমান

যুক্তিবাদী লেখক বাংলায় কমই দেখেছি। আর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনবিংশ শতক ছাড়া অন্য ধ্যান ছিল না।

পৌষ (১৩৫৯) সংখ্যায়, সজনীকান্ত শনিবারের চিঠির সম্পাদন-ভার আমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন কেন, এই সব কথা উপলক্ষে শনিবারের চিঠির কিছু ইতিহাস বিবৃত করলেন। পৌষ সংখ্যায় নৌকাখণ্ড নামক একটি গল্প ও সংবাদ সাহিত্যের কিছু অংশ লিখলাম। ক্রমে শনিবারের চিঠির ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় ঘটল। দেখলাম সজনীকান্ত কিংবা তাঁর পূর্ববর্তীরা কেউ অন্নদাশঙ্করকে 'খোকা হাকিম' ও দিলীপকুমারকে 'পাগলা জগাই' নামে অভিহিত করতেন। গুরুসদয় দত্তের নাম হয়েছিল রায়বেঁশে দত্ত। পছন্দ না হলেও আমাকেও এই সব নাম মাঝেসাঝে ব্যবহার করতে হত শনিবারের চিঠির ধারা ও চরিত্র বজায় রাখার জন্য। ইতিহাস হিসাবে এ সব বিবৃত করছি আজ। এবং কোন্ জাতীয় নিম্ন রুচির সাহিত্যকে কিভাবে ব্যঙ্গ করা হত তারও অনেকখানি নমুনা আমি দেব। কারণ এ সব "সংবাদ সাহিত্য" আর কখনো যে পুনর্মুদ্রিত হবে এমন সম্ভাবনা নেই। অথচ শনিবারের চিঠি পাঠকমহলে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল কেন, তার কথা এ যুগের পাঠকের জানবার কথা নয়। ৪০ বছর আগে যে সাহিত্য নিয়ে ব্যঙ্গ করা হত, ৪০ বছর পরে সে সাহিত্য আর পাঠককে অবাক করবে না, কারণ, শুনেছি, এবং কাগজে আদালত পর্যন্ত গড়ানোর যে সব রিপোর্ট পড়ি, তাতে মনে হয় সে রুচির বদল ঘটেনি, এবং আমাদের মতে তখন এবং এখনও যা নিম্ন রুচির এবং সাহিত্য হিসাবে উঁচুদরের নয়, সেই আমাদের দলভুক্ত রুচির মানুষ এখন অল্পই অবশিষ্ট আছে। সেজন্য আমি অন্তত এখনকার কোনো উপন্যাস ভয়ে পড়ি না। এটি ভাল বা মন্দ, অথবা আমি খুব ন্যায়সঙ্গত কাজ করছি, তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মানসিক গঠন ও রুচির কথা, এবং এর মধ্যে সৎ সাহিত্য কাকে বলে বা অসৎ সাহিত্য কাকে বলে, তার বিচারের প্রশ্নও নেই। সাহিত্যের সংজ্ঞার প্রশ্নও নেই। কারণ আমি যা পড়িনি তার বিচারও করব না। সাহিত্যের নিজস্ব একটি ধর্ম আছে, সেই ধর্মে দীক্ষিত হলে যে-কোনো বিষয়বস্তুই সাহিত্যের উপকরণ হতে পারে এইটি আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে আমি অনেকটা অস্কার ওয়াইলডের মতের পক্ষপাতী। দি পিকচার অভ

ডোরিয়ান গ্রে নামক উপন্যাসের ভূমিকায় এক স্থানে তিনি বলেছেন: There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written. That is all. এ কথাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে কোন্ বই ভালভাবে লেখা আর কোন্ বই খারাপভাবে লেখা, তার বিচার নিয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে যত বাদবিসংবাদ।

যাই হোক, আজ তা অতীত, এবং যে ধরনের মন্তব্য করা হত এই সব লেখা নিয়ে, তাও এখন আর নেই, সেই কথা ভেবে যথাসময়ে সেই দিনের কিছু নমুনা দেব। এর মধ্যে মন্তব্য পাওয়া যাবে নানা শ্রেণীর—তিক্ত মন্তব্য, কষায় মন্তব্য, ক্রুদ্ধ মন্তব্য এবং বিশুদ্ধ কৌতুকজনক মন্তব্য। তবে ক্রুদ্ধ মন্তব্য খুবই কম, এবং প্রথমেই বলে রাখি, যে শ্রেণীর মন্তব্যই হোক, তা শেষ পর্যন্ত প্রায় যান্ত্রিক হয়ে পড়েছিল, এবং ব্যক্তিত্বকে আক্রমণ ছিল দু এক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকারণ। আবার কৌতুক সৃষ্টির জন্য অখ্যাত অজ্ঞাতজনের কাঁচা লেখাও অনেক সময় বেছে নেওয়া হত।

একটি ক্ষেত্রে, আমার শনিবারের চিঠিতে যোগ দেওয়ার আরম্ভেই একটি ঘটনা ঘটেছিল, যাতে সমালোচনার নামে আক্রমণটা অতি নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। এতটা দরকার ছিল না। কিন্তু তখন উদ্দীপনা উগ্র, বয়স অনুকূল, পাঠকবর্গের উৎসাহ অন্তহীন, এবং অধিকাংশ আক্রমণই ছিল দলীয় যৌথ প্রেরণাজাত। এই আক্রমণ হয়েছিল লেখিকা আশালতা সিংহের উপর। তাঁর সঙ্গে বনফুলের ও আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। স্বামী দ্বিজেন সিংহ ভাগলপুরে ডাক্তার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক এবং সৎলোক। তাঁর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার আজও স্মরণ করি। আশালতা সিংহ এখন সন্ন্যাসিনী এবং এই নতুন বেশেই তাঁকে ১৯৬৩, ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কথাশিল্পী বন্ধুবর সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের টালিগঞ্জের বাড়িতে দেখেছি। তিনি তখন অন্য জগতের মানুষ। সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল বাণী রায়, বারি দেবী, মায়া বসু। শুনলাম দ্বিজেনবাবুও একই পথের পথিক হয়েছেন, অর্থাৎ স্বামীজি হয়েছেন।

তাই অনুমান করি তাঁরা এখন সকল উত্তেজনার ঊর্ধ্বে। এবং সেই ভরসাতেই সেই প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা কিছু কিছু পুনরায় উল্লেখ

করছি। আশালতা এমন বিষয়বস্তু ও ভঙ্গিতে গল্প লিখতেন এবং এমন লেখা অনুকরণ করতেন, যে-বিষয়বস্তু ও ভঙ্গি এ যুগেও হয়তো আপত্তিকর বোধ হবে। এবং যাঁকে অনুকরণ করতেন, অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুকে, তিনিও পূর্ব থেকেই ছিলেন শনিবারের চিঠির আক্রমণের লক্ষ্য। তবু হয়তো আক্রমণটা এমন যৌথ এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির হত না, যদি দ্বিজেনবাবুর ইচ্ছা অন্যরকম হত। তাঁকে আমি বলেছিলাম, আপনার স্ত্রীকে অতটা দুঃসাহসী হতে একটু নিষেধ করুন না? অকারণ তিনি আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছেন কেন?

দ্বিজেনবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, একটু গাল দিন না? তাঁর মুখে এমন কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম, এবং দুঃখিতও হয়েছিলাম স্বভাবতই, কারণ আমি আশা করেছিলাম তিনি আমার অনুরোধ রাখবেন। কিন্তু দেখলাম দ্বিজেনবাবুর ইচ্ছা আশালতাকে শনিবারের চিঠিতে একটু গাল দেওয়া হোক।

অতএব দেখতে ইচ্ছা হল, শেষ পর্যন্ত এর পরিণাম কি দাঁড়ায়।

আগের আর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বলি। আমি তখন ভাগলপুরে—১৯৩৩ সনের কথা। আশালতা আমাকে একটি গল্প পাঠালেন, গল্প সম্পর্কে আমার মতামত জানতে। গল্পের নাম স্পেশালিজেশন। আমি আমার মতামত তাঁকে একটা দীর্ঘ চিঠিতে জানিয়েছিলাম। সে চিঠির একটা অসম্পূর্ণ খসড়া কপি আমার কাছে আছে। তার আরম্ভের কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি—

"গল্পটির নাম 'স্পেশালিজেশন', এবং এই কথাটার যা মানে দাঁড়ায় অর্থাৎ কোনো বিশেষ বিদ্যার বিশেষ চর্চা করে বিশেষজ্ঞ হওয়া, এই রকম কোনো স্পেশালাইজেশন-বিরোধী ভদ্রলোককে নিয়ে গল্পটি লেখা।—ফিজিকসের এম-এ নরেন যখন বলে আমি specialisation মানি না, তাই আমি প্রসাধন মানি, তখন কথাটা হাস্যকর মনে হয়। কেননা কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার সঙ্গে প্রসাধন বিলাসের কোনো বিরোধ নেই।—একটা লোক প্রসাধনবিলাসী হলে তার সঙ্গে তার গবেষণা বিষয়ের কোনো সংঘাত ঘটে না—ইত্যাদি। ধীরে ধীরে যুক্তি এগিয়ে চলল আমার চিঠিতে।

মোট কথা আমার বক্তব্য ছিল এই যে, প্রসাধন ব্যাপারটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার. আর গবেষণার কাজ ব্যক্তিরুচি নিরপেক্ষ। কাজেই কেউ যদি পদার্থবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করতে থাকে এবং সেই লোকটা যদি ডিম খায়, তা হলে সে একথা কখনো বলে না যে, আমি স্পেশালাইজেশন মানি না, তাই ডিম খাই। স্পেশালাইজেশন হতে পারে একই বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে। নানা অধীত বিষয়ের মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে কেউ স্পেশালিস্ট হতে পারে। শাখাপ্রশাখা অনেক হতে পারে, কিন্তু সাঁতার কাটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। গল্পটা এখন মনে নেই, কিন্তু তার নামেই তো প্লটের সঙ্গে অসঙ্গতি চোখে পড়ল। তাই লেখিকাকে আমার মন্তব্য সহ লেখাটি ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ভাগলপুরে বসেই।

কিছুদিন পরে দেখি প্রবাসী মাসিকে সেই গল্পটি একটি কথাও বদল না করে ছাপা হয়েছিল। অবশ্য বিখ্যাত মাসিকে ছাপা হওয়ার অর্থ এ নয় যে, আমার যুক্তিতে অন্যায় ছিল। এটি লেখিকার একটি চ্যালেঞ্জ রূপে দেখা দিয়েছিল। মনে কিছু ক্ষোভেরও সঞ্চার হয়েছিল সন্দেহ নেই।

বনফুলের সঙ্গেই দ্বিজেন্দ্র সিংহ ও আশালতা দেবীর পরিচয় দীর্ঘদিনের। দ্বিজেনবাবু ও বলাইচাঁদ দুজনেই ডাক্তার এবং ভাগলপুরবাসী। আমি সেখানে তখন আগন্তুক মাত্র। কিন্তু বনফুলকে উস্‌কে দিলে তার উৎসাহের অন্ত থাকে না। যেমন তাকে সাহিত্যবৃত্তিতে উস্‌কানি দেওয়াতে লেখা দিয়ে সে ক্রমে বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলেছে, তাকে এখন ঠেকানো দুঃসাধ্য, তেমনি আশালতা দেবীর বিষয়ে তাঁর স্বামীর উক্তি অর্থাৎ "একটু গাল দিন না ?"—শুনে বনফুল আস্তিন গোটাল। সজনীকান্তও পিছিয়ে রইলেন না।

আশালতা দেবীর লেখা তখন যত অশ্লীল মনে হয়েছে, বনফুলের আক্রমণও তত উগ্র হয়ে উঠেছে। এখন মনে হয় এতটা দরকার ছিল না, কারণ যে কৃত্রিম ভঙ্গির অপমৃত্যু অনিবার্য, তাকে আঘাত করে লাভ কি ? কিন্তু সে সময় আঘাত হানার মধ্যে একটা আনন্দ ছিল। আমিও এই পথে নবদীক্ষিত। ন্যায়-অন্যায় বিচারের ধৈর্য কমই ছিল।

এ সময় কল্পিত বিরোধী পক্ষের সবার লেখা নিয়েই রঙ্গ রহস্য করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বাদ যান নি। অচিন্ত্য, প্রেমেন, প্রবোধ সান্যাল, বুদ্ধদেব তো ছিলেনই, তাছাড়া অজ্ঞাত অখ্যাত কত লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি

দিয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন। এ সবই আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো বিরোধিতা দূরের কথা, তাঁর প্রতি আমার আবাল্য শ্রদ্ধা কখনো ম্লান হয় নি। মোহিতবাবুরা পূর্ব থেকেই তাঁর বিরোধিতা করে আসছিলেন, কারণ অজ্ঞাত। ব্যক্তিগত কারণ কিছু ছিল মনে হয়। তিনি শনিবারের চিঠির বিরোধী নতুন লেখকদের অনেকের ক্ষমতা আছে স্বীকার করাতেই হয় তো।

বুদ্ধদেব বসু ক্ষমতাশালী কবি, তিনি তখন কয়েকজন ইংরেজ ও ফরাসী লেখকের 'আধুনিকতা'য় বিশ্বাসী হয়ে বাংলা ভাষায় সেই আধুনিকতা প্রচলনের এক্সপেরিমেণ্ট করছিলেন গল্পে। এবং যে একটি বিষয়ের বিতর্ক সাহিত্যিক মহলে, অথবা সমাজ-বিজ্ঞানী মহলে, এখনো চলছে—অর্থাৎ যৌন শিক্ষা ছেলেদের সোজাসুজি দেওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর যে মত ব্যক্ত হয়েছিল তাতে বোঝা যায়, তিনি এর সপক্ষে। এ সব নিয়েও তখন খুব ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। এ সবই ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার। মতে না মিললেই যে তা ভুল একথা এখন আর জোর করে বলি না।

আশালতা সিংহ বুদ্ধদেব বসু প্রচারিত মতে ঘোর বিশ্বাসী হওয়াতে তিনি আরো বেশি করে আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন। এবং তিনি এ সব মতবাদের অন্ধ অনুকরণ করতেন ব'লেই সবাই ক্ষুব্ধ। আমার মনে হয় দ্বিজেনবাবু মনে মনে এসব পছন্দ করতেন না, তাই তিনি আমাকে তাঁর বিরুদ্ধে লিখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি আশা করি জীবিত আছেন, যদি ইচ্ছা হয়, তবে আসল সত্য কি তা প্রকাশ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গ পরে আবার আসবে।

এই লেখিকার বিষয়ে এতটা লেখার কারণ এই যে, আমার সময়েই এর আরম্ভ হয়েছিল। এঁদের প্রচারে দিলীপকুমার রায়ও যোগ দিয়েছিলেন। তিনি আশালতা সিংহের লেখার একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন এবং সে কথা তিনি ছাপার অক্ষরে লিখে প্রকাশ করেছিলেন। ১৩৩৯-৪০ সালের শনিবারের চিঠির অনেকগুলি সংখ্যাতেই সে সবের উদ্ধৃতি আছে।

যোগানন্দ-নীরদচন্দ্রের আমলে, অশ্লীল ও নিম্নরুচির লেখা কয়েক পৃষ্ঠা করে নানা লেখা থেকে শনিবারের চিঠিতে ওঁরা ছেপে দিতেন। তার সাধারণ শিরোনাম ছিল মণিমুক্তা। এই সব মণিমুক্তার সঙ্গে কোনো মন্তব্য থাকত না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রুচির মান কত নেমে গেছে সবাইকে তা একসঙ্গে দেখানো। ফল যে কিছু বিপরীত না হয়েছিল এমন নয়। অর্থাৎ যাবতীয় অশ্লীল রচনার অংশ এক সঙ্গেই শনিবারের চিঠিতে পাওয়া যেত বলে ঐ সব কাগজ অপেক্ষা শনিবারের চিঠির বিক্রি তখন বেশি হত।

রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তার নিচে মন্তব্য জুড়ে দেওয়া প্রধানত সজনীবাবুর সময় থেকে আরম্ভ হয়। এবং সব সময় তা যে অসৎ সাহিত্য থেকেই নেওয়া হত তা নয়। বিশুদ্ধ কৌতুক সৃষ্টির জন্য অনেক রচনাংশ নেওয়া হত, তা নিয়ে সরস মন্তব্য লেখার সুবিধা হত বলেই। এই জাতীয় টিপ্পনি লেখায় সজনীকান্ত পুরো ওস্তাদ ছিলেন। আবার ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য এবং আক্রমণে ধরাশায়ী করার জন্য যে সব হাঁড়ির খবর জানা দরকার, তা সজনীকান্ত কি কৌশলে সংগ্রহ করতেন জানি না।

আশালতা সিংহকে নিয়ে সজনীকান্ত, শ-চিঠির ১৩৪০ শ্রাবণ সংখ্যায় অদ্ভুত সুন্দর এক কৌতুক কবিতা লিখেছিলেন। একটি সম্পূর্ণ ছোট গল্প হয়েছিল এটি।

বনফুলের যে ব্যঙ্গটি প্রকৃত ব্যঞ্জনা এবং রূপকধর্মী অথচ বেশি হিংস্র নয়, তারই শেষ অংশটি এখানে উদ্ধৃত করছি। রচনাটির নাম "সত্য ঘটনা"—লেখকের নাম 'বৃহন্নলা বসাক এম-ডি (হোমিও)'। এটি ছদ্ম-নামের ছদ্মনাম। রচনাংশটি এই—

—আমার এক বন্ধুপত্নী তাঁহার প্রথম সন্তান জন্মাইবার পর বছরখানেক পরে একটু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।—সিমটম মিলাইয়া ওষুধ দিলাম। কিছুই হইল না।—আসিলেন কবিরাজ—বলিলেন বায়ু কুপিত হইয়া এই কাণ্ড ঘটিয়াছে।—

হঠাৎ একদিন রাত্রে ধরিল পেটে ব্যথা। ক্ষীরোদবাবু আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন 'এ তো লেবার পেন।'—শেষরাত্রি নাগাদ ক্ষীরোদবাবু বলিলেন এ আপনি হবে না, ফরসেপস ডেলিভারি করতে হবে—যাই হোক ক্ষীরোদবাবু ফরসেপস লাগাইলেন।

প্রসবও করাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য। কি সন্তান হইল জানেন? ছেলে নয়, মেয়ে নয়, মনস্টার নয়—যাহা ডাক্তারি কেতাবে লেখে তাহার কিছুই নয়। বাহির হইল—

১। একতাড়া প্রেমপত্র।

২। কতকগুলি গল্প ও প্রবন্ধ।

৩। কয়েকখানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।

স্বচক্ষে দেখিয়াছি মশায়। সবগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িয়াছিও।

তাহার পর বন্ধুবর এখান হইতে চলিযা যান। সহসা দেখিতেছি সমস্ত মাসিক পত্রিকায় সেই সব পত্র, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসাদি বাহির হইতেছে। আঁতুড় ঘরের গন্ধ এখনও যেন উহাদের গায়ে আছে। এগুলিও ঠিক তদ্রূপ।

ক্ষীরোদবাবুকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলাম—কেন এরূপ হইল? ছেলে মেয়ের বদলে এসব কি?

তিনি বলিলেন, ঠিক বুঝিলাম না মশায়। তবে আমার মনে হয় ওভারি আর থাইরয়েড—এদেরই কোনরূপ ঘোরতর বিকার উপস্থিত।

বুঝিলাম না, চুপ করিয়া গেলাম।

(শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪০)

এটি ব্যঙ্গরূপে সার্থক রচনা। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের এই সব 'বিক্ষোভ প্রদর্শন' এবং সাহিত্য থেকে রুচিহীনতা উচ্ছেদ চেষ্টা প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছিল শনিবারের চিঠির প্রথম যুগে। প্রতিপক্ষীয় লেখকদেরও এসব অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ছিল সমপরিমাণেই। প্রথমে শনিবারের চিঠি সাপ্তাহিক ছিল, প্রতি শনিবারে বেরুত। তখনকার প্রথম সম্পাদক যোগানন্দ দাস ও পরবর্তী নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে কেন্দ্র করে বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, সুধীরকুমার চৌধুরী, গোপাল হালদার, অশোক চট্টোপাধ্যায় (শনিবারের চিঠির প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক), হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, আলতাফ চৌধুরী প্রভৃতি মিলে যে, 'মণ্ডল' গঠিত হয়েছিল, তাকে প্রায় দুর্ভেদ্য বলা চলে। আমি যখন সম্পাদক হই, তখন এর তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হল। আগের যুগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যা-নিধি লিখেছেন। তৃতীয় সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। মোহিতলাল

মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি প্রধান লেখক ছিলেন। শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবী সজনীকান্তের আমলের এক লেখিকা, সত্যবাণী দেবী ছদ্মনামে লিখতেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রবল হয়। আমার সময়ে মোহিতবাবু, প্রমথনাথ বিশী, নিয়মিত লেখক। আমি বনফুলকে শনিবারের চিঠিতে নতুন নিয়ে এলাম। তার সাহায্যে কাগজের আর এক চেহারা হল। আক্রমণও রইল, বিশুদ্ধ হাস্যরসের মাত্রা বেশি হল। প্রমথনাথের অমিত রায় নামে সুন্দর ছোট ছোট রচনা, কৌতুক নাট্য, 'স্কট টমসন' নামে ব্যঙ্গ কবিতা প্রায় নিয়মিত। আর নতুন এলো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখকদের আগে ছদ্মনাম থাকত। এক একজনের তিন চারটি করে। সে সব দেখলে এখনো কৌতুক জাগে মনে। আদি সম্পাদক যোগানন্দ দাসের কাছ থেকে কিছুকাল আগে (১৯৭০) অনেকগুলি সংগ্রহ করেছি। এঁর নাম এখন অনেকের জানা নেই। ইনি সুবিখ্যাত আর জি কর মেডিক্যাল স্কুলের (এখন কলেজ) ফাউণ্ডার প্রিনসিপ্যাল ডাক্তার সুন্দরী-মোহন দাসের পুত্র। ইনি মেডিক্যাল কলেজে তিন বছর পড়েছিলেন, তারপর বিচিত্র জীবন। জন্ম ১৮৯৬। গবেষণামূলক বই লিখেছেন কয়েকখানি। বক্তারূপে খ্যাত। হ্যালি সাহেব এঁকেই বোধহয় ১৬৮২ সনে প্রথম দেখেন। তারপর ইনিই ১৯১০এ দেখা দেন, এবং ১৯৮৬ সনে আবার দেখা দেবেন। যোগানন্দ দাসের আবির্ভাব ও কিছুক্ষণের মধ্যেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিরোধান ঠিক হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে মেলে—এটি আমি অনেকদিন পর্যবেক্ষণ করেই বলছি। চিঠি দিলে দেখা করেন, কিন্তু আবার অল্পদিনেই আসবেন এই প্রতিশ্রুতি আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য অবস্থায় থাকেন বোঝা কঠিন।

আমার পূর্বে, যোগানন্দ দাসের সম্পাদন কালের প্রথম থেকে যে সব লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন, তাঁদের কয়েকজনের পরিচয় আমি দিচ্ছি—যোগানন্দ দাসের কাছ থেকেই সংগ্রহ করে। ভবিষ্যতে কেউ গবেষণা করতে বসলে কোন্ লেখা কার, তার কিছু ইঙ্গিত এতে পাবেন, কারণ অন্যত্র তাঁদের আর তা পাবার সম্ভাবনা রইল না। কোনো লেখক একাধিক

ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, আবার একই ছদ্মনাম দুতিন জনে মিলে ব্যবহার করেছেন। (আমার আমলের ছদ্মনাম ও বেনামা লেখার লেখক পরিচয় যথাসময়ে দেওয়া যাবে।)

১। 'কৃষ্ণসুন্দর' ও 'পীরু' নামে লিখেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২। 'বিনামা' নামে লিখেছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

৩। 'বান্দা ছমছের আলি' নামে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

৪। 'শান্তনু' নামে লিখেছেন সুধীরকুমার চৌধুরী!

৫। 'শ্রীমঙ্গলচন্দ্র শর্মা' নামে লিখেছেন শান্তা দেবী।

৬। 'গাজি আব্বাস বিটকেল' নামে লিখেছেন—যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সজনী দাস।

৭। 'কুদরৎ', 'ইছমেদ ছুরোমন্দি', 'সেলিম' ও 'খয়ের খাঁ ইব্রাহিম নামে লিখেছেন আলতাফ চৌধুরী।

৮। 'পিটটান চম্পটি', 'মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল', 'নটনারায়ণ', 'শুভগ্রহ', 'অবেদন', 'ভজনরাম পাহাড়ী', 'শ্রীশঙ্করাচার্য', 'আত্মানন্দ পাহাড়',—এই আটটি নামে লিখেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়।

আমার আমলেও অনেক লেখকের নাম থাকত না, অনেকে ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন, আবার অনেকের প্রকৃত নাম থাকত। বনফুল নামটি ছদ্মনাম হলেও ওটা প্রায় আসল নামে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু যেখানে বনফুল নামও প্রকাশযোগ্য নয়, সেখানে নানা ছদ্মনাম। একটির পরিচয় আগেই দিয়েছি—বৃহন্নলা বসাক। আরো আছে এবং সেও চিত্তাকর্ষক কম নয়। তবে এখানে একটি কথা বলা দরকার এই যে, আমার সময়ে অন্য কাগজের লেখার সমালোচনাটা খেলার আনন্দের সামিল মনে হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা নিয়েও সরস মন্তব্য করা হয়েছে, অচিন্ত্য-কুমারের লেখা নিয়েও। কিন্তু তাতে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনো ইতরবিশেষ হয়নি। আর একটি আশ্চর্য প্রমাণ আমি দিচ্ছি যে, যে-আশালতা সিংহকে নিয়ে এত আন্দোলন এবং যাঁর উপর হিংস্র আক্রমণ, তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের বন্ধুলোকই ছিলেন। দ্বিজেনবাবু তেমনি সদাশয় বন্ধু ছিলেন, এবং আশালতা সিংহের লেখাও আমি পরে ছেপেছি। আমাকে

লেখা তাঁর একখানি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করি—

শ্রীমতী আশালতা সিংহ
C/o Late Babu Abinash Chandra Singha
Zamindar
P.O. Batikar (Birbhum)

(পোস্ট মার্ক মতে প্রেরণের তারিখ ৬/১/৩৯)

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সচিত্র ভারতে আমার "স্বপ্নের অর্থ" শীর্ষক গল্পটি প্রকাশিত করেছেন, বড় সুখী হ'লাম। ভালো গল্প উৎরে গেলে, সচিত্র ভারতে পাঠাব। আমি সম্প্রতি শ্বশুরবাড়িতে এসেছি। আমার শ্বশুর মারা গেছেন।—

ইতি বিনীতা
আশালতা সিংহ

আমি এ সময় ২০ নম্বর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে অবস্থিত আর্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত সচিত্র ভারত সাপ্তাহিকের সম্পাদক। শনিবারের চিঠি ত্যাগের তিন বছর পরের ঘটনা এটি। এ সময়ের কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

ত্রিশ বছর আগের এই সব ঘটনার দিকে চাইলে তখনকার দিনের অনেক স্মৃতিই জেগে ওঠে। সে একটা যুগ গেছে। শনিবারের চিঠি আর বঙ্গশ্রী দুটি অফিসের দুটি আড্ডা। প্রথমটিতে সকালে, দ্বিতীয়টিতে বেলা তিনটে চারটে থেকে। কখনো একটা থেকেই। প্রথম আড্ডা রবিবার সকালে। আমার ঘরে স্থানাভাব ঘটত, বাইরে দরজার ধারে বেঞ্চিতে উদ্‌বৃত্ত বন্ধুরা বসতেন। এঁরাই বিকেলে যেতেন বঙ্গশ্রী অফিসে। উত্তর কলকাতার বন্ধুরা অনেকে সন্ধ্যাবেলাতে আসতেন মাঝে মাঝে, কিন্তু আমি নিজেই অপরাহ্ণে ধর্মতলা স্ট্রীটের বঙ্গশ্রীর আড্ডায় যোগ দিতে যেতাম প্রায় নিয়মিত। শেষে ওখানেও আমি আংশিক কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম।

শনিবারের চিঠি অনেককে গাল দেয় এবং গাল দিলে বিখ্যাত হওয়া যায় এমন ধারণা আমার সময়ে তিনচারজন লেখকের ক্ষেত্রে জানি। এঁরা আমার কাছে এসে অনুরোধ জানাতেন, একটু গাল দিন। কোনো কোনো লেখক গাল দেবার উপযুক্ত লেখা প্রকাশ করে, সেই সব লেখা লাল কালিতে চিহ্নিত করে ডাকে পাঠাতেন। নিরাপদে বাস করে অন্যকে আক্রমণ করার

মধ্যে একটা রোমাঞ্চ ছিল একথা ঠিক, কিন্তু গাল খাওয়ার মধ্যেও রোমাঞ্চ আছে, এ অভিজ্ঞতা এই নতুন লাভ করা গেল।

লেখা নিয়ে খুব আন্দোলন হলে লেখক খ্যাত হন এ ধারণা ঠিক মনে হয় না। নিজস্ব সাহিত্য রচনার ক্ষমতা থাকলে তা যেমন গাল দিয়ে খর্ব করা যায় না, তেমনি অক্ষম লেখককে গাল দিয়ে বড় করা যায় না। শনিবারের চিঠির আক্রমণের যাঁরা প্রধান লক্ষ্য ছিলেন, তাঁরা অনেকে নিজ ক্ষমতাবলেই সে সব অতিক্রম করে টিকে আছেন। তাঁদের কৃতিত্ব অন্য কারো মতের উপর নির্ভর করেনি। শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করা হয়েছিল তাঁর অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়ানোর জন্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের উদার ও প্রশস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইনটেলেকচুয়াল সাজতে গিয়ে তাঁর দুর্বলতা অতি শোচনীয়ভাবে প্রকট হয়ে পড়েছিল। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের সীমায় আবদ্ধ থেকে তিনি যেসব কাহিনী রচনা করেছেন তার মূল্য অনেক বেশি। তবু তার মধ্যেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে দুর্বল হয়ে পড়েছে তাঁর কাহিনী। কিন্তু গল্প বলে যাওয়ার ভঙ্গিতে তিনি যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই সীমার মধ্যে তিনি স্মরণীয়। সীমা ছাড়াতে গিয়ে তিনি আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন।

আমি আমার সম্পাদনার দ্বিতীয় সংখ্যা (মাঘ, ১৩৩৯) শনিবারের চিঠিতে "প্রসঙ্গ কথা" বিভাগে দীর্ঘ একটি আলোচনা লিখেছিলাম। এগুলি যথারীতি প্যারাগ্রাফে বিভক্ত। এর প্রথম ২২টি প্যারাগ্রাফ আমার লেখা ও শেষের ৬টি সজনীকান্তের লেখা। সজনীকান্ত আমার প্যারাগুলি পড়ার পর নিজে ৬টি প্যারা যোগ করেছিলেন। আমি কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি রচনা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। মাঝখান থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করি—

> যে সৃষ্টির মধ্যে বাঁচিবার লক্ষণ নাই, সে সৃষ্টিকে মিউজীয়াম গড়িয়া বাঁচাইয়া রাখিবার কোন অর্থ হয় না।—
>
> জীবনে শত শত সমস্যা আছে। জীবনকে নানা দিক হইতে দেখিবার চেষ্টাও বহুকাল হইতেই চলিতেছে।
>
> কিন্তু মনের প্রবৃত্তি কিংবা বৃত্তিতে, মামার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা যায় বলিয়া যদি

কেহ মনে করে মস্ত বড় একটা সমস্যা খাড়া করিলাম, এবং প্রেম করিয়া মনে করে সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি,—তাহা হইলে বলিতে হয় যুগে যুগে মানুষ প্রবৃত্তির হাতে পড়িয়া এ-ধরনের কাজ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তবু ইহার মধ্যে বাঁচিবার মন্ত্র পায় নাই।

সত্য এবং সৌন্দর্য একটি অন্তহীন রহস্য। ইহা কেহ একবারেই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন নাই—যুগে যুগে নূতন স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা ইহার ভাষ্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সৌন্দর্যের নব নব রূপে লোকে অভিভূত হইয়াছে—মানুষের আকাঙ্ক্ষা ইহার মধ্যে পরিতৃপ্তি খুঁজিয়াছে—

কিন্তু এই সৌন্দর্যের কোনো ধর্ম বাঁধিয়া দেওয়া চলে না। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের যে সহজ বোধ এবং প্রবৃত্তি আছে তাহারই কষ্টিপাথরে এই সৌন্দর্যের যাচাই হয়। পশুজীবন যাপন করিয়া মানুষ তৃপ্তি পায় নাই বলিয়াই সে অন্য ক্ষেত্রে নিজের মুক্তি খুঁজিয়াছে। এটি অভিব্যক্তির নিয়মে ঘটিয়াছে—সুতরাং ইহাকে ঠেলিয়া গোড়ায় ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। মাটির প্রদীপের উপর যদি দীপশিখা জ্বলিয়া থাকে তবে তাহাকে নিভাইয়া দিয়া কেবল মাটি লইয়া মাতামাতি করিবার অধিকার সকলেরই আছে স্বীকার করি। কিন্তু মানুষের প্রাণ যে অন্ধকারে হাঁফাইয়া ওঠে, সে যে ঐ দীপশিখাতেই নিজের পরিচয় পায়।

সুতরাং মাটি স্থির হইয়া থাকিলেই তাহার উপরে আলো জ্বলিতে থাকিবে, মাটিটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিলে আলো জ্বলিবে না।—

এই পর্যন্ত স্বীকার করিয়া লইলে মিউজীয়ামের প্রশ্ন উঠিবে না বলিয়াই বিশ্বাস।

এসব এখন পড়তে গিয়ে দেখি যাঁর রচনা নিয়ে এ আলোচনা, তাঁর যুক্তিতে যে সব দুর্বলতা ছিল, আমার এসব যুক্তিতেও তেমনি অনেক দুর্বলতা আছে। কিন্তু তখন মনে কিঞ্চিৎ আদর্শবাদ ছিল, তাই আমার রচনাটা আবেগপ্রধান হয়েছে। উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্তু লেখাটি বড়ই কাঁচা মনে হচ্ছে এখন।

কিন্তু এর পরেই আবেগ পরিত্যাগ করে কিছু পরিমাণ নিজমূর্তি ধারণ করার চেষ্টা করেছি। কারণ ঐ প্যারাগ্রাফের পরেই লিখছি—

কিন্তু সাহিত্যের কথা থাক। ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি মূল্যবান মত 'বাতায়ন' মারফৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। শরৎচন্দ্র বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে চান। আমরা কবিকে চিত্রকর হিসাবে দেখিয়াছি—এইবার উপন্যাস লেখককে চিত্র-সমালোচকরূপে দেখিতে পাইলাম। বন্দনা লাভ করিবার পর হইতে বোধহয় তিনি চিত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন।

কিন্তু কুড়ি বৎসর পূর্বে অধিকাংশ শিক্ষিতদের মধ্যে ওরিয়েণ্টাল আর্ট সম্বন্ধে যে মত প্রচলিত ছিল, এবং যে মত পরিত্যক্ত হইয়া পচিয়া উঠিয়াছে, শরৎচন্দ্র ১৩৩৯ সালে সেই মত প্রচার করিয়া মনে করিলেন খুব রসিকতা করিলাম।—তিনি বলিতেছেন—

ওই এক ধুয়ো উঠেছে পেকাটির মত হাত-পাগুলোকে বেঁকিয়ে ললিত লবঙ্গলতা না আঁকলে আর্ট হয় না। প্রপোরশন জ্ঞান নেই, অ্যানাটমি জ্ঞান নেই, রঙের পোঁচ টেনে দিলেই ওরিয়েন্টাল আর্ট হয়ে গেল—বোঝ আর নাই বোঝ।

"ওই এক ধুয়ো উঠেছে"—কথাটি এমনভাবে উচ্চারিত, যেন মনে হয় গত শুক্রবারে এই ধুয়োটা উঠিয়াছে। কিন্তু প্রপোরশন জ্ঞানের অভাব না থাকিলে এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। অ্যানাটমি এবং প্রপোরশন কাহাকে বলে এবং ক্রিয়েটিভ আর্টে তাহার স্থান কতখানি, শরৎবাবুর কি তাহা জানা আছে?

শরৎবাবুর মত খ্যাত ব্যক্তির পক্ষে এ-রকম কথা উচ্চারণ করা যে হাস্যকর তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি—তাঁহার না থাকিলেও তাঁহার ভক্তদের আছে বলিয়া মনে হইতেছে। শরৎবাবুর কথা শুনিয়া তাঁহারা হাসিয়াছিলেন, কিন্তু শরৎবাবু বলিলেন "হাসি নয়।" কারণ মুকুল দের ছবি কে যেন উল্টা করিয়া টাঙাইয়াছিল—কাজেই প্রমাণ হইল আর্টে অ্যানাটমি জ্ঞান থাকা চাই। ইহাই শরৎবাবুর যুক্তি।

অ্যানাটমি যে প্রাণের পরিচয় দেয না, সেকথা যে-কোনো অ্যানাটমি ছাত্রের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেই শরৎবাবু জানিতে পারিতেন—

ক্রিয়েটিভ আর্টের—অ্যানাটমি, ফিজিওলজি কিংবা প্যাথলজিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার অধিকার আছে—"

—চিত্ত-প্রকর্ষ বা চর্যার অভাবই যে-কোনো লোককে অনধিকার চর্চা করিতে প্রলুব্ধ করে। কোনো কিছু না বুঝিতে পারিলেই তাহার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার এমন লজ্জাহীন প্রয়াস কেবল এই হতভাগ্য বাংলাদেশেই সম্ভব।—

ঠিক এই যুক্তিটাই তখন বিশেষভাবে মনে এসেছিল (এবং আজও আমার এ-মতের বদল ঘটেনি) এই কারণে যে, তখন আধুনিক সাহিত্য নামে যা উগ্র হয়ে উঠেছিল সে সাহিত্যও অ্যানাটমির উপর নির্ভরশীল ছিল—অ্যানাটমি প্লাস ফিজিওলজি ও প্যাথলজি।

উদ্ধৃত অংশ বড় লেখার অংশ। এবং সেটি 'প্রসঙ্গ কথা' বিভাগে লিখেছিলাম। 'সংবাদ সাহিত্য' পৃথক বিভাগ। সেই বিভাগটিই শনিবারের চিঠির প্রধান আকর্ষণ ছিল। তার পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

॥ দুই ॥

সেই ১৯৩২-৩৬এর কালটি একদিক থেকে ভালই ছিল, কারণ তখনও সাহিত্য পুরো ব্যবসা হয়ে ওঠে নি। তারও কারণ তখন জীবনযাত্রা ছিল সরল, জিনিসের দাম ছিল শস্তা। অবশ্য শস্তা কথাটির নিজস্ব অর্থ সঙ্কীর্ণ; তা সব সময়েই কেনার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। আসল কথা তখন যা খুশি কেনা যেত। জিনিসের প্রাচুর্য ছিল, বৈচিত্র্য ছিল এবং নিজের কেনা ও না কেনার স্বাধীনতা ছিল। এখন অবশ্য না কেনার স্বাধীনতাটা শুধু অবশিষ্ট আছে। অন্য কোনো দিকে তখন এখনকার মতো আতঙ্ক ছিল না, বন্‌ধ, স্ট্রাইক, হরতালহীন দেশ এদিক থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল। প্রায় সকল পথে ইচ্ছামতো বাড়িভাড়া পাওয়া যেত। রিকশয় মাইলখানেক গিয়ে চার পয়সা দিলেই যথেষ্ট। ট্যাক্সি ছিল ছ'আনা মাইল। অবশ্য খরচের ক্ষমতাও তেমনি কম ছিল।

এ সব পরিবেশের সঙ্গে সম্পাদকের জীবনের সম্পর্ক ছিল। কারণ সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব নিয়ে কাগজ বার করা এবং তা নিয়ে দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল শুধু এই জন্যই এবং সেই সঙ্গে পাইস হোটেল ছিল বলে। শনিবারের চিঠির বিরুদ্ধে রবিবারের লাঠি নামক একখানি মাসিক বেরিয়েছিল। আরো দু'একখানা কি বেরিয়েছিল ঠিক মনে নেই। শহরের বাইরে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অথবা আদৌ হয়েছিল কি না তা মনে পড়ে না, তবে কলকাতা শহরে শিক্ষিত মহলে তখন বিষম উত্তেজনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন পুরো উদ্যমে জীবিত, শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করতে উদ্যত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও তাই। এমন কি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও কিছুপরিমাণ রবীন্দ্রনাথের বিরোধী ছিলেন।

এসব বিরোধিতা অবশ্য প্রধানত সাহিত্যিক বিরোধিতা, ব্যক্তিগত নয় তেমন কিছু, অন্তত আমার কাছে। আমার কাছে তখন সমস্ত আকাশ-বাতাস সাহিত্য-দ্বন্দ্বে মুখরিত মনে হত। খুব উত্তেজনা, যেন একটা যুদ্ধ চলছে। এমনিভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত জোর কমে আসতে লাগল।

কাকে গাল দেওয়া হবে আর? পূর্বেকার লক্ষ্য যাঁরা, তাঁদের অনেকেই সত্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাঁরা শনিবারের চিঠিকে মান্য করে চলবেন, এমন আশা করাই অন্যায়। কারণ কে কি লিখবেন, তা বাইরে থেকে উপদেশ দিয়ে ঠিক করে দেওয়া যায় না, এবং বিরোধিতা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল হয়।

যেমন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিত্রশিল্পে অ্যানাটমি চেয়ে বসেছিলেন, কিন্তু সে কথা ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টরা কখনো মেনেছেন? আবার শনিবারের চিঠি কথাসাহিত্যে অ্যানাটমির আমদানি বন্ধ করতে চেয়েছিল, তাই বা কে মানল? তবে কৃত্রিম স্থায়ী হয় না কখনো।

কিন্তু এ সব কথা থাক। সেই ১৯৩২ সনে হঠাৎ যুধ্যমান একপক্ষের সেনাদলে নাম লেখানো আমার নিজেরই কাছে তখন অদ্ভুত বোধ হয়েছিল। আমার এ কাজ ভাল লেগে গেল বিশেষভাবে এ কারণে যে, আমার ব্যঙ্গ রচনায় কিছু উৎসাহ ছিল, এবং সেই উৎসাহ কর্ষণ করার জন্য অযাচিতভাবে একটি স্বাধীন ক্ষেত পেয়ে গেলাম। সেদিনের কিছু কিছু সংবাদ সাহিত্যের নমুনা দিলে আমার কথা অনেকটা বোঝা যাবে।

এ সব অতীতের কথা নতুন করে তোলার কারণ, এই ইতিহাস আর কেউ লেখেননি। যোগানন্দ দাস লিখেছেন কিছু কিছু নানা কাগজে, কিন্তু কি রকম লেখা নিয়ে যুদ্ধ চলত তা এড়িয়ে গেছেন।

আরো একটু ভূমিকা দরকার। আগেই বলেছি বিপক্ষ দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই সত্য ক্ষমতার অধিকারী। বুদ্ধদেব বসু কবিরূপে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন ছাত্র অবস্থা থেকেই, যদিও আমরা যে সব কবিতা সমালোচনা করেছি, তার মূর্তিতে কর্দমটাই বেশি পরিস্ফুট ছিল আর গল্পে আমাদের রুচিতে অচল, অথচ বিদেশী সাহিত্যে যা তখন উগ্ররূপে দেখা দিয়েছে, তা বাংলা গল্পে আমদানি করতে চেয়েছিলেন তিনি। এঁদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ অন্য স্তরের মনে হয়েছে, এবং প্রেমেন্দ্রই প্রথম বোধ হয় অবহেলিত সাধারণ মানুষ নিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন। অচিন্ত্যকুমার বহুমুখী, তাঁরও সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ নিয়ে লেখা গল্প অতি শক্তিশালী। শৈলজানন্দকে এদিক থেকে একনিষ্ঠ বলা চলে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মোট কথা ইংরেজী, ফরাসী, নরওয়েজিয়ান, রাশিয়ান প্রভৃতি সাহিত্য পাঠের ফলে, অথবা গৌণ প্রভাবে, লেখক-বিশেষে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যাঁদের মনে প্রতিক্রিয়া হল উগ্র, তাঁরা তার অনুকরণকেই নবযুগ ভেবে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। আর যাঁরা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী তাঁরা নতুন ভাব অনেকখানি আত্মস্থ করলেন। অর্থাৎ হজম করলেন, উদ্‌গার করলেন না।

বুদ্ধদেব বসুর তখনকার লেখা আমার কাছে কৃত্রিম মনে হয়েছে বেশি। তা ছাড়া তিনি মনে হয় তখন খানিকটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। আশালতা একমাত্র তাঁরই অনুকরণ করে আরো কৃত্রিম হয়ে উঠলেন। নমুনা দিচ্ছি—

—অথচ চুমো খেতে হয়, না খেলেও চলে না, এবং সেই জন্যই যে কোন মেয়ের কাছে যেতে হয়—

—বুদ্ধদেব বসু

—বুদ্ধদেবের লেখায় যদিই পড়তে পাই "অথচ চুমো খেতে হয়, না খেলেও চলে না এবং সেই জন্যই যে কোন মেয়ের কাছে যেতে হয়"—তবে রাগ করবার কথাই নয়। এটা এ যুগের অত্যন্ত ব্যথার কথা। বুদ্ধদেব বসু—তাঁকে শত ধন্যবাদ।

—আশালতা দেবী

আশালতা লিখছেন :

বুদ্ধদেবের "এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে" বইখানি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

মন্তব্য : আমরা জানি পুলিসে এই বইখানির প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছে, সুতরাং ভাল লাগিবার অবসর আমাদের মিলিবে না।

বুদ্ধদেব : আশালতার লেখার আমি খুব ভক্ত—পেলেই পড়ি এবং পড়লেই খুসি হই।

এই সবই শনিবারের চিঠি থেকে পুনরুদ্ধৃত।

বুদ্ধদেব বসুর পরবর্তী কোনো লেখাই আমি পড়িনি, সুতরাং পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে কিনা আমি জানি না। শুনেছি কিছুদিন আগে আরো একখানি বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমার এ সব উদ্ধৃতি তখনকার দিনের। অজস্র উদ্ধৃতি ও তার উপর মন্তব্য এখানে তুলে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। একটুখানি নমুনা সেই কালকে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের বিরোধটা কোথায়, আশা করি তা আংশিকভাবে অন্তত জানাতে পেরেছি।

আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা উচিত এইজন্য যে, যে সব গল্প বা প্রবন্ধ বা কাব্যাংশ উদ্ধৃত করে তখন মন্তব্য করা হত, তার সমগ্র রূপ কি, তা এ থেকে জানা যাবে না। এবং সমগ্র থেকে অংশ উদ্ধৃত করলে অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরকম হবার সম্ভাবনা। কিন্তু তবু আমি নিজের দিক থেকে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমি যে সব অংশ উদ্ধৃত করেছি, তা সমগ্র রচনার সুরের সঙ্গে এক বলেই করেছি! এবং তা পড়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ পাইনি। তাছাড়া আছে রুচির কথা। দেশভেদে রুচিভেদ হবেই, অন্তত অদ্যাবধি তাই আছে। পরে হয়তো কোনো দূর ভবিষ্যতে সব একাকার হবে, সে দিনের কথা আমি এখন ভাবি না। তা ছাড়া একই দেশে রুচির বদলও ঘটে অনিবার্যভাবেই। এ দেশে কুলীন ব্রাহ্মণদের শতাধিক বিবাহ রুচিতে আটকাত না, এখন আটকায়। বিধবা বিবাহ রুচিতে আটকাত, এখন আটকায় না।

সাহিত্য বা শিল্পের সঙ্গে এ সব জিনিসের সম্পর্ক আছে, আমি তুলনা করছি না, শুধু পরিবর্তনের ধারাটা বুঝতে চেষ্টা করছি। আমাদের দেশে নভেল ও ছোটগল্প বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ থেকে। তার আগে যা ছিল তা উল্লেখযোগ্য নয়। সমাজের ছবি সাহিত্যে ফোটে, তাই সমাজের রুচির কথা একটুখানি বলা গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে আদর্শবাদ ছিল, এখন তার বদল ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ কেরানি বা অন্যান্য অতি সাধারণ মানুষ নিয়ে যে সব গল্প লিখেছেন, তার ভাষা এখন নেই, কিন্তু তাঁর কয়েকটি গল্প তা সত্ত্বেও স্থায়ী হয়ে টিকে আছে। তার কারণ শিল্পের সব দিকের বিচারে তা সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

আধুনিককালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন ভাষা, নতুন অনুসন্ধিৎসায় সমাজকে ব্যাপকভাবে দেখার চোখ ও মন পেয়েছেন শক্তিশালী লেখকেরা। এর মধ্যে জীবনের কোনো দিকই বাদ দেবার প্রশ্ন নেই, তবু সব লেখা সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হচ্ছে কি না এবং কোনো লেখা যৌন চিত্রের নগ্নতা সৃষ্টির সাহায্যে পর্নোগ্রাফি হচ্ছে কিনা, সে বিচার চলবেই, তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ বৃথা। কোনো আব্রু রাখব না, এমন হিসাব করে কিছু রচিত হলে, তা সাহিত্য হবে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

কিন্তু সেই ৪০ বছর আগের ব্যাপার হলেও এ সব প্রশ্ন তখন থেকেই

উঠেছিল। যাই হোক, নিছক কৌতুক প্রবৃত্তিও কম ছিল না। কিছু নমুনা—

শৈশবে মা-ই শিশুর কাছে সবচেয়ে প্রিয়া, সব চেয়ে পরিচিতা, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠা।

মন্তব্য: শিশু যদি বলে "আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে", তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার মা তাহাকে বার্লি খাওয়াইতেছে।

(শ, চি, শ্রাবণ, ১৩৪০)

একটি ধাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছিল কয়েকমাস ধরে। অপরাজিতা দেবী কে জানা সত্ত্বেও পাঠকদের কাছে এই প্রশ্ন তুলে খুব আনন্দ করা গিয়েছিল। শৈল চক্রবর্তী তখন আঁতুলবাসী, নিজে বি-এসাস পাস, কিন্তু ছবি আঁকার দিকে তার প্রবল ঝোঁক, সে একসঙ্গে অনেকগুলি কলমে আঁকা ড্রয়িং নিয়ে এলো একদিন। বিভিন্ন বিষয়, কারটুনের ঢং। সেগুলি রেখে দিলাম এবং মাসে একটি করে ছেপে তার অনেকগুলির ক্যাপশন দেওয়া হল "আমিই অপরাজিতা দেবী"—তা সে দোকানদারই হোক বা নির্বিশেষ কোনো পুরুষই হোক। অন্য ক্যাপশনেও ছাপা হয়েছিল কয়েকটি। ১৩৪০, ভাদ্র সংখ্যায় আমি সংবাদ সাহিত্যে লিখলাম—

অপরাজিতা দেবী কে?—ইহা লইয়া নানা জনে নানা কথা বলিতেছে, তাহার মধ্যে একটি কথা সমীচীন বোধ হইতেছে, বিশ্বাসও হইতেছে··

অর্থাৎ কয়েকজন সাহিত্যিক, রাজনীতিক, চিত্রশিল্পী, আইনজীবী এবং এঞ্জিনিয়র মিলিয়া অপরাজিতা দেবী নাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতি মাসে সংঘবদ্ধ হইয়া কবিতাগুলি লিখিতেছেন। প্রত্যেকের নামের আদ্যাক্ষর যোগ করিলেই লেখিকার নাম পাওয়া যাইবে। যথা—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরশুরাম
রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ সাধু
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী
বীরবল

এ কথা মিথ্যা হইলে আগামী সংখ্যায় ইঁহারা প্রতিবাদ করিবেন।

(শ, চি, ভাদ্র, ১৩৪০)

কিন্তু প্রতিবাদ না আসাতে একজন পাঠক বিশ্বাস করেছিলেন যে, ওঁরাই মিলিতভাবে অপরাজিতা দেবী।

এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর মন্তব্য ১৩৪০, আশ্বিন সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করছি—

শ্রীরাধারাণী দেবীর 'রূপমতী' পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। কিন্তু এটা এসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ মাত্র—

কার সুনিপুণ কর পরশনে
খেলিছে বীণার সুর
নব বসন্তে রাগ বসন্ত—
মুখরে বনানীপুর।

কলিকাতা কবপোরেশনেব কথা মনে আসে। শ্রীযুক্ত সন্তোষ বসুর হাতে করপোরেশনে যদি এইরূপ সুরের খেলা দেখিতাম, তাহা হইলে সে কি সুখেরই হইত।

শ চিঠির মন্তব্যগুলি ক্রমেই ব্যঙ্গভিত্তিক কৌতুকের দিকেই ঝুঁকছে, এটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমার প্রধান সহায় তখন তিন ব্যক্তি—বনফুল, প্রমথনাথ বিশী ও অজিতকৃষ্ণ বসু। প্রচুর সরস ব্যঙ্গ রচনা লিখেছে এরা আমার জন্য।

একটি প্যারাগ্রাফ বনফুলকে দিয়ে সংবাদ সাহিত্যের জন্য লিখিয়ে নিয়েছিলাম একবার। সেটি বেশ মনোহর বোধ হবে, নমুনা দিচ্ছি।--

কবিরাজ সুশীলবাবুর 'দেবী' বাতায়ন সাপ্তাহিককে দিয়া আপ-টু-ডেট ফ্যাশানে উঁকি দিতেছে। কিন্তু আবহাওযাটা কবিরাজী বলিযা জমিয়াও যেন তেমন জমে নাই। তিনি লিখিতেছেন—

দে। তোর এ কথার অর্থ কি পরী?

প। এর অর্থ এই, আমার দেহ নিবে যদি আমার বিচার করতে যাও, তবে সীতা-সাবিত্রীর মতই আমি সতী। আর মন নিয়ে যদি আমার সতীত্ব ওজন কর, তা হ'লে আমি অসতী, নিশ্চয়ই অসতী।

কিন্তু এলোপ্যাথিক মতে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—

দে। তোর ওভারির এ কি ব্যাপার পরী?

প। আমার বুকসিনেটর, আমার ম্যাসিটার, আমার অরবিকিউলারিস ওরিস, আমার পেকটোরালিস মেজর, ম্যামারি গ্ল্যাণ্ডস, আমার ওভারি, এমন কি আমার ইউ-টেরাস নিয়ে যদি বিচার করতে চাও তবে সীতাসাবিত্রী মতই আমি সতী। কিন্তু সেরি-ব্রামের গ্রে ম্যাটারের ফাংশন বিচার করে যদি আমার সতীত্বকে বুজে ব্যালান্সে চড়াও তবে আমি অসতী, নিশ্চয়ই অসতী।

যখন সম্পাদক ছিলাম

সুশীলবাবুর লেখাটি একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক পড়িয়া তাঁহার জন্য নিম্নলিখিত প্রেসক্রিপশনটি করিয়াছেন.—

Re Pot. Bromide grs. 10
Chloral Hydras grs. 10
Tr. Opii minims 10
Aqua Chloroform
ad. one ounce T. D.

কড়া মন্তব্য অনেক ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে যেখানেই কৌতুক সৃষ্টির মতো বিষয় পাওয়া গেছে, তার সদ্ব্যবহার করা হয়েছে তখন। যেমন—

১। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী চিত্রকূট ভ্রমণের প্রারম্ভে তঁাহার কি কি অসুখ আছে তাহার একটা ফিরিস্তি দাখিল করিয়াছেন। লিখিবার সময় সেগুলি বাদ দিলেই ভাল হইত। কিন্তু ইহা ছাড়াও রহস্য আছে। লেখিকা ও তঁাহার স্বামী (আমাদের নরেনদা) বম্বে মেলে দুইখানি সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করিয়াছিলেন এবং চিত্রকূট হইতে কামাদ পাহাড়ে যাইবার সময় দুইজনে দুইটি ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছিলেন। দুইটি বার্থ এবং দুইটি ঘোড়া বিশেষ করিয়া লেখা হইল কেন তাহা বুঝিতেছি না। সংখ্যার উল্লেখ না থাকিলেও আমরা কিছুই মনে করিতাম না।

কিন্তু শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী যে শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়িবেন ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। এই দুর্বল দেহ—অথচ...। কিন্তু ইহাতে আমাদের যতই আশঙ্কা থাকুক, একটা বিষয়ে খুব আনন্দ হইতেছে। একটি বাঙালী মহিলা অসুখ সারাইবার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া ঘোড়ায় চাপিয়াছেন এই দৃশ্য দেখিবার, এবং পাঁচজনকে ডাকিয়া দেখাইবার। আমরা আগামী সংখ্যায় একখানা ফোটোগ্রাফ চাহিয়া লইয়া সকলকে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

(শ, চিঠি, চৈত্র, ১৩৪০)

২। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর 'সঙ্গতি' (পরিচয়) নামক কবিতা।—

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া, আর পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজা টা মেলাবেন।
পাগলা ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে ক্ষত চাটা
বন্যার জল, তবু ঝরে জল
প্রলয় কাঁদনে ভেসে ধরাতল—
মেলাবেন।

কিন্তু ভগবানের সাধ্য নেই যে মেলাবেন। তিনি যাহা করিবেন তাহা বুঝিতেছি॥
গেলাবেন তিনি পিণ্ডিটা, আর মনোমেনিয়ার ঐ কাঁচকলা গেলাবেন।

পৃষ্ঠে ভাঙিয়া কর্পোরেশন ঝাঁটা
গণ্ডে ছিঁড়িয়া দুই-চারি জোড়া 'বাটা'
মাদী কুকুরের জিভ দিয়ে ক্ষত চাটা।
চক্ষের জল হায় নিষ্ফল
প্রলাপ কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
গেলাবেন।

(শ, চি, চৈত্র, ১৩৪০)

৩। সম্প্রতি…'কুচের তৈল' নামক একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। ধনেশ পাখীর তেল, বাঘের তেল ইত্যাদি বিক্রয় হয় শুনিয়াছি, কিন্তু 'কুচের' তেল সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কবি কালিদাসের কাব্যে, গীতগোবিন্দে কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীতে কোথাও উক্ত তেলের উল্লেখ নাই। ইহা প্রতারণা বলিয়া বোধ হয়।

(শ, চিঠি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

এর পর 'অসম্ভব কথা' শিরোনামে কিছু রসিকতার চেষ্টা—

১। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবিতাগুলির স্বরলিপি প্রস্তুত হইতেছে। শুনা যাইতেছে গোরা ও ঘরে-বাইরের স্বরলিপিও শীঘ্রই প্রস্তুত হইবে।

২। সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় দিনে ও রাত্রে পাঁচবারের বেশি দাড়িতে হাত দেন না। দাড়িতে হাত দেওয়া বিলাসের নামান্তর।

৩। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সন্দেশ খান না।

৪। শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ওস্তাদ রাখিয়া গান শিখিতেছেন। শীঘ্রই তিনি গান রেকর্ড করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সাঁতার শিখিবার জন্য ইংল্যাণ্ডে যাইতেছেন। তিনি দুই বৎসর পরে ফিরিবেন।

৬। সিনেট হাউসে আগামী মাস হইতে সিনেমা দেখান হইবে।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মাতৃভাষায় প্রচলিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পশ্চিম-মুখী প্রস্তরমূর্তি পূর্বমুখী হইবেন।… সেই আশায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন।

৮। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঘের চামড়ার স্যুট অর্ডার দিয়াছেন। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত ছিলেন।

৯। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ছন্দ প্রস্তুতের জন্য একটি কল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কলে পৃথক এক একটি শব্দ লিখিয়া ছাড়িয়া দিলে শব্দগুলি প্রার্থিত ছন্দে আপনিই ভাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে। মিলগুলি পরে জুড়িয়া দিতে হয়।

১০। 'প্রথমা'র লেখক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গিরিডিতে চাষ আবাদের উপযুক্ত জমি পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করিতে গিয়াছেন। পরীক্ষা করিতে কয়েক বৎসর লাগিবে।...

১১। পথের পাঁচালীর লেখক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিরিচুয়াল সাধনার ব্যাপারে তিন মাস অনাহারে থাকিবেন। এই সময়ে তাঁহার কোনো হিতৈষী তাঁহাকে আহারে প্রলুব্ধ করিবেন না।

(শ, চিঠি, ভাদ্র, ১৩৪১)

কয়েকটি বাছাই করে দেওয়া গেল। এই মাস অর্থাৎ ১৩৪১ ভাদ্র, ইং সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সহকারী সম্পাদক রূপে আমার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরে এ বিষয়ে আলোচনা করব। তৎপূর্বে আরো কিছু সংবাদ সাহিত্যের নমুনা দেওয়া যাক—

১। ...আশ্বিনের বিচিত্রায় আমাদের চিরপরিচিত রাশিয়া 'রাশ্যা' রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং এখন হইতে তিনি আসিয়া বসিয়া আছেন না লিখিয়া তিনি আস্যা বস্যা আছেন লিখিলেই চলিবে। খবরের কাগজ মালবীয়কে মালব্য বানাইয়া পূর্বেই উচ্চারণ ও বানান সমস্যা অনেকটা সমাধান করিয়া দিয়াছেন। আমরা ভাবিতেছিলাম ত্বদীয় মদীয় প্রভৃতিকে ত্বদ্য মদ্য করিব কি না। এখন আর ভাবিব না।

২। বিচিত্রায় 'বাপের বাড়ির পথে' নামক ছবিতে দেখিতেছি বধূ সদ্য প্রসূত শিশু-সন্তানকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে গোরুর গাড়ির পরদা সরাইয়া শ্বশুর বাড়ির দিকে তাকাইয়া আছেন। বধূর এক বৎসর বয়স্ক প্রথম পুত্রও গভীর দুঃখের সহিত পিতৃগৃহের বিচ্ছেদ অনুভব করিতেছে। কিন্তু রাস্তার ব্যাপার যাহা দেখিতেছি তাহাতে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তো গাড়ি খাড়া হইয়া উঠিবে এবং সন্তানাদি সহ মাতা পরদা ছিঁড়িয়া নিচে পড়িয়া যাইবেন। রাস্তা সামনে হঠাৎ পাহাড়ের মতো উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ পথে অভিভাবকশূন্য স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠানো উচিত নহে।

৩। "শনিবারের চিঠির কাণ্ড" নাম দিয়া ছায়া নামক সাপ্তাহিক (সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়) আমাদের "অসম্ভব কথা"র (পূর্বে উল্লেখিত) প্রতিবাদ করিয়াছেন।.. ছায়ার সংবাদ হইতে একটি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করিতে হইল:

"শনিবারের চিঠির সংবাদে লেখা হইয়াছে 'শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সন্দেশ খান না'। কিন্তু তিনি যখন শিবপুরে থাকিতেন তখন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ভেলী এবং তিনি নিজে একথালা সন্দেশ নিঃশেষ করিয়াছেন, অবশ্য ভেলীই বেশির ভাগ খাইয়াছিল।"

—কিন্তু ছায়ার সঙ্গে আমাদের যে গোড়াতেই মতভেদ। আমাদের স্বচক্ষে দেখা জিনিসে আস্থা নাই।

(শ, চিঠি, আশ্বিন, ১৩৪১)

এই জাতীয় নমুনার তালিকায় দেখছি ১৩৩৯ সালের চৈত্র সংখ্যার কয়েকটি উপহারযোগ্য কৌতুকটীকা বাদ পড়ে গেছে। সেগুলি এই—

১। আর কোনো দুঃখ নাই—বাংলা ভাষা মাঘের তৃতীয় সপ্তাহে দুইটি নূতন শব্দসম্পদ লাভ করিয়া ধন্য হইল :

"মেঘের মাঝে নূপুর বাজে ও.কার নূপুর রুনুঝুনু ?
ঝর্ণ ধরে গান যে ঝরে ও গান কে গায় গুনুগুনু ?"

ঝর্ণাধরে ও গুনুগুনু। ...কিন্তু গুনুগুনু...কথাটি এমনি মূল্যবান যে এখনি কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হে সখী, আজকে আমার
একটি কথা গুনুগুনু,
এদিকে—ঝোল রেঁধেছ
দাওনি তাতে নুনুনুনু,
ওদিকে—পান সেজেছে
একফোঁটা নাই চুনুচুনু
কাজেতে হেলা করে
গান কি ভাল গুনুগুনু ?

(যে কবিতা নিয়ে মন্তব্য করা হল তা কোন্ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল উল্লেখ নেই; এখন ও মনে পড়ছে না। সেটা দুঃখের বিষয়।)

২। 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকের অভিনয় শুনিলাম অনেক মহিলার অনুরোধে বেলা দুইটায় হইতেছে। নারী জাগরণের দিনে নারীদের রাত্রি জাগিবার ভয়...?

এই জাতীয় নানা রঙ্গরহস্য, কিন্তু যেখানে ক্রোধ সেখানে ভাষা এবং ভঙ্গি অন্যরকম হয়েছে। তা ছাড়া এমন অনেক লিখেছি যা এখন ভাবলে লজ্জিত হই। আবার অনেক লেখা যা এখনো খারাপ লাগে না। আমি ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমালোচনার নমুনা দিয়েছি, কিন্তু অতঃপর তাঁকে যেভাবে সমালোচনা করেছিলাম, সে ভাষা তখনকার সুরের সঙ্গে মিললেও তা এখন পড়তে সঙ্কুচিত হই। উপলক্ষটা দিলীপকুমার রায়। যথা—

এতদিন পরে শরৎচন্দ্রকে সম্মুখে খাড়া করিয়া দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। ছন্দ লইয়া রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারকে যে সব কথা এতদিন বলিয়াছেন তাহা যে ভিতরে ভিতরে দিলীপকুমারকে কতখানি নাড়া দিয়াছে—শরৎচন্দ্রর 'সাহিত্যের মাত্রা'র প্রতিবাদ প্রকাশিত না হইলে আমরা বুঝিতেই পারিতাম না।—

যখন সম্পাদক ছিলাম

মনে পড়িতেছে একদা রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রিকায় যুবক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবি-প্রতিভার উপরে প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠকদিগের সহিত তাঁহাকে পরিচয় করাইয়া দিতেছেন। পরে 'আনন্দ বিদায়'ও দেখিয়াছি। এক পুরুষ অতীত হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথ এ যুগকেও অধিকার করিয়া থাকিবেন এ কেমন কথা? এ যুগে শরৎচন্দ্র, দিলীপকুমার এবং আরো অনেকে। বোঝেন না বলিয়া যদি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি বিশিষ্ট প্রোপাগাণ্ডা চালানো যায়—তাহা হইলে রবীন্দ্রযুগ গত হইযাছে একথাটা নিশ্চয়ই অনেকটা প্রমাণ হইতে পারে।

সাহিত্যের মাত্রা প্রবন্ধটি পড়িয়া শরৎচন্দ্র মনে করিলেন ইহা আর কিছুই নহে—তাঁহাকেই আক্রমণ। এই উপলক্ষে প্রতিবাদ প্রবন্ধ রচিত হইল—ভক্তরা বলিলেন বাহাহা। লেখক মনে করিলেন, মার দিয়া। প্রতিবাদ প্রবন্ধটি সৌভাগ্যক্রমে আমরা দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বীই বটে। শরৎচন্দ্র যখন কথাসাহিত্যের ভিতর দিয়া রসসৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন তিনি হয়ত মনেই করিতে পারেন নাই যে, তাঁহাকে ভবিষ্যতে সমালোচনা এবং আর্ট সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদও করিতে হইবে। গল্প লেখায় যে বুদ্ধি দরকার, সমালোচনা করিতে হইলে ঠিক সেইটুকুতে কুলায় না। শরৎচন্দ্র বারবার এই ভুল করিতেছেন। তিনি যতবারই রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিতে গিয়াছেন, ততবারই তাঁহার ইনটেলেকটের দারিদ্র্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।—

দিলীপকুমার বলিতেছেন, 'শরৎচন্দ্র ঠিকই বলেছেন, ওরা (রামায়ণ-মহাভারত) শুধু আর্ট নয় ধর্মগ্রন্থ,—না তার চেয়েও ঢের বড়। তাই বামন-আর্টের মাপকাঠি দিযে ওদের মাপতে গেলে হাসি পায়ই।

ইহাকেই বলে যুক্তি।—যদি লেখা যায়—অমুক লেখা পড়িয়া হাসি পায়—বাস্, অমুক লেখা যে লেখাই নয়, প্রমাণ হইয়া গেল। হাসি যখন পায়ই তখন ইহাও প্রমাণ হইল আর্ট বামন এবং তা দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত মাপা যায় না। কেন না উহা শুধু আর্ট নয়, উহা ধর্মগ্রন্থ।—

এই যে সেন্টিমেন্ট ইহাই তো সকল যুক্তির সেরা যুক্তি।—

শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না, কিংবা বিশুদ্ধ গল্প লেখায় চিন্তাশক্তি বিসর্জন দিবারও প্রয়োজন নাই।

এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ জানিতেন না বোধ হয়। কথাকে বিকৃত করিয়া নিজের মনের মতো করিয়া না লইলে জবাব দেওয়া কঠিন হয়, তাই এ প্রয়াস।—'গল্পে চিন্তা-বিসর্জন দিবারও প্রয়োজন নাই'—ভাল কথা। কিন্তু ইহা রবীন্দ্রনাথের কথার জবাব নহে—যদিও তাহাই মনে করিয়া দিলীপকুমার নৃত্যোন্মুখ হইয়াছেন। ইহা যুক্তির ফাঁকি কেননা ইহাতে রবীন্দ্রনাথের লেখায় ইহার বিপরীত কথা নাই—ইহা মনগড়া জবাব। গল্পে চিন্তাশক্তি যাহারা বিসর্জন দেয়, তাহারা কি সাধে দেয়? নিজগুণেই দেয়। যাহারা চিন্তা করিতে জানে না, তাহারাই দেয়।

(শ, চি, পৌষ, ১৩৪০)

যখন সম্পাদক ছিলাম

এ পর্যন্ত নানা নমুনাই দেওয়া গেল তখনকার দিনের আবহাওয়ার সামান্য কিছু পরিচয় দিতে। শরৎচন্দ্রের লেখার এমন সমালোচনা, উত্তেজনাবশে। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের মাত্রা' নামক রচনাটি আসলে চিঠি, দিলীপকুমার রায়কে লেখা। শরৎচন্দ্র অথবা দিলীপকুমার কেউই এই রচনার বক্তব্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তাই শরৎচন্দ্র এর বিরুদ্ধে এক যুক্তিহীন সমালোচনা খাড়া করাতে, দিলীপকুমার অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলেন। আমার উত্তেজিত হওয়ার কারণ এটাই।

শনিবারের চিঠিতে প্রথম আগমন আমার পক্ষে শুধু অভিনব নয়, রোমাঞ্চকরও বটে। ওটা ছিল অনেক বিষয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ারও বয়স, তাই ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই সংযম থাকেনি। তা ছাড়া শ. চিঠির সুর বজায় রাখার চেষ্টাও যথেষ্ট ছিল।

শনিবারের চিঠির লেখকদের কয়েকজন আমার বিশেষ সাহায্যকারী বন্ধু-রূপে ঘনিষ্ঠ হলেন। শনিবারের চিঠির মূল স্বত্বাধিকারী অশোক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অফুরন্ত উৎসাহেরও স্বত্বাধিকারী। পূর্বে তাঁর অনেকগুলি ছদ্মনাম থাকা সত্ত্বেও পরে শুধু মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল নামেই পরিচিত হলেন। উদ্ভট কল্পনা ও কৌতুক সৃষ্টিতে তিনি অক্লান্ত ছিলেন। তাঁর 'কসমোগণি' নামক ধারাবাহিক বিবর্তন বৃত্তান্ত তার সাক্ষ্য দেবে। তাঁর কোনো লেখাতেই ক্রোধের বা উত্তেজনার আভাস পাওয়া যায় না। সরস ভাষায় মৃদু কৌতুক তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'কসমোগনি বা জাতকের গল্প' থেকে প্রথম দিকের একটু নমুনা দিচ্ছি :

প্রহর তিনেক রাত বাজে বুঝি ঐ
এ হেন সময়ে কথা তোমা সনে কই।
আকাশে চাঁদের আলো মিয়লো বুঝি
এ পাশ ও পাশ করি তোমায় খুঁজি
জাগিয়া বসিনু, বুকে কবিতা ঠাসা,
দিল্লী, আগ্রা, পারী অথবা লাসা—
যেখানেই থাক সই, তোমারই তরে
লিখিতে বসেছি চেপে কলম ধরে।—
যখন দুনিয়া ছিল জলেতে ঢাকা
চরাচর ছিল শুধু আগুনে মাখা

পাশাপাশি ছিনু মোরা শেওলারূপে
পুরানো সে ধরণীর বক্ষ কূপে।
তারপর কিলবিল কীট বা কৃমি
কঁকড়া কুমীর ছানা এবং তিমি
দাঁড়াওলা চিংড়ি কি শুঁড়ধারী ব্যাং
বিভীষণদেহ পাঁঠা চারিশত ঠ্যাং।

ইত্যাদি ইত্যাদি (পৌষ, ১৩৪০)

বিবর্তন বর্ণনার এই চেহারাটা ভাল লেগেছিল। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ভট কল্পনার একটি পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন একটি বিজ্ঞাপনে। আমার চিন্তিত চেহারা দেখে অশোকবাবু আমার নামে একটি কবিতা আরম্ভ করলেন—

গোস্বামী পরিমল আঁখি দুটি ছলছল
বেদনার অভাবেই হয়ত।

আমি বললাম বেদনার অভাবে নয়, বিজ্ঞাপনের অভাবে। তিনি বললেন চিন্তা কি, লিখে দিচ্ছি। ১৩৪১, ভাদ্র মাসের মলাট তৃতীয় পৃষ্ঠার আধপাতা খালি ছিল। অশোকবাবু বিজ্ঞাপন লিখলেন:

সাইবেরিয়ার ফুচিকা সিকা লিকা হুন
ববরব চুম চুম চুচুচুচু হুট
অবলম্বনে শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল
কর্তৃক নূতন ছন্দ আবিষ্কার—পূজা সংখ্যায়।

শনিবারের চিঠির অফিস বলতে আলাদা কিছু ছিল না, ২৫।২, মোহনবাগান রো-তে, যেমন আগে ছিল ৫, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে, আমার শোবার ঘরে। একদিকে প্রেস অন্য দিকের ঘরে আমি। তবে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে প্রিন্টিং মেশীন ছিল না, ছিল শুধু টাইপ আর কম্পোজিং-এর ব্যবস্থা। মোহনবাগান রো-তেও তাই প্রথম দিকে, তার পর এলো প্রেস। মোহনবাগান রো-তে আমার ঘরে আড্ডা বসত সবচেয়ে বেশি রবিবার সকালে। সেইখানে অশোকবাবুর বলা একটি কাহিনী আজও ভুলিনি। ডাক্তার সার নীলরতন সরকার ছিলেন তাঁর শ্বশুর। সেখানে তিনি ফোন করলে অনেক সময়েই দারোয়ান ফোন ধরত। একদিন সার নীলরতন নিজে ধরেছিলেন। অশোকবাবু তাঁকেই দারোয়ান মনে করে জিজ্ঞাসা করলেন, "দারোয়ান?"

সার নীলরতন বললেন, "আপনার দারোয়ানকে চাই? আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি।"

প্রমথনাথ বিশী, অজিতকৃষ্ণ বসুকে পেলাম নিয়মিত লেখকরূপে, তার সঙ্গে নতুন এনে প্রতিষ্ঠা করলাম 'বনফুল'কে। মোহিতলাল তো অভিভাবকরূপে সংযোগ রক্ষা করছিলেনই, তা ছাড়া সজনীকান্তও প্রায় নিয়মিত লিখতে লাগলেন। বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে তখন আর আমি পাইনি। ১৯২৫-এর পরে অনেকদিন আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। আর পেলাম ভাগলপুরের আশু দেকে, তাঁর গল্প ও নাটক ছেপেছি। বনফুলের ভাই ডাক্তার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় চমৎকার গল্প লিখত, তারও কয়েকটি গল্প আমি ছেপেছিলাম। এ ছাড়া ছিলেন নির্মলকুমার বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বায়রন) প্রভৃতি। ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য খুব চমৎকার লিখতেন, তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে একটি ওষুধের বিজ্ঞাপনে যেসব মিথ্যা দাবি করা হত তার বিরুদ্ধে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়েছিলাম। এই বিদেশী একটি সাধারণ কাসির ওষুধকে যক্ষ্মার ওষুধ বলে চালানো হত। তাদের বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে অনেক কাগজে তার গুণগানও করা হত। কিন্তু শ, চিঠিতে এই লোভ আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। বনফুলও লিখেছিল। এই দুজনের প্রবন্ধে বেশ ফলও হয়েছিল। পশুপতিবাবু নানা গুণের অধিকারী, তাঁর কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথকে চিকিৎসা করেছেন। তাঁর লেখা আমি যুগান্তরে বিশেষ সংখ্যাগুলিতে ছেপেছি। তিনি আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু এবং সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে আমার অনেক অনুরোধ রক্ষা করেছেন। এমন সহৃদয় মানুষ সহজে দেখা যায় না। পরে আসবে তাঁর কথা।

শনিবারের চিঠি ঝগড়া-বিবাদের কাগজ। তাই কয়েকটি ঝগড়া প্রবন্ধাকারে বেরুতে আরম্ভ করলে বেশ জমে উঠল। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অবশ্য একতরফা আক্রমণ চালিয়েছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্রের বিরুদ্ধে। দু' পক্ষের আক্রমণ আরম্ভ হল যতীন্দ্রমোহন দত্তের প্রবন্ধ নিয়ে। তিনি উকিল মানুষ, রসরচনা এবং মুখরোচক রচনায় সিদ্ধহস্ত। তিনি লিখলেন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে আইনের ভুল' নামক এক রচনা। তাঁর প্রতিবাদ করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী। এই নিয়ে বেশ কিছুদিন চলল। আবার মণীন্দ্রভূষণ বাগচী

লিখলেন "বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধারা" নামক প্রবন্ধ অন্য একটি কাগজের পূজা সংখ্যায়। সেই প্রবন্ধকে বিদ্রূপ করে সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর এক মস্তবড় প্রবন্ধ ছাপা হল, শ, চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ সংখ্যায়। বঙ্গশ্রী মাসিক অফিসে সুরেশ বিশ্বাসের বন্ধুরূপে সেখানে তার যাতায়াত ছিল, আমার সঙ্গে কিছু পরিচয় হল, তারপর এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে সুধাংশুপ্রকাশ প্রকৃত আত্মপ্রকাশ করল, তাকে ভাল করে চিনে ফেললাম। এবং সেই থেকে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট আছে, এবং তাকে দিয়ে অনেক লিখিয়েছি, এবং আমার 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' (১৯৭০) বইখানা তার নামে উৎসর্গ করেছি। প্রমথনাথ বিশী তখন অজস্র লিখে চলেছে। চারখানা নাটক সে লিখেছে শনিবারের চিঠিতে, তা ছাড়া 'এককলম' নামে ছোট ছোট রসরচনা, ভারী প্রবন্ধ, কয়েকটি দীর্ঘ ন্যারেটিভ কবিতা, ধারাবাহিক ব্যঙ্গ কবিতা এবং লিরিক কবিতা, কতখানি যে সহায়ক হয়েছিল আমার সম্পাদন কাজে তা আমি আজও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নতুন করে পেলাম শনিবারের চিঠিতে। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তার মৃত্যুকাল (১৯৭০) পর্যন্ত অটুট ছিল।

শনিবারের চিঠি কৃত্রিম সাহিত্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিল, এবং সেই উদ্দেশ্য, মোহিতলাল মজুমদার আমার সম্পাদনকালে, কার্তিক, ১৩৪১ সংখ্যায় 'সালতামামি' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তার একটুখানি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"চিঠি এ পর্যন্ত যাহাদের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছে, তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করিবার কারণ ঘটে নাই। যে বাদলার হাওয়া দেশে এখন প্রবল তাহাতে বহু ক্ষণজীবী পতঙ্গ ক্রমাগত জন্মিতেছে—দলপুষ্টি করিতেছে—আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিতেছে। তাহাতে বিস্মিত বা হতাশ হইবার কারণ নাই। খাঁটি সাহিত্য এক্ষণে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে—তার কারণ প্রকৃত সাহিত্যামোদীর সংখ্যা এখনও পূর্ববৎ সমান অল্প হইলেও, বর্ণজ্ঞানমাত্রসম্বল অলস বিলাসীর দল এক্ষণে এত অধিক হইয়াছে যে, চাহিদার অনুপাতে, সাহিত্যরসের অনুপাতে, আশু ফলপ্রদ মোদকের ব্যবসায় ক্রমে বিস্তারলাভ করিতেছে। ইহা অনিবার্য।—

"সাহিত্যের যে নূতন আদর্শ ও নীতি কতকগুলি বাচাল তরুণ ও বাগ্মিকা তরুণী, গরহজমের বুলি আওড়াইয়া ট্যাঁশ বাংলার সাহায্যে চারিদিকে ছড়াইতেছে এবং আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া পরস্পর পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ন করিতেছে, গম্ভীরভাবে তাহার সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই—ইহা আমরা বার বার বলিয়াছি।—বাংলা ভাষা ও

যখন সম্পাদক ছিলাম

বাংলা জাতীয় কৃষ্টির ও তথা শাশ্বত সারস্বত সাধনার অপমানকারী যেসব লেখক সাহিত্যকেই নিজেদের দুর্বল পাশব লালসা চরিতার্থ করিবার এবং সেই প্রবৃত্তি সমাজের সর্বশরীরে সংক্রামিত করিবার সহজ উপায় করিয়া লইয়াছে তাহাদের প্রতি শিষ্টতা বা মমতা প্রদর্শনের প্রবৃত্তি আমাদের নাই।

"ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অস্ত্র চালনাকালে, কোথাও সুরুচি অথবা ন্যায্য মাত্রার সীমা লঙ্ঘিত হয় নাই, এমন অন্যায় দাবী আমরা করি না। ভুল-ত্রুটি, অসংযম ও অধীরতা এরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক—ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ রচনায় কিছু অতিভাষণ থাকেই। ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি কোথায়ও অকারণ কটাক্ষপাত ঘটিয়া থাকিবে—হয়ত, কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অপ্রীতির ঝাঁজ প্রকট হইয়া থাকিবে।---"

এ সবই সমগ্রভাবে, এবং বিশেষভাবে আমার যাবতীয় ন্যায়-অন্যায় ত্রুটি-বিচ্যুতির সমর্থনেই লেখা, একথা আজ আমার স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই।

(মাঘ ১৩৭৮)

॥ তিন ॥

মোহিতলাল মজুমদারের মতে ১৯৩৩ সন পর্যন্ত (ঐ সময়ে তিনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন) তখনকার অতি-আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ কি ছিল, তা তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করেছি। এর প্রায় ৩৫ বছর পরে ১৯৬৮ সনে শনিবারের চিঠির দ্বিতীয় সম্পাদক নীরদচন্দ্র চৌধুরী যা বলেছেন, তার কিছু নমুনা না দিলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি বলছেন—

১।—উচ্চস্তরের কামের ধারণা কেহই আধুনিক, বিশেষত বর্তমান যুগের ইউরোপীয় সাহিত্য, পড়িয়া করিতে পারিবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডি-এচ-লরেন্সের "লেডি চ্যাটারলী'জ লাভার"-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহা অতি ছোটলোকের ব্যাপার। আমাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা নিজেদের অত্যন্ত ফ্যাশানেবল মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটি জাত-গোলাম আছেন, যাঁহাদের কাছে পাশ্চাত্যের আঁস্তা-কুড়ও ফুলের বাগান।

২। পাশ্চাত্য জগতে এখন কামসূত্রের বিশেষ ইজ্জৎ। সেই সেই সমাজে যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখেন বা কৌতূহলী, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ধারণা যে, কামসূত্রে হিন্দুদের মধ্যে নরনারীর সত্য ও বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এই ধারণা ভাঙাইয়া এ দেশের অনেকে বর্তমানে পয়সা করিবার ফন্দী আঁটিয়াছেন। অন্তত ইহা সত্য যে, কামসূত্র এবং গাঁজার আকর্ষণে অনেক পাশ্চাত্য নরনারী এ দেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে লোমশ বানর জাতীয় পাশ্চাত্য তীর্থযাত্রীগুলির মূর্তি সহজেই চেনা যায়।

৩।—এই বাস্তববাদ (যাহা কিছু কুৎসিত, কলঙ্কিত ও কদর্য তাহাই বাস্তব) বাংলা সাহিত্যেও দেখা দিয়াছে। এই সব গল্প উপন্যাসের লেখকেরা যদি বলিতেন যে, তাঁহারা এই সব বর্ণনা সরবরাহ করিয়া পয়সা করিতে চান, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তিই হইত না। নিজের ব্যবসা চালাইয়া পেট গুজরান বা টাকা করিবার অধিকার বেশ্যার আছে এ কথা আমি মানি।—তেমনি লেখক বেশ্যাদেরও ব্যবসা চালাইবার অধিকার আছে এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিব। ইঁহারা যেমন বিক্রেতা তেমনি খরিদদারও থাকুক।—

(বাঙালী জীবনে রমণী, ১৯৬৮)

বোঝা যায় শনিবারের চিঠির সম্পাদকরূপে নীরদচন্দ্র চৌধুরী এই জাতীয় নিম্নরুচির সাহিত্যের প্রতি যেরূপ ক্ষিপ্ত ছিলেন, এতদিন পরে তিনি বর্তমানের ঐ জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ক্ষিপ্ততর হয়েছেন। আমি তাঁর এই বিশ্লেষণকে প্রশংসা করি—সেই আগের দিনের 'মণিমুক্তা'-

সাহিত্যের বিষয়ে বিশ্লেষণকে। এখনকার দিনের রুচির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে নি, তবে সাহিত্যবিচার আদালত পর্যন্ত গড়াতে দেখে মনে হয় নিম্নরুচির প্রবাহটা এখনো আগের মতোই অথবা আরো ব্যাপকভাবে বয়ে চলেছে। নীরদবাবু সম্ভবত কিছু পরিচিত হয়েছেন। আমার নামে ১৯৬৫ সনে একটা খামে কয়েকটি ছাপা কবিতা এসেছিল, প্রেরক অপরিচিত, নাম মনে নেই এখন, কিন্তু সে কবিতা আমি নীরদবাবুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তার উত্তরে তিনি যে চিঠি দিয়েছিলেন, তা আমার 'পত্রস্মৃতি' (১৯৭১)তে ছাপা হয়েছে। ঐ একটিমাত্র নমুনা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম বলা চলে।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা যাক।

সজনীকান্তকে কেন্দ্র করে বড় একটা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, এবং সে গোষ্ঠীতে ছিলেন বিচিত্র বৃত্তির মানুষ, যদিও অধিকাংশই মাসিকপত্রের সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্পর্কযুক্ত, বাকি সবাই সজনীকান্তের ব্যক্তিগত বন্ধু।

আমি এই সময়ে মাস দুয়ের জন্য বঙ্গশ্রীর কাজেও আংশিকভাবে নিযুক্ত হয়েছিলাম, উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা ছিল না, শুধু সম্পাদকীয় প্যারাগ্রাফ লেখার কাজ। বেতন ৭৫ টাকা মাসে। অতএব শনিবারের চিঠির সম্পাদন বাদেও এখানে আমার সম্পাদন কাজের কিছু সম্প্রসারণ ঘটল। কিন্তু আমি দু'মাসের শেষে কাজ ছেড়ে দিলাম, যদিও এখানে আড্ডা জমানোর লোভ ছাড়তে পারিনি। কাজ ছেড়ে দেওয়ার হেতুটি গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু কিছু মজার। বঙ্গশ্রী কাগজের ও প্রেসের স্বত্বাধিকারী সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য যেমন ছিলেন ধনী, তেমন ছিলেন রক্ষণশীল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস, মেট্রোপলিটান ইনশিওরেন্স প্রভৃতি সবার পরিচিত। তিনি কি পরিমাণ ধনী ছিলেন তার দৃষ্টান্ত একটি প্রকাশ্য স্থানেই আছে। ভূতপূর্ব হোয়াইটঅ্যাওয়ে লেডল'এর চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত মূল্যবান বাড়িটি তাঁরই অর্থে ক্রীত। যাই হোক বঙ্গশ্রী অফিসে বা অফিসের বাইরে তাঁকে আমি তখনো দেখিনি। একদিন বঙ্গশ্রীর আড্ডায় এসে শুনলাম, সচ্চিদানন্দবাবু আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, আমি যেন তাঁর কাছে একসময় যাই। যিনি এই খবর নিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল সচ্চিদানন্দবাবু আমার সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে, এবং আমি এর পক্ষে কিনা, তা জানতে চান।

এ কথা শুনে আমি কিছু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। কারণ এমন প্রসঙ্গ উঠলে আমাকে তো বলতেই হবে আমি স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং এর দ্রুত সাফল্য কামনা করি। কিন্তু আমি এমন কথা বললে ভট্টাচার্য মহাশয়ের তা ভাল লাগবে না, এবং তাঁর মাইনে-খাওয়া ব্যক্তিটি তাঁর রক্ষণশীল মতের বিরোধী, এর পরিণাম কি হবে বুঝতে পারছিলাম। কারণ এ বিষয়ে আমার মত প্রকাশে একটা উগ্র নির্ভীকতা ছিল, তা তাঁর কাছে প্রকাশ পাওয়াটা আমার কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল না। এবং এ বিষয়ে তর্ক করে তাঁকে আমার মতে দীক্ষিত করা একেবারেই অসম্ভব, অকারণ একটি বেলা নষ্ট হবে তাতে, এই সব বিবেচনা করে, যিনি বলতে এসেছিলেন, তাঁকে তখুনি বলে দিলাম, ঠিক এই ভাষায় "আমি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতায় বিশ্বাসী, এ কথা তাঁকে জানিয়ে দেবেন, আমি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব না, এবং এই দণ্ডে আমি বঙ্গশ্রীর চাকরি ছেড়ে দিলাম। সুতরাং আর কোনো বাধ্যবাধকতা রইল না।"

এক কথায় পার্টটাইম চাকরি ছাড়া হয়ে গেল।

সজনীকান্ত দাসও এর কিছু পরে এক কথায় বঙ্গশ্রীর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে কথা পরে বলব। সচ্চিদানন্দবাবু সৎলোক ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত খামখেয়ালি ছিলেন। এই প্রসঙ্গে এর পরের কিছু ঘটনা বলছি। বঙ্গশ্রীর প্রেস ও অফিস অতঃপর লোয়ার সার্কুলার রোডে উঠে গিয়েছিল এবং বাংলা মাসিক বঙ্গশ্রী ছাড়াও ইংরেজী সাপ্তাহিক বঙ্গশ্রী বেরিয়েছিল। কিরণকুমার রায় ও সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী দুখানা কাগজই সম্পাদনা করত, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সহকারী নিযুক্ত হয়েছিল মাসিকের জন্য। কিন্তু কিরণ ও সুধাংশুর এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। তারা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণ চেপে রেখে মালিকের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে যেতে পারত। কিন্তু মানিক ছিল ভীষণ স্বতন্ত্র, তার সঙ্গে সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের বিরোধ বেধেছিল আর তার ফলে মানিক শহরতলী নামক বড় এক উপন্যাস লিখে বসল। সেখানা আমি পড়িনি, তবে শুনেছি তা নিয়ে মকদ্দমার কথা উঠেছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। সচ্চিদানন্দের শাসন ছিল প্রবল, তাঁর মতের বিরোধী কোনো প্রবন্ধ বা গল্প ছাপা নিষেধ ছিল বঙ্গশ্রীতে। এমন কি তিনি যখন নিজে বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন বাংলা ও

ইংরেজী বঙ্গশ্রীতে, তখন ভাষায় ভুল থাকলেও কিরণ বা সুধাংশুপ্রকাশ তা সংশোধন করতে সাহস পেত না।

আমি একবার কিরণের অনুরোধে পুজো সংখ্যার জন্য একটি গল্প লিখেছিলাম, সেটি দু'তিনদিন পরে আমি ওদের অফিসে গেলে কিরণ আমাকে ফেরৎ দিল। বলল, ভট্টাচার্য মশাই ভাববেন ও গল্প ভট্টাচার্য চৌধুরীর পার্টনারশিপ নিয়ে ব্যঙ্গ করা। তাঁদের পার্টনারশিপে কিছু গণ্ডগোল ছিল কি ছিল না, আমার সে বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না, তাঁদের সঙ্গে কখনো পরিচয়ও ছিল না, সেজন্য আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু এই গল্প নিয়ে বেশ মজার একটি ঘটনা ঘটে গেল। সুধাংশুর বন্ধু বরুণ মিত্র সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্যামবাজারের দিকে যাবেন শুনে তাঁর গাড়িতে এসে আপার সার্কুলার রোডে প্রবাসী অফিসের সামনে নেমে পড়লাম। তিনি আমারও পরিচিত ছিলেন।

গিয়ে দেখি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বাগল মনোযোগ দিয়ে সম্পাদকীয় কাজে মেতে আছেন। আর এক পাশে মর্ডান রিভিউএর শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা কাজ করছেন। আমি যেতেই ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "পরিমলদা (আমাকে ঐ ভাবেই সম্বোধন করতেন, বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও)—প্রবাসীর জন্য একটা গল্প পাব ?" আমি তো এ কথা শুনে অবাক। গল্পই তো পকেটে ছিল। যোগাযোগটা অদ্ভুত। পকেট থেকে বার করে দিলাম আমার 'কম্বল ও পানু।' ১৯৪০ সনে সেটি ছাপা হওয়ার পরে বন্ধুবর সত্যেন্দ্র সেনগুপ্ত (তখন তিনি সত্যচরণ লাহার সেক্রেটারি, বিজ্ঞানের ছাত্র) একদিন বললেন, 'আপনি—লাহাদের নিয়ে লিখেছেন নাকি ?' কয়েকদিন পরে নিখিলচন্দ্র দাস (যাঁকে বাদ দিয়ে আমার কোনো স্মৃতিকথাই লেখা চলেনি) বললেন, 'আমাকে আর সজনী দাসকে নিয়ে লেখাটা উপভোগ করেছি।'

প্রথমত এই তিনটি ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের "রসিকতার ফলাফল" রচনাটির সার্থকতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা গেল, দ্বিতীয়ত বোঝা গেল বাঙালী ব্যবসায়ীদের যেখানেই পার্টনারশিপে কারবার, সম্ভবত সেখানেই বিরোধের একতা।

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে সুধা

আলোচনা না করে আমি যেমন বঙ্গশ্রীর চাকরি ছেড়েছিলাম, সজনীকান্ত অন্য আর এক কারণে বঙ্গশ্রীর চাকরি ছাড়লেন। বঙ্গশ্রী অফিসে সজনীকান্ত আমাকে একটি বড় গল্প পড়তে দিলেন, লেখক মেঘেন্দ্রলাল রায়। গল্পটি দেখেই বললাম, এটি মেঘেন্দ্রবাবু আমাকে শনিবারের চিঠির জন্য নিজে এসে দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু শনিবারের চিঠিতে সে গল্প ছাপা চলবে না বলে ফেরৎ দিয়েছিলাম। তিনি বোধ হয় দিন সাতেক আগে আমার কাছ থেকে ফেরৎ নিয়ে গেছেন।

তারপর অনুমান করি, মেঘেন্দ্রবাবু সজনীকান্তের কাছে না এসে সোজা মালিকের কাছে গল্পটি দিয়ে এসেছিলেন, কারণ সজনীকান্তের কাছে ঐ গল্প সচ্চিদানন্দই পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, গল্পটি চমৎকার, বঙ্গশ্রীতে ছাপবেন।

এর পরদিনই দেখি সজনীবাবু টেলিফোনে ঐ গল্প নিয়ে সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করছেন। টেলিফোনের অপর প্রান্তে সচ্চিদানন্দবাবু সম্ভবত বলেছিলেন, "গল্প ভাল কি মন্দ হল, তা কি আপনার কাছে শিখতে হবে?" কারণ সজনীকান্তের উত্তরটি আমি পাশের ঘর থেকে শুনছিলাম, "হ্যাঁ, তা আমি আপনাকে শেখাতে পারি।"

সজনীকান্তের ছোট্ট ঘরে তখন নিখিলচন্দ্র দাস উপস্থিত। নিখিলবাবুও ঐ গল্প পড়ে ছাপতে নিষেধ করাতে সজনীকান্ত মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছাড়লেন। চাকরি ছাড়লেন, এবং নিখিলবাবুর সঙ্গে পার্টনারশিপে আবদ্ধ হওয়ার পর নিখিলবাবুকেও ছাড়লেন। নিখিলবাবু ভাবপ্রবণ। এমন ঘটনা যে বাস্তবজীবনে ঘটে তা বিশ্বাস করতে দেরি হয়েছিল তাঁর। হাসিয়ে দিলে নিখিলবাবু হাস্যরত অবস্থায় প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে পাশের লোককে মারতে থাকেন। সজনীবাবুকেও তিনি অনেকবার মেরেছেন—এইবার সজনীবাবু তাঁকে মারলেন। ঘটনা কি ঘটেছিল নিখিলবাবুর কাছে লিখিত-ভাবে জানাতে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি এই প্রসঙ্গে আমাকে গড়িয়া থেকে যে চিঠি দিয়েছেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

পরিমলবাবু, আপনার ১২।১১।৭২র কার্ড ১৬।১১।৭১ তারিখে পেলাম।—আদেশ শিরোধার্য।—মেঘেন্দ্রলাল রায়ের একটি গল্প সজনীবাবু আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। আমি নিষেধ করলাম, কারণ গল্পটি মোটেই ভাল লাগল না। বললাম সম্পাদক আপনি,

ছাপা হলে আপনারই দুর্নাম হবে। এই নিয়ে ফোনে ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি। এবং তিনি আদেশ করলেন চাকরি ছেড়ে দিন। সজনীবাবু তথাস্তু করলেন। তখুনি ইস্তফাপত্র লেখা হল, এবং আমার গাড়িতে আমরা দুজনে চললাম পোলোক স্ট্রীটে। আমি গাড়িতে রইলাম সজনীবাবু ইস্তফাপত্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের হাতে দিয়ে এলেন। ফেরার পথে দুজনের পরামর্শ হল। ঠিক হল সজনীবাবু এবং আমি দুজনে মিলে আমার নিয়মিত কাজ স্ট্যাণ্ডার্ড লিটেরচার কম্পানির বই, সেই সঙ্গে কিছু দুষ্প্রাপ্য বই বিক্রি করে উপার্জনের সমান সমান ভাগ দুজনে নেব। মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ও সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে গাড়ির মধ্যেই পাকা কথা হল, সজনীবাবু ও আমি দুজনে সমান অংশীদার রূপে শনিবারের চিঠির মালিক। ভগবান সাক্ষী রেখে সজনীবাবু অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। স্বয়ং ভগবান সাক্ষী, দলিলপত্রের প্রশ্নই ওঠে না। এই সময় শনিবারের চিঠিতে স্বত্বাধিকারীর নামও ছাপা হচ্ছিল। সম্পাদক আপনি, আপনার নাম প্রথম থেকেই আছে। কিন্তু পরবর্তী সংখ্যায় আমার নাম তো দেখলাম না। এতে তখনো মনে কিছু করিনি। তাঁর উপর আমার গভীর আস্থা। আমাদের কম্পানির নাম হয়েছিল দাস অ্যাণ্ড কোং। অফিস খুলেছিলাম বি-৩, ভারত ভবনে। আমি এর পর বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছি, এমন সময় সজনীবাবুর একখানা চিঠি এলো শনিবারের চিঠির কাগজে। চিঠি এখনো আমার কাছে আছে :

"Dear Mr. Das······I hereby declare that I sever all connections···of Das & Co. which I and you jointly started···" (30-5-35)

চিঠিতে শনিবারের চিঠির মালিকানা সংক্রান্ত একটি কথাও নেই।—একমাত্র সাক্ষী ছিলেন বেচারা ভগবান।

নিখিলচন্দ্র দাস

এই প্রসঙ্গে কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সজনীকান্তের পার্টনারশিপের কথাটাও বলা দরকার। বনফুল আমাকে ঐ ১৯৩৫ সনেই এক চিঠি লিখল, কপিল একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করতে চায়, তোমার পরামর্শ দরকার। আমি লিখলাম পৃথক কিছু না করে শনিবারের চিঠির সঙ্গে মিললে কেমন হয়। সজনীকান্ত বঙ্গশ্রীভ্রষ্ট। শনিবারের চিঠি ও এখানকার প্রকাশন বিভাগ ও প্রেস সব-কিছুর সঙ্গে পার্টনারশিপ হলে কাগজখানাকে আরো বড় করে তোলা যায়। কপিলপ্রসাদের ও সজনীকান্তের দুজনেরই জিনিসটা খুব পছন্দ হল। এখানেও দলিল লেখা হল না। কপিলপ্রসাদ টাকা অগ্রিম দিলেন, সেই টাকায় 'বনফুলের কবিতা' ও 'তৃণখণ্ড' ও কপিলপ্রসাদের 'ঘলেটিমলের তাঁবেদারী' ছাপা হল। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় নূতন পত্রিকা নামক সাপ্তাহিক বেরুল ২৪শে জানুয়ারি ১৯৩৬

থেকে। শনিবারের চিঠির অফিস ও নূতন পত্রিকার অফিস হল আমার শোবার ঘরে।

তার কিছুকাল পরে (তারিখ মনে নেই) পার্টনারশিপ ভেঙে গেল। কপিলপ্রসাদের কাছে শুনেছিলাম ছয় হাজার টাকা তাঁর দেওয়া হয়েছে। মকদ্দমাও হয়েছিল, কিন্তু কিছু প্রমাণ হল না।

তবে শনিবারের চিঠির প্রেস হওয়াতে সজনীকান্ত এদিকেই মন দিলেন একা—অংশীদার নেই কেউ তখন। প্রেস হওয়ার মূলে আমার একটি লেখা। এটি শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছিল ফাল্গুন ১৩৪১ (মার্চ ১৯৩৫) সংখ্যায়। লেখাটি প্রসঙ্গকথার অন্তর্ভুক্ত, নাম Bengal Speaks। এই নামটি দেওয়া হয়েছিল Africa Speaks নামক একটি সিনেমাছবির অনুকরণে। ঐ ছবিটি সে সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, আফ্রিকার জন্তু-জানোয়ারের দৃশ্য ও কাহিনী ছিল ছবিটিতে।

এইটি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সজনীকান্তের সঙ্গে একান্তে দেখা করে অনেক পরামর্শ করেছিলেন মনে আছে। কিন্তু আমার ঐ লেখার সঙ্গে যে তার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকতে পারে এমন কথা মনে হয়নি, মনে হবার কোনো কারণও ঘটেনি। তবে একদা আমার সহপাঠী সাবিত্রীপ্রসন্নের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে পরিচিত থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার সঙ্গে সেদিন আলাপ করেননি, সাধারণ কুশলাদি প্রশ্ন ছাড়া। পরে সজনীকান্ত আমাকে বলেছিলেন সব খুলে, ১৯৩৬ সনে। শুনেছিলাম নলিনীরঞ্জন সরকার ঐ লেখাটি পড়ে খুব খুশি হয়েছিলেন, এবং সাবিত্রী-প্রসন্নের মারফৎ সজনীকান্তকে দুই হাজার টাকা দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন। লেখাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত না করলে ঘটনাটা ঠিক বোঝা যাবে না। মনে রাখতে হবে নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে তখন মকদ্দমা চলছে, এমন একটি ঘটনা নিয়ে খুব কুরুচিপূর্ণ একখানি পুস্তিকা বেরিয়েছিল সে সময়। আমি একদিন এসপ্ল্যানেডের ট্রামের আড্ডায় ট্রাম বদল করে আর এক ট্রামে উঠেছি, এমন সময় ঐ পুস্তিকার ফেরিওয়ালা প্রকাশ্যে নলিনীরঞ্জন সরকারের নামে কুৎসা উচ্চারণ করে পুস্তিকাগুলি ট্রাম যাত্রীদের মুখের কাছে ধরছিল। মহিলাদের সামনে এসেও ঐ চিৎকার করাতে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম ট্রামের যাত্রীরা আমার উপরেই খাপ্পা হয়ে উঠলেন।

তারপরে ঘরে ফিরেই ঐ লেখাটি লিখেছিলাম। লেখাটির ভূমিকা করেছিলাম বছর তিনেক আগের একটি কাহিনী বিবৃত করে। সে কাহিনী এই ; তৎকালীন মেট্রোপলিটান ইন্সটিট্যুউশন বালিকা বিভাগের শিক্ষিকা রেণু দত্তমজুমদার আমাকে একদিন বলেছিল, পথে চলতে কোনো কোনো তরুণ সাইকেলে পাশ দিয়ে যেতে অভদ্র কথা উচ্চারণ করে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে দেয়। এ রকম অভিজ্ঞতা তার এবং অন্য অনেকের হয়ে থাকে প্রতিদিন। বিষয়টি কাগজে আলোচনা হলে ভাল হয়। আমার বোন মঞ্জু ও রেণু তখন গড়পারে পূর্ণিমা বসাকের বাড়ির একটি ঘর নিয়ে থাকত। আমি বললাম, একখানা চিঠিতে সব ঘটনা খুব সংক্ষেপে লিখে দাও। আমি সে সময়ে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা'র প্রায় নিয়মিত লেখক। কিরণকুমার রায় (যার বিষয়ে পত্রস্মৃতিতে একটি অধ্যায় লিখেছি, সে তখন উপাসনার সহকারী সম্পাদক, গত ২৯।৮।৭১ তার মৃত্যু ঘটেছে)। ঐখানেই প্রথম সরোজকুমার রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সে তখন নবশক্তি নামক তখনকার বিখ্যাত সাপ্তাহিকের সম্পাদক। ঐ কাগজেও আমি প্রায় নিয়মিত লিখতাম এবং শিয়ালদর কাছে সার্কুলার রোডে তাদের অফিসে তার কাছে প্রায় রোজই যেতাম। সেও আসত 'উপাসনা'তে। উপন্যাস ও গল্প লেখকরূপে সরোজ তখনই খ্যাতিলাভ করেছে, উপরন্তু রাজনীতি করে ইংরেজ সরকারের খাতায় কুখ্যাতি লাভও করেছে। ঐ ঠিকানা থেকে বঙ্গবাণী নামক দৈনিক কাগজও প্রকাশিত হত। এবং সে ঘরেও গিয়েছি মাঝে মাঝে। দেখেছি প্রেমেন্দ্র মিত্র, শশাঙ্কমোহন চৌধুরী, গোপাল সান্যাল প্রভৃতি লেখক নিজ নিজ আসনে কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষাগৃহে প্রশ্নের উত্তর লেখার মতো মনোযোগ দিয়ে লেখায় ব্যস্ত।

সরোজকুমার তার নবশক্তিতে রেণুর চিঠি ছাপার পরের খবর ভূমিকা-স্বরূপ দিয়ে আমার সেই শনিবারের চিঠির প্রসঙ্গ কথা (Bengal Speaks)। আশা করি এবারে পুরো পটভূমিটির পরিচয় দিতে পেরেছি। এবারে কিছু উদ্ধৃতি :

.. সে তিন বৎসর পূর্বের কথা। প্রাণ দিয়া নারীর সম্মান রক্ষা করিবার মত বাঙালী যুবক তখনো ছিল, কিন্তু ১৯৩৫ সালে আর নাই। থাকিলে—প্রতিদিন কতকগুলি অশ্লীল কেতাবের হিন্দুস্থানী এবং বাঙালী ফেরিওয়ালা, মহিলা-আরোহীপূর্ণ ট্রাম ও বাস-এর

নিকট আসিয়া যে সব কথা উচ্চারণ করিয়া মহিলাদিগকে অতি হীনভাবে অপমানিত করিতেছে, তাহা করিতে পারিত না।—

কয়েকজন ভাড়াকরা অশিক্ষিত কেবিওয়ালার অশ্লীল ভাষা ভদ্র বাঙালী সন্তান ট্রামে বসিয়া উৎসাহের সঙ্গে উপভোগ করিতেছে—মহিলাদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করিয়া। দেখিয়া অনেক কথাই মনে আসিতেছে—

ব্যভিচার প্রমাণও হয় নাই, মকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ব্যভিচারের আভাসটাই এখানে প্রধান। আচম্বিতে বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। একটি বাঙালী মহিলা বা ভদ্রলোক জগৎ সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইবে ইহার চেয়ে মহৎ আকাঙ্ক্ষা আর কি হইতে পারে।—

সরোজকুমার সমস্ত চিঠির তাড়াটাই আমাকে দিয়েছিল এডিট করার জন্য। আমি তা থেকে কয়েকখানি ভদ্র চিঠির আকার কিছু কমিয়ে দিয়েছিলাম। সেগুলি ছাপার পর, এর জের বেশিদিন টানার আর দরকার হয়নি। প্রায় ঐ সময়েই একদিন বা কিছু পরে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট দিয়ে চলতে হঠাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে এক বইয়ের দোকান থেকে ডাকলেন। দোকানে উঠে গিয়ে দেখি এক মহিলা বসে আছেন সেখানে। (১৯৩৩ বা ৩৪, ৩৫ও হতে পারে) এবং দোকানটা এম সি সরকার সম্ভবত, এখন আর মনে আনতে পারছি না। বিভূতিবাবু ঐ মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন. নাম চপলা দেবী। বললেন, "মনে আছে এঁর কথা? ঢাকায় এঁরা দুই মহিলা এক গুণ্ডার সঙ্গে লড়ে বঁটি দিয়ে তাকে আক্রমণ করেন?" অবাক হয়ে মহিলার দিকে চেয়ে বললাম, "খুব মনে আছে, কাগজে আপনাদের ছবি বেরিয়েছিল সে সময় দেখেছি, মনে আছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে কখনো দেখা হবে ভাবিনি।" শুনলাম তিনি কলকাতা এসেছেন লেখাপড়া শিখেছেন এবং শিক্ষিকা হয়েছেন। আগের ছবিতে দেখা চেহারার সঙ্গে কোনো মিল নেই। স্বাস্থ্য অনেক উন্নত দেখলাম।

এঁর সঙ্গে অর্থাৎ এই বীরাঙ্গনার সঙ্গে পরিচয় হল এবং সেই উপলক্ষেই তাঁকে নবশক্তিতে প্রকাশিত সেই আলোচনার বিষয় উত্থাপন করে, তাঁর মতে মহিলাদের এমন অবস্থায় কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি নিজের একটি ঘটনা বললেন, যা কিছুদিন আগে এই কলকাতাতেই ঘটেছিল। সে সময় বাসের ভিতর সামনের দিকে একখানা করে আয়না

লাগানো থাকত। তিনি নিজ আসন থেকে দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি আয়নায় তাঁর দিকে চেয়ে কিছু অভদ্র ইঙ্গিত করছে। তিনি দেখামাত্র পা থেকে জুতো খুলে ঐ আয়নাতেই তাকে সেটি দেখিয়ে দিলেন। লোকটি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। চপলা দেবী বললেন, "এটাই একমাত্র প্রতিকার, তবে সাইকেলে যারা পালায় তাদের অগ্রাহ্য করে চলাই ভাল।"

কম্বল ও পান্নু থেকে পার্টনারশিপ—মাঝখানে এতগুলি কথা এসে গেল। সজনীকান্ত গোড়াতেই নিখিলবাবু অথবা কপিলপ্রসাদের সঙ্গে পার্টনারশিপে এসেই তা ভেঙে দেওয়াতে তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ যৌথ কারবার বাঙালীর মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না। প্রথমে মনে হয় ঠিক হবে, শেষে অনুতাপ করতে হয়। তাই ও ব্যাপারটা গোড়াতেই চুকিয়ে দেওয়া ভাল। আত্মহত্যায় যাদের প্রবণতা বেশি তারা প্রথম বয়সেই যে-কোনো তুচ্ছ উপলক্ষে, পরীক্ষায় ফেল করে অথবা প্রণয়ে ফেল করেই আত্মহত্যা করে। এ প্রথা ভাল। কারণ পরে সংসারে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রী সন্তানাদিকে পথে বসিয়ে আত্মহত্যা করলে পাপ আরো বাড়ে। এ জন্য মনে হয় নিখিলচন্দ্র দাস এবং কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য—দুজনেরই সজনীকান্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ পার্টনারশিপটি দুটি ক্ষেত্রেই অল্প বয়সে আত্মহত্যা করেছিল। আমার কম্বল ও পান্নু (ট্রামের সেই লোকটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) যখন লিখি, তখন কোনো ব্যক্তি-বিশেষের পার্টনারশিপের প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না, মনেও পড়েনি পরিচিত কারো কথা। এটি বহুদিনের বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গল্পলেখার সময় সেইটিই মনে ছিল।

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সামাজিক রক্ষণশীলতা উগ্র রকমের ছিল, এটি তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। তিনি এ বিষয়ে আন্তরিক ছিলেন, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চলে যাওয়ার পর সম্পাদক কিরণকুমার রায় ও সহকারী সম্পাদক সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীকেও যেতে হল। এরা দুজনেই তার আগে সচ্চিদানন্দ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছিল তাঁর বাড়িতে, শুধু কিরণ গিয়েছিল। তারপর যখন সচ্চিদানন্দ জানতে পারলেন এরা দুজনেই অনাচারী, হোটেলেও খায়, কিছুই মানে না, তখন তাদের আর রাখা চলল না। বঙ্গশ্রীও পরে বন্ধ হয়ে গেল। তাই আমার মনে হয় আমার অদৃশ্য নিয়োগ-

কার্রীর ডাকে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করে বিদায় হওয়ার চেয়ে, যা করেছিলাম সেটাই আমার পক্ষে ভাল হয়েছিল।

শনিবারের চিঠির বাড়িতে অথবা বঙ্গশ্রীর বাড়িতে যে আড্ডা বসত তাতে আলাপ আলোচনার বিষয়ের অন্ত ছিল না। এ রকম আড্ডায় লেখকদের খুব উপকার হত। অনেক গল্পের প্লট হঠাৎ মনে এসে যেত। অনেকের প্রবন্ধ লেখার বিষয় পর্যন্ত মনে মনে ঠিক হয়ে যেত নানা আলোচনা থেকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে একদিন যে কাণ্ড ঘটেছিল, তা থেকে আমার 'প্ল্যান' গল্পের প্লট পেয়েছিলাম। গল্পটি ক্লাইভ স্ট্রীট নামক নতুন একখানা বাংলা মাসিকের জন্য লিখে এনেছিলাম এবং বঙ্গশ্রী থেকেই সেই কাগজের সম্পাদক আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন এই রকম কথা ছিল। কিন্তু আমার খুব বাসনা হল সজনীকান্তকে আগে পড়ে শোনাই। ফলে গল্পটি বঙ্গশ্রীতেই ছাপা হল (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ ইং ১৯৩৩)। পরে আমার প্রথম বই 'বুদবুদ' (১৯৩৬) নামক গল্পের বইতে সঙ্কলিত হয়েছিল। বিভূতিবাবু বঙ্গশ্রীতে এসেই একদিন বলেছিলেন, "আমি ব্যবসা করব।" ঘরভরা লোক। শেষ পর্যন্ত আ মি ব্য ব সা ক র ব না—বলে চিৎকার করে উঠে তবে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন সবার আক্রমণ থেকে। প্ল্যান গল্পটি সেই ঘটনা নিয়েই লেখা।

একদিন অধ্যাপক সুকুমার সেন আমাকে তাঁর একটি আবিষ্কারের কথা শোনালেন। তিনি একটি কবিতা বেশ কিছুক্ষণ পড়লেন। ভাল লাগল, ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গির সযত্ন-বিন্যস্ত শব্দসম্পদ ও ছন্দোঝঙ্কারে মধুর লাগল। সুকুমারবাবু বললেন কবিতাটি তিনি নিচের দিক থেকে উপরের দিকে পড়েছেন। বঙ্গশ্রীতে ছাপা সে কবিতা ডকটর সুশীলকুমার দের লেখা। আমি শেষে নিজে পড়লাম। অর্থে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। তার কারণ প্রত্যেক ছত্রই যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অর্থ বহন করছে। আবেগ কম, ভাষা ও ছন্দের দিকে লক্ষ্য বেশি। বর্ণনাপ্রধান কবিতা। আমি কিছু নমুনা দিচ্ছি:

> অর্ঘ্যটি ধরি' স্বর্গের মাঝে সুধাভরে ছিল ক্ষুধালীনা,
> প্রেমমন্দিরে মন্ত্রবিহীনা ছিল উপাসিকা উদাসীনা;
> তারে ফেলে রেখে চলে গেলে তুমি কোন্ দূরে,
> পড়েছে কি মনে কখনো পুরান জীবনে-জড়ান বন্ধুরে।

এটি 'পত্রলেখা' নামক দীর্ঘ কবিতার শেষ চারটি ছত্র। সুকুমারবাবুর এই আবিষ্কারটি আমার কাছে অভিনব বোধ হয়েছিল।

অনেক মজার ঘটনা মনে পড়ে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি গল্প (নাম অরিন্দমের মৃত্যু) বিষয়ে কিছু রসিকতা করতে গিয়ে আর এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। নায়ক আত্মহত্যা করবে, নিজের মনে বার বার তার সেই কথা জাগছে। বড় গল্পটি থেকে, কতবার সে মৃত্যুর কথা ভেবেছে, গুনে দেখা গেল, ২৫ বার। সমগ্র গল্পের সঙ্গে এই আত্মসম্মোহনের কাজে কিছু মাত্র অসঙ্গতি ছিল না। কিন্তু সে ছিল কাউয়ার্ড (কাউয়ার্ড না হলে কে আর আত্মহত্যা করে?) তাই আসল মৃত্যুর আগে জুলিয়াস সীজারের যে কাউয়ার্ড "মেনি টাইমস" মারা যায়, সেই মেনি টাইমস হিসেব করে দেখা গেল অচিন্ত্যবাবুর গল্পের ক্ষেত্রে হয়েছে ২৫ বার। রসিকতার লক্ষ্য ছিল এইটুকুই। ২৫টি মৃত্যুবাসনার উদ্ধৃতি দিয়ে নিচে শুধু লিখে দিয়েছিলাম Cowards die 25 times before their death.

কিন্তু যখন এ লেখাটির প্রথম প্রুফ এলো, তখন দেখি 25এর স্থলে many কথাটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বসিয়ে দিয়েছেন কম্পোজিটর বৈকুণ্ঠবাবু। এই একটি স্থলে তিনি ভুল করেছিলেন, নির্ভুল শব্দটি বসিয়ে। বৈকুণ্ঠবাবুর কম্পোজিং ছিল নিখুঁত, প্রুফ না দেখলেও চলত, এত সুন্দর। এ রকম কদাচিৎ দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে কম্পোজিটর আরো দু একজনের কথা মনে পড়ে। সুরেশ নামক এক কম্পোজিটর ছিলেন বঙ্গশ্রী প্রেসে। তিনিও খুব নিখুঁত কাজ করতেন, এবং মূল লেখায় ভুল থাকলে শুদ্ধ করে দিতেন। বঙ্গশ্রীর দোতলায় ছিল অফিস, নিচে ছিল প্রেস। সুরেশবাবু প্রুফ তুলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে একদিন আপন মনেই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলছিলেন, বাবুরা সব লেখক হয়েছেন, একটা বানান জানেন না।

আবার এর বিপরীতও দুর্লভ নয়। সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর মুখে শুনেছি, কোনো কম্পোজিটর মূল ইংরেজী theme শব্দটির শেষ অক্ষরটি বাদ দিয়ে কম্পোজ করেছিলেন। যিনি ছাপতে দিয়েছিলেন তিনি প্রুফে আবার শেষের "e" অক্ষরটি বসিয়ে দেওয়াতে কম্পোজিটর ভীষণ ক্রুদ্ধ। বলেছিলেন, them লিখতে যদি শেষে আরো একটা e বসান, আমি

আর কি করতে পারি, অল্প মাইনের মানুষ আমরা—ইত্যাদি।

অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব সাব-এডিটর প্রফুল্ল মিত্রের মুখে আরো ভয়ানক এক কাহিনী শুনেছি। শ্যামবাজারের কোনো এক প্রেসে একখানা মেডিক্যাল বই ছাপা হচ্ছিল। যাঁর লেখা তিনি শেষ প্রুফ দেখে ছাপার অর্ডার দিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু যখন ছাপা ফর্মা হাতে এলো, তখন দেখেন তাঁর লেখা pubic hair যত জায়গায় ছিল, সমস্ত public hair ছাপা হয়েছে। এটি সম্ভবত প্রুফ রীডারের কাজ। যাই হোক ফর্মা বাতিল করে আবার ছাপতে হয়েছিল, প্রফুল্ল মিত্র বললেন। ছাপার ভুলে কি পরিমাণ কৌতুক সৃষ্টি হয় তা বিদেশী ইংরেজী সাপ্তাহিক কাগজে নিয়মিত সঙ্কলিত হতে দেখেছি।

ছদ্মনামের কথা কিছু কিছু আগে বলেছি। আমি নিজে প্রায় বেনামা লিখতাম। মাঝে মাঝে পরাশর শর্মা। তারাশঙ্কর ছিল হাবু শর্মা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমার নামের সঙ্গে সহকারী সম্পাদক রূপে ছাপা হতে লাগল ১৯৩৪ সেপ্টেম্বর সংখ্যা থেকে জানুয়ারি ১৯৩৫ সংখ্যা পর্যন্ত—বাংলা ভাদ্র ১৩৪১ থেকে পৌষ ১৩৪১ সংখ্যা, মোট পাঁচ মাস। তারাশঙ্কর এই সময় ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে বিপজ্জনক ছিল। কলকাতা বাসের হেতু কি এবং কলকাতা বাসের সংস্থান কি, এসব গুরুতর প্রশ্নের সহজ মীমাংসা হল খাতায় নাম লেখানোয়। বোধহয় সজনীকান্তের হিসাবে মিথ্যা করে একটা বেতনের কথাও লেখা থাকত।

আমার সহায়করূপে আগের যুগের প্রায় সবাই রইলেন, কিন্তু আড্ডা ভাগ হয়ে যাওয়াতে বঙ্গশ্রীতেই প্রায় সবাই এসে জুটলেন, এবং তার সঙ্গে আমিও। শনিবারের চিঠিতে লেখকরূপে রইলেন, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী ইত্যাদি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও লিখেছেন। বনফুলকে এনে প্রতিষ্ঠা করার পর অজস্র লেখা বর্ষিত হতে লাগল তার কলম থেকে। অজিতকৃষ্ণ বসুর (তখন সে স্কটিশ চার্চেস কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র) এক কবিতা আমার আমলের প্রথম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৩৯) ছাপা হল। এটি আমার এত ভাল লাগল যে, তার পর থেকে সে যা লিখেছে তা না পড়েই প্রেসে দিয়ে দিয়েছি। কবিতাটির নাম 'মানসাঙ্ক'। কিছু বাদ দিয়ে

কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি। এ কবিতাটি বেনামা ছাপা নয়। পরে তার অন্য লেখায় 'অক্রূর' ছদ্মনাম থাকত। অজিতকৃষ্ণকে তখনো আমি দেখিনি। যে কবিতার কথা বলছিলাম—

হেদোর উত্তরধারে গাছের ছায়ার তলে বসি
একলা দুপুরবেলা মনে মনে মানসাঙ্ক কষি।
এগারোটা গেছে বুঝি বেজে।
সরু সরু ছেলেগুলো মোটা মোটা বই হাতে
ঢুকিতেছে পাশের কলেজে।
আকাশে একটা রবি, আরেকটা হেদোর পুকুরে
আকাশের তপ্ত আলো নাচে পুকুরের বুক জুড়ে,
পড়ে রোদ গাছের মাথায়।
মাঝে মাঝে হাওয়া বয়,
গরম দুপুরে' হাওয়া নাড়া দেয় পাতায় পাতায়।…
একসের দুধ যদি দেয় রোজ পাঁচ পোয়া বলে,
গোয়ালাটা একমাসে কত সের ঠকায় তা হলে?
চুলকাই মাথা আর করমুলা লাগাই কেবল,
কিছুতে বুঝিনে তবু এ আঁকের কত হবে ফল।…
ওকে ছেড়ে অন্য আঁক কষি
হেদোর উত্তরধারে গাছের ছায়ার তলে বসি।
ওপারের রাজপথে চলে ট্যাক্সি, ট্রাম চলে কত,
চলে বাস, রিকসা আর পায়েহাঁটা পান্থ অবিরত।
দেখে আমি হেসে মরি, আর ভ বি, হায় মূর্খ হায়,
তোমরা মরিছ ঘুরে, এ ভবের গোলকধাঁধায়।
আমি দেখ কি আরামে গাছের ছায়ার তলে বসে
দুনিয়ার দুঃখ ভুলি মনে মনে মানসাঙ্ক কষে।
এস গো পথিক এসো, এসো কলেজের ছেলেমেয়ে,
হেদোর উত্তরধারে তোমরা সবাই এসো ধেয়ে।
পথিক, তোমার হাঁটা এখন ক্ষণেক বন্ধ থাক,
কলেজের ছেলেমেয়ে, তোমাদের পার্সেন্টেজ যাক,
এইখানে এসে, মোর সনে—
গাছের তলায় বসে মানসাঙ্ক কষ মনে মনে।

উত্তপ্ত অলস মধ্যাহ্নের উদাস করা পরিবেশের অনুভূতিটি ভারি সুন্দর ভাবে ফুটেছে, অথচ এর মধ্যে একটি অতি ক্ষীণ ট্র্যাজিডির সুরও ফল্গুর

মতো প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এবং আংশিক উদ্ধৃতিতেও তা মনকে উদাস করে দেয়। এই কবিতা দেখে তখনকার অপরিচিত লেখকের ক্ষমতার প্রতি আপনা থেকেই একটা আস্থা এসে গিয়েছিল।

আর এক নতুন লেখককে প্রথম দিন থেকেই ডেকে এনেছিলাম, নাম অতুলানন্দ চক্রবর্তী, আমার সহপাঠী ১৯১৫ সন থেকে। পাবনা কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর কলেজ—একই সঙ্গে, তারপর আমি যখন শনিবারের চিঠিতে আসি, তখন তাকে এই পাপ কাজে প্রবৃত্ত করাই। তখন সে গবেষণার জন্য শাস্ত্রাদি পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী। তাকে দিয়ে প্রথম বাংলা প্রবন্ধ লেখাই। প্রবন্ধের নাম রূপজীবিনী। সকল শাস্ত্র এবং সমসাময়িক নানা মন্তব্য বা ভাষণের ফুটনোট সম্বলিত এই রচনাটিতে সমাজে রূপজীবিনীর স্থান নির্ণয় অতি আকর্ষক ভাষায় সে লিখেছিল। কিন্তু বাংলা ভাষার চেয়েও ইংরেজী ভাষায় তার প্রকাশ সহজ মনে হওয়াতে এবং মন হিন্দু-মুসলমান সমস্যার দিকে ঘুরে যাওয়াতে তাকে বাংলা ভাষার সীমানা থেকে ছেড়ে দিতে হল। তারপর থেকে সে হয়েছে গ্রন্থকার এবং এরও পরে রাজনীতির দৃষ্টিতে সমাজকে দেখার মন থেকে পর পর অনেকগুলি পুস্তক সে লিখেছে। তার কয়েকখানা পুস্তকের হিসাব দিচ্ছি—

1. Cultural Fellowship in India (Thacker, Spink) 1934, 2. Hindus and Muslims in India (do) 1940, 3. Not by Politics Alone (do) 1944, 4. Thoughts on Indian Education (Govt. of India) 1955, 5. Nehru, his Democracy and India (do) 1961, 6. India since 1947 (Allied Publishers) 1967, 7. Lonesome Pilgrim (do) 1969.

এ ছাড়া ছোট বই অনেক। অতুলানন্দ যদি কখনো আত্মজীবনী লেখে তবে "এ পথে কেন এলাম" নামক কোনো অধ্যায়ে আশা করি প্রলুব্ধকারীরূপে আমার নাম একবার স্মরণ করবে। হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে সে সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রও প্রকাশ করেছিল "কংকর্ড" নামে। সে অবশ্য অতীত কথা। এর পর অনেককেই উৎসাহ দিয়ে এবং যেখানেই ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছি, সেখানেই সম্পর্ক স্থাপন করেছি এবং অনেকে পরে গ্রন্থকার হয়েছেন। সে সব কথা পরে আসবে।

যখন সম্পাদক ছিলাম

একজন নতুন লেখক পেয়েছিলাম, বিজয়কৃষ্ণ সিংহ তাঁর নাম, তিনি তমলুকে ওকালতি করতেন। তিনি ছিলেন শরৎবিরোধী। তিনি শরৎ-চন্দ্রের একখানা উপন্যাসের প্যারডি লিখেছিলেন শনিবারের চিঠিতে। নাম শেষ শ্রাদ্ধ। আর আমি 'দেবদাস' উপন্যাসের একটি প্যারডি লিখেছিলাম (২৭ পৃষ্ঠা মোট)—ছাপা হয়েছিল অগ্রহায়ণ ১৩৪১ সংখ্যায়। তার খুব সংক্ষিপ্ত একটু একটু নমুনা দিচ্ছি—('দেবদাস' মনে থাকলে এই আংশিক উদ্ধৃতিগুলি বোঝা সহজ হবে)।

…আজকাল সে একটা মেশে (sic) থাকে। দেবদাসের পাশের ঘরে চুনিলাল নামক এক যুবক আজ নয় বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। সে যখন চিৎপুর রোড হইতে ১টায় ফিরিল তখন দেখিল দেবদাস তখনো ঘুমায় নাই।

পৃথিবীর সমস্ত গুরুতর ঘটনাই রাত্রি ১টায় ঘটিয়া থাকে। পার্বতী যখন গোপনে দেবদাসের কাছে আসিয়াছিল, তখনো রাত্রি ১টা। এ ঘটনাও গুরুতর। চুনিলাল তামাক খাইবার ছলে দেবদাসের ঘরে ঢুকিল। সে বুঝিল যে লোকটা রাত্রি ১টা পর্যন্ত জাগিয়া থাকে, তাহার চরিত্র নষ্ট করা কিছুই শক্ত নহে।

…মনুষ্য চরিত্রের একটি সাধারণ রীতি এই যে, কেহ যদি কোনো মেয়ের প্রতি গুরুতর অবিচার করে তবে তৎক্ষণাৎ বেশ্যাগৃহে যাইবার জন্য তাহার মন ছটফট করিতে থাকে। দেবদাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত। সে অপরাধী এবং চুনিলাল তাহাকে রাত্রি ১টা পর্যন্ত জাগিয়া থাকিতে দেখিয়াছে—সোনায় সোহাগা। কিন্তু দেবদাস তবু একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে বলিয়া মনস্থ করিল। অর্থাৎ সে বাড়ি আসিল।

…আসিয়া শুনিল যে পার্বতীর বিবাহ আসন্ন। দেবদাস জানিত দুপুর বেলা আহারাদির পর পার্বতী নিত্য বাঁধে জল আনিতে যায়। সে সেই বাঁধে গিয়া ছিপ ফেলিয়া বসিল। হয় এস্পার কি ওস্পার।—পারু কলসী লইয়া আসিল, দেবদাস ডাকিল 'পারু শুনে যাও।' পার্বতী আসিল কিন্তু দেবদাস কোনো কথা কহিতে পারিল না। পার্বতী ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন দেবদাস তাহার কাছে গিয়া বলিল 'আমি এসেছি।' এইবার পার্বতীর পালা, সে চুপ করিয়া রহিল।

'দেবদাস হঠাৎ নতজানু হইয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, 'আমি এসেছি।'

'পার্বতী আরো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু স্বরে কহিল, 'কেন?'

'তুমি লিখেছিলে মনে নেই?'

'চুপ কর। ও সব কথা আমার শুনতেও ভাল লাগে না।' কিন্তু ভাল না লাগিলেও পার্বতী সবই শুনিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কারণ সে শুধু শুনিবে না, শুনাইবেও। তেরো বৎসরের মেয়ে কি আশ্চর্য উপায়ে স্বামীর ডেফিনিশন সম্বন্ধে কথা বলিয়াছিল তাহা দেখা গিয়াছে, এইবার সেই কিশোরী কিভাবে দেবদাসের ঠাকুমা শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্যই সে দেবদাসের উপর চটিয়াও চটিতে পারিতেছে না। তদুপরি

যখন-সম্পাদক ছিলাম

পার্বতী দেবদাসের অগোচরে বি-এ ক্লাসের পাঠ্যগুলি সবই পড়িয়া ফেলিয়াছিল। বড় বড় কথা বলিতে অথবা মনোবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি রহস্য ভেদ করিতে সে এরূপ পরিপক্ক ওস্তাদ হইয়া পড়িয়াছিল যে, দেবদাস তাহাকে প্রহার করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে কাবু করিতে পারে নাই। যখনই গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তাহাকে ছিপ দিয়া কিংবা কঞ্চি দিয়া মারিয়াছে। পার্বতী, কিশোরী পার্বতী, তেরো বৎসরের পার্বতী···বেদান্ত পড়িয়াছিল এবং তৎসঙ্গে শ্রীকান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। দেবদাস তাহার সহিত পারিয়া উঠিবে কেন?

উভয়ের তর্ক চলিতেছিল—পার্বতী কহিল পথ ছাড়।

দেবদাস পথ ছাড়িল না।···দেবদাস চটিয়া গেল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কলিকাতা ফিরিয়াই সে বেশ্যাগৃহে গমন করিবে এবং মদ খাইবে।···

দেবদাসের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সে দৃঢ় মুষ্টিতে ছিপের বাঁট ঘুরাইয়া সজোরে পার্বতীর মাথায় আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কপালের উপর বাম ভ্রূর নীচ পর্যন্ত চিরিয়া সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল।···

'দেবদা, করলে কি?'

দেবদাস সাধুভাষায় কহিল 'একটু মারিলাম।'

পার্বতীর বিবাহ হইল। ধনবান ধার্মিক শান্ত স্থির বুদ্ধিমান স্বামীর গৃহে যাইবার পূর্বে পার্বতীর একবার দেবদাসকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। বেদান্তের প্রভাব পার্বতীর জীবনে এরূপ প্রবল তাহা পার্বতীও পূর্বে বুঝিতে পারে নাই।

এদিকে দেবদাস কলিকাতা আসিয়া সে রাত্রিটা ইডেন গারডেনের একটা বেঞ্চিতে বসিয়া কাটাইয়া দিল। তাহার জীবন হইতে শুইবার প্রয়োজন ঘুচিয়া গিয়াছে, শোয় তো একেবারে চিৎপুর রোডে গিয়াই শুইবে।···

···সে চুনিলালকে বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব—তুমি কোথায় যাও, বল না?' চুনি সবই বলিল। না বলিলেও চলিত, কেন না দেবদাস সবই জানিত। যদি তাহা না হইত, যদি দেবদাস জানিত যে চুনিলাল কোনো ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইতে যায়, অথবা সন্ধ্যায় কোথাও টাইপিস্টের কাজে যায়, তাহা হইলে সে চুনিলালকে জিজ্ঞাসা করিত না, 'তুমি কোথায় যাও?'

···গৃহস্বামিনীর নাম চন্দ্রমুখী, সে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। এইবার দেবদাসের সর্বশরীর জ্বালা করিয়া উঠিল।···দেবদাস চুনিলালের মুখপানে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, 'চুনিবাবু, এ কোন্ হতভাগ্য জায়গায় আনলে?'···দেবদাস আর কিছু কহিল না।··· চন্দ্রমুখীও নীরবে অদূরে বসিয়া রহিল। কারণ খুব সম্ভব চন্দ্রমুখী দেবদাসকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল, দেবদাস গত তিনজন্ম ধরিয়া তাহার ভাসুরের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছে।···

একদিন দেবদাস চন্দ্রমুখীর ঘরে বসিয়া মদ খাইতেছে।···দেবদাসের যুগপৎ সামাজিক

এবং আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল চন্দ্রমুখী তুমি তো জান না…আমি কত যে তোমাকে ঘৃণা করি। ঘৃণা করি বলিয়াই এখানে আসি।…শুধু তোমাকে বলিয়া নহে, আমি যাহাকে যাহাকে ঘৃণা করি প্রত্যেকের কাছেই যাই।

…দেবদাস চন্দ্রমুখীর বাড়িতে গেল, কারণ সে তাহাকে ঘৃণা করে। উভয়ের দেখা হইল, কেহ কাহাকেও চিনিল না।…দেবদাস যদি মাতাল হইয়া…গিয়া উপস্থিত হইত তাহা হইলে চন্দ্রমুখী তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিত।…দেবদাসও চন্দ্রমুখীকে কালো পাড় কাপড় পরিতে দেখে নাই, অন্য রঙের পাড় হইলে সহজেই তাহাকে চিনিতে পারিত।… চন্দ্রমুখী আজ ত্যাগী, সন্ন্যাসী।--সাধারণ লোক ইহার মর্ম বুঝিবে না। তাহারা আরো বুঝিবে না, কি করিয়া চন্দ্রমুখী রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ভাষায় কথা বলে। যে বঙ্গভাষায় গদ্যের বিকাশ দেখাইতে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় এত গবেষণা করিলেন, এবং করিয়াও শ্রেষ্ঠ লেখকদিগকে নির্জলা প্রশংসা করিতে পারিলেন না, সেই বঙ্গভাষার গদ্য চন্দ্রমুখীর মুখে আসিয়া এরূপ সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিল কি উপায়ে তাহা ভাবিবার বিষয়।

চন্দ্রমুখী বলিল, 'একটা খেয়াল। তুমি আমাকে বড় ঘৃণা করতে।…তারপর…এ দুটো চোখে অনেক জিনিসই আর এক রকম দেখতে লাগলাম।…পূর্বের 'আমি'র সঙ্গে এমন করে বদলে গেলাম'…

চন্দ্রমুখীর সম্মুখে এখন দুইটি মাত্র পথ উন্মুক্ত। হয় কাউন্সিলে ঢোকা, আর না হয় ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এ দুইটি পথই তাহার পছন্দ নয়, সে টলস্টয়ের পন্থা অনুসরণ করিয়া গ্রাম্য জীবন যাপন করিতে লাগিল।

—দেবদাস ইতিমধ্যে মদের মাত্রা চড়াইয়া দিয়াছে। তাহার লিভারে ব্যথা হয়। এদিকে রাস্তার মোড়ে—চন্দ্রমুখী এবং পার্বতী পাহারা দিতে লাগিল। দুজনেরই বিশ্বাস দেবদাস দেখা দিতে আসিবে। ইহার কারণ ছিল। দেবদাস চন্দ্রমুখীকে কথা দিয়াছিল দরকার হইলে তাহাকে স্মরণ করিবে। এবং পার্বতীকে বলিয়াছিল শেষ সীন্‌-এ একটা গুরুতর কিছু করিয়া দেখাইবে। সুতরাং দুজনেই দিন গণিতেছে—চন্দ্রমুখী কলিকাতায় ফিরিয়া, এবং পার্বতী শ্বশুরগৃহে থাকিয়া।

দেবদাস প্রথম দেখা দিল চন্দ্রমুখীকে।…অসুস্থ দেবদাস এত যত্ন পাইয়া তাহাকে বৌ বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, এবং এত খুশি হইয়া উঠিল যে, পার্বতী ও চন্দ্রমুখীর বিষয়ে একটা তুলনামূলক সমালোচনাই লিখিয়া ফেলিল।…'তোমাদের দুজনের কত অমিল, আবার কত মিল।'…এই রচনাটি দেবদাস একবেলা ধরিয়া মুখস্থ করিয়া চন্দ্রমুখীকে শুনাইল, এবং মনে মনে ভাবিল পার্বতীর সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকেও শুনাইবে।…

দেবদাস চন্দ্রমুখীকে শুনাইয়াছিল, মৃত্যুর পরে মিলন হইলে সে চন্দ্রমুখীর কাছেই থাকিবে, সুতরাং যদিও অসুখ হইলে সংবাদ দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তথাপি সে-প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া সে পার্বতীর কাছেই চলিল। কারণ মৃত্যুর পরে চন্দ্রমুখীর সঙ্গে মিলন নিশ্চিত, পার্বতীর সঙ্গে নিশ্চিত নহে, হয় তো পার্বতী তাহার স্বামীর সঙ্গে অনুরূপ প্যাক্ট

করিয়া থাকিবে...। তাই দেবদাস পার্বতীর দিকেই ঝুঁকিল। কিন্তু তাহার আয়ু একেবারে মাপা। একচুল এদিক ওদিক হইবার উপায় কি? অনেক হিসাব করিয়া অসুখ হইয়াছিল, দেবদাস যদি সুস্থও থাকিত তাহা হইলেও ঠিক হাতীপোতার জমিদারবাবুর বাড়ির সম্মুখে বাঁধানো অশ্বথ তলায় গাড়ি উল্টাইয়া মারা যাইত। মরিতে তাহাকে হইতই, না হইলে পার্বতীকে যে...আজীবন সতীসাধ্বীরূপে পরিচিত হইয়াই কাটাইয়া দিতে হয়। বাঙালী সমাজে ইহার চেয়ে বড় অভিশাপ আর কি আছে?

দেবদাস যথাস্থানেই মারা গেল, এবং মারা যাইবার সময় পার্বতীর হাঁড়ি হাটের মাঝখানে ভাঙিয়া গেল...।

এই প্যারডিটার অংশমাত্র উদ্ধৃতিও কিছু বড় হয়ে গেল। সে সময় এ বই পড়ে মনে কিছু বিদ্রূপের প্রেরণা জেগেছিল। শুধু সেন্টিমেন্টের উপর এত বড় একটা গল্প দাঁড়াতে পারে না। কাদায় গড়া পা, একটু ধাক্কাতেই ভেঙে পড়ে।

যাই হোক, গোড়ার কথা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি।

॥ চার ॥

সেদিনকার লেখক, শিল্পী ও অন্যান্য নানা বৃত্তিধারী যাঁরা আমার কাছে এবং সজনীকান্তের কাছে (শ. চিঠি ও বঙ্গশ্রীতে) প্রায় নিয়মিত অথবা কিছু অনিয়মিত হাজিরা দিতেন, তাঁদের আমি দুভাগে ভাগ করছি: জীবিত ও মৃত। দুটি তালিকাই উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে সম্পাদকদেরও ধরা হল।

মৃত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ, ডক্টর কালিদাস নাগ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, কিরণকুমার রায়, রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর প্রমথনাথ রায় (আত্মহত্যা), সুবল মুখোপাধ্যায় (নিরুদ্দেশ), অনাথনাথ বসু, অরবিন্দ দত্ত, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুশীলকুমার দে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি পাল, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (আত্মহত্যা), ও যোগেশচন্দ্র বাগল।

জীবিত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যচন্দ্র সেন, নলিনীকান্ত সরকার, সুধীর-কুমার চৌধুরী, সুকুমার সেন, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অতুলচন্দ্র বসু, নির্মল-কুমার বসু, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ত্রিদিবনাথ রায়, যামিনী রায় বনফুল, নিখিলচন্দ্র দাস, ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, যোগানন্দ দাস, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য, অশোক চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন দে, হরিপদ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (আই-টি), হেমচন্দ্র বাগচী, অমল হোম, কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, বাসব ঠাকুর প্রমুখ।

আজ যখন এই অধ্যায় লিখতে বসেছি (৮।২।৭২) তখন কিছু আগে খবরের কাগজে পড়লাম যোগেশচন্দ্র বাগল গতকাল মারা গেছেন। তাঁর

নাম জীবিত তালিকা থেকে উপরে তুলে দিলাম এবং যখন এ লেখা ছাপা হবে তখন নিচের নাম যদি কিছু উপরে ওঠে তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

যাই হোক, একবার অন্তত কল্পনা করুন, উপরের দুটি তালিকা মিলিয়ে যত ব্যক্তির নাম আছে, সবাই এক সঙ্গেও বঙ্গশ্রী অফিসে দু'একবার এসে হাজির হয়েছেন। শনিবারের চিঠি অফিসে এর চার ভাগের এক ভাগ। মাসিকপত্র ঘিরে এই গুণীজন সমাবেশ। কিন্তু এ তো 'ইনডোর'। এ ছাড়া আউটডোর আছে। একদিন খান তিনেক গাড়িতে অন্তত ১৮ জন ডায়মণ্ড-হারবারে যাওয়া গেল। নিখিলচন্দ্র দাসের গাড়ি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের গাড়ি, অন্যটা কার মনে নেই। হঠাৎ ঠিক হল যেতে হবে। কিরণ যাবে না, বলল, অনেক কাজ পড়ে আছে। সজনীকান্ত বললেন, না গেলে চাকরি খেয়ে দেব। কিরণকেও যেতে হয়েছিল। এমন সম্পাদক বোধহয় আর হবে না যিনি তাঁর সহকারীকে "আড্ডায় না বেরুলে তোমার চাকরি খেয়ে দেব" এমন কথা বলতে পারেন। গিয়েছিলাম হারবারে—শুধু যাওয়ার জন্য যাওয়া, মনের অতিরিক্ত উচ্ছলতা খানিকটা এইভাবে হাওয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া, নইলে কাজে মন বসে না। আর এক উদ্দেশ্য : তিন পয়সায় দুটি ডাব খাওয়া।

শনিবারের চিঠির এমন সংখ্যা গেছে যে সংখ্যায় আমি নিজে প্রথম প্রবন্ধ, গল্প, প্রসঙ্গ কথা, সংবাদ সাহিত্য, কবিতা লিখেছি ও তিন-চারখানা কারটুন ছবি এঁকে দিয়েছি। সজনীকান্ত দাসের আমলেও তিনি, এক কারটুন আঁকা বাদে আর প্রায় সবই নিজে লিখেছেন। এ রকম মাঝে মাঝে ঘটেছে।

এই যে এক একটা মাসিকপত্র ঘিরে এমন লেখক-শিল্পীদের ভিড, এমন আর কোথাও হওয়া সম্ভব হল না।

এক এক গ্রুপে ভীষণ তর্ক বেধে উঠত। বিভূতিভূষণ ও নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে তর্ক, প্রমথনাথ বিশী ও অরবিন্দ দত্তের মধ্যে একদিকে বিদ্রূপ অন্যদিকে উত্তেজনা, সে কি বিষম হৈ-চৈ। অন্যদিকে সুরেশ বিশ্বাস (বঙ্গশ্রীর কর্মী) হস্তরেখা বিচারে মেতে আছেন। শিবনাথ গাঙ্গুলী (সাবিত্রীপ্রসন্নের ভাগ্নে) ও কিরণকুমার রায় সম্পূর্ণ অবিচলিত অবস্থায় কাজ করে যাচ্ছে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী, দেবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়,

নলিনীকান্ত সরকার তখন আমার খুব নিকট বাসিন্দা। দেবিদাস ইনকাম ট্যাকসের উকিল, প্রতিদিন স্টেটসম্যানের ক্রসওয়ার্ড প্রায় সব করে ফেলতে দেখে তাকে খুব বিপজ্জনক মনে হত তখন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এলে (প্রায় প্রতি রবিবারে) শ. চিঠির আসর খুব জমে উঠত। যোগেশচন্দ্র বাগল উনবিংশ শতকের কোট গায়ে পরে আসতেন, অন্য বিষয়ে তাঁর মুখে কোনো কথা ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই। তিনি ও যোগেশ বাগল তখন প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক। ব্রজেন্দ্রনাথ উত্তেজিত হলে সাধু ভাষায় কথা বলতেন, যেমন "আপনি একাজ করিবেন না, অনেকবার বলিয়াছি আপনাকে।" অন্যত্র বলেছি সে সব বৃত্তান্ত।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ল, শনিবারের চিঠিতে এবং কিছু কিছু অন্যত্র, রামমোহন রায়কে লোকচক্ষে কিছু হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কয়েকজন লেখক একটু বেশি তৎপর হয়েছিলেন। রামমোহন রায় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হল শ. চিঠির মাঘ ১৩৪০ সংখ্যা,—ইংরেজি ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪। ব্যবস্থা করেছিলেন সজনীকান্ত। রামমোহন-বিরোধী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন একত্র হলেন রামমোহনকে অশ্রদ্ধেয়রূপে খাড়া করতে। লেখকদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, ডক্টর সুশীলকুমার দে, কুমুদবন্ধু সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই চারজন রামমোহনকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে প্রমাণ করলেন, তাঁকে যেভাবে বড় করে তোলা হয়েছে, তিনি ঠিক তার উপযুক্ত নন। তাঁর কিছু কিছু কৃতিত্ব খুব অনিচ্ছার সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু ভাষার দিক থেকে, সামাজিক সংস্কার চিন্তার দিক থেকে, ইংরেজী জ্ঞানের দিক থেকে, রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে, তিনি নিম্ন-শ্রেণীর, এবং বৈষয়িক বুদ্ধিতে বেজায় ধূর্ত, ইত্যাদি।

প্রবন্ধগুলি পড়লেই বোঝা যায় সবই অশ্রদ্ধা থেকে রচিত। রামমোহন রায় যে আদৌ মহৎ নন, এটা প্রমাণের জন্য এতটা উৎসাহ দেখানোতেই প্রমাণ হয় সবটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রামমোহন রায়কে আত্মীয় জ্ঞান করলে তিনি যা কিছু করেছেন সবই তাঁর কৃতিত্বরূপে প্রমাণ করা কঠিন হত না। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কি আচরণ করেছেন, কার সঙ্গে মকদ্দমা করেছেন, এ সবকে বাড়িয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় আলোচনা করলে এক-জাতীয় সাফল্যলাভ অবশ্যই করা যায়। কিন্তু তাঁর সামাজিক চিন্তার দিক

থেকে যেটুকু কৃতিত্ব তা কোথাও প্রাণ খুলে চারজন লেখকের কেউ স্বীকার করেন নি। সেজন্য সমস্ত আয়োজনটাই আমার চোখে খারাপ মনে হয়েছে।

জীবনী আলোচনা তিনভাবে করা যায়। কোনো খ্যাত ব্যক্তির জীবনের সকল ঘটনা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে বর্ণনা করা চলে। সাধারণ ব্যক্তিগত প্রশ্ন বাদ দিয়ে ভালর দিকটিকে উজ্জ্বল করে তোলা যায়। আর এক হচ্ছে নিরপেক্ষতার আবরণে ব্যক্তিগত ঘটনাকে বাড়িয়ে তুলে খ্যাত লোকের কৃতিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা যায়। এই শেষেরটি উদ্দেশ্যমূলক এবং তা সদুদ্দেশ্য মনে হয় না। শ. চিঠির প্রবন্ধগুলিতে এই শেষের চেষ্টাটি কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই জাতীয় বিচারের দৃষ্টান্ত এদেশে আরো আছে, এবং এরই সমান্তরাল ভাবে আমি একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করব। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এককালে রসরচনায় এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে খ্যাত ছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রের আবর্জনা এ সব রচনা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যখন "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" লেখেন, তখন ইন্দ্রনাথের ধর্মবোধ ও সামাজিক কর্তব্যবোধ এমনই জাগ্রত হয় যে, ঐ ছোট রচনাটি (পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত, মূল্য দু আনা) উপলক্ষ করে প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রায় মূর্খ প্রতিপন্ন করার জন্য বঙ্গবাসী নামক সাপ্তাহিক পত্রে ১০ই পৌষ ১৩১৬ সাল থেকে আরম্ভ করে পর পর পাঁচটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের আরম্ভ এই—

যিনি জাতিতে কায়স্থ, নামে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন, তিনি ম্লেচ্ছ দেশে গিয়া সায়ন্স শিখিয়া পুনরায় এদেশে আসিয়া ডক্টর পি সি রায় হইয়াছেন। ইনি সায়ন্সের ডক্টর। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসার। ···ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধাও করে। হয়ত স্কুলকলেজে পড়া ব্রাহ্মণের ছেলে বেদবাক্যে বিশ্বাস করে না; কিন্তু পি সি রায়ের কথা ঘুণাক্ষরেও মিথ্যা হইতে পারে—এমন কল্পনাও তাহারা করিতে পারে না।···ইংরাজী পড়া অনেক বয়োবৃদ্ধ কোথাও পি সি রায়কে সর্বজ্ঞ মনে করিয়া গুরুর আসনে বসাইতে প্রস্তুত, এমন কথাও যদি কেহ বলে, তাহা হইলে আমরা বিস্মিত হইব না।···

নির্বাসিত কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি-এ সম্পাদিত সুপ্রভাত নামক কাগজে পি সি রায়ের এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে···দেখিতেছি সত্যানুসন্ধানে পি সি রায়ের প্রবৃত্তি আছে; কেন না তিনি লিখিয়াছেন বাঙালী জাতির 'তীক্ষ বুদ্ধিবৃত্তি ন্যায়ের নিষ্ফল কূটতর্কে ও স্মৃতির স্থানে স্থানে হাস্যোদ্দীপক বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচলনে ব্যয়িত হইয়াছিল, সত্যানুসন্ধানে ব্যবহৃত হয় নাই।' সত্যের স্বরূপ কি, সত্যের আকার

কেমন? পি সি রায় কি তাহা জানেন? সামান্য মনুষ্যের জাগ্রদ্দশায় যাহা যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, পরমার্থতঃ তাহা যে সত্য নহে, একথা পি সি রায় কখনও শুনিয়াছেন কি? যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণের সাহায্যেও যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাকে আমরা স্থূল পদার্থ বলি। আর যাহা কোনও প্রকারেই কোনও যন্ত্র সাহায্যে মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হয় না, তাহার নাম সূক্ষ্ম পদার্থ। পি সি রায় স্থূল-সূক্ষ্মের এই প্রভেদ অবগত আছেন কি?...

এরপর নানা হাস্যকর যুক্তিতর্কের পথে ইন্দ্রনাথের শেষ কথা হল এই :—

বিজ্ঞানের চর্চা যদি করিতে হয়, বিজ্ঞানকে জীবিকার নিমিত্তে যদি আশ্রয় করিতে হয়, তবে তমঃপ্রধান বৈশ্য-শূদ্রের নিমিত্তে বিজ্ঞান থাকুক, ওপথে ব্রাহ্মণকে নামাইবার চেষ্টা কেহ করিও না।

পক্ষপাতিত্ব থাকলে সমালোচনা কেমন হয় তার এই দৃষ্টান্তটি লক্ষণীয়। এখানেও প্রফুল্লচন্দ্রের অপব্যাখ্যা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিকে আক্রমণ করা হয়েছে। কায়স্থ প্রফুল্লচন্দ্র বলে প্রথমেই বিদ্রূপ আছে। কুমুদিনী মিত্রের প্রতি ইঙ্গিত আছে এইভাবে যে তিনি একে তো কায়স্থ, তদুপরি তিনি বি-এ পাস করে কাগজের সম্পাদিকা হয়েছেন।

আমাদের দেশের অনেক সমালোচনাই অনেকটা এই রকম। এর চরম দৃষ্টান্ত একটি আছে রাজশেখর বসুর একটি ব্যঙ্গ গল্পে। নমুনা দিচ্ছি—

বকুলাল দত্ত—সেটাকে কে চেনে? চোদ্দ বছর আগে কার কাছে চাকরি করত? সে চাকরি গেল কেন? কেরানীর অত পয়সা কি করে হ'ল? হে দেশবাসিগণ, বকুলাল অত সোডা ওয়াটার কেনে কেন! কিসের সঙ্গে মিশিয়ে খায়? বকুর বাগানবাড়িতে রাত্রে আলো জ্বলে কেন? বকুলাল কালো, কিন্তু তার ছোট ছেলে ফর্সা হ'ল কেন।

এই জাতীয় সমালোচনার সঙ্গে রামমোহন রায় সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি বেরিয়েছিল তার অনেকখানি মিল আছে। মোহিতবাবুর 'কবি ও মহাত্মা' প্রবন্ধেও অনেকখানি ব্যক্তিগত আক্রমণ। রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত অথবা তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত ছিল সে রকম উপদেশও এই প্রবন্ধে প্রচ্ছন্ন আছে। এই প্রবন্ধের সঙ্গে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রফুল্লচন্দ্রকে আক্রমণ কিছু পরিমাণ মেলে। দুটিতেই 'প্রকৃত' হিন্দুত্ব-ভ্রষ্টতার অভিযোগ আছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ইতিপূর্বে আমি যে সমালোচনা করেছিলাম, তার পরেও দুটি উৎকৃষ্ট সমলোচনা আমি ছেপেছিলাম। সে দুটির উল্লেখ না করলে শরৎপ্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একটি সমালোচনার লেখক

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সে প্রথম থেকে ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তার অতি সুন্দর বর্ণনা শেষে, শরৎচন্দ্রের হঠাৎ ক্ষমতা নিঃশেষিত হওয়ায় যে দুঃখ পেয়েছিল তার কথা দীর্ঘ এক প্রবন্ধে বলেছে। আমি কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি। রচনাটির নাম ছিল "শারদী"—১৩৩০ ভাদ্র (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩) সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধরূপে ছাপা হয়েছিল।

•• দেবদাসকে আলাদা করিয়া রাখিয়া দিলাম। ওটা যেন শরৎবাবুর লেখাই নয়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে যে কূলপ্লাবী রসের বান ডাকিয়াছে, তাহাতেই ডুবিয়া রহিলাম। আমার মনের ভাবটা তখন এইরূপ: আর কি। শরৎবাবু যখন আছেন তখন আর আমাদের ভাবনা কি? তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে রসের ফোয়ারা চিরদিন এমনি উৎসারিত হইতে থাকিবে।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। তারপর একদিন 'দেনা-পাওনা' দেখা দিল।··· পড়িয়া অজানা আতঙ্কে বুক দমিয়া গেল। এ কি হইল।···

···গাল্পিক শরৎচন্দ্রের নামের পিছনে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গিয়াছে। 'পথের দাবী' এক অদ্ভুত বস্তু।···কেবল ন্যাশন্যালিজমের ধারাবাহিক লেকচার হইয়াই রহিয়া গেল। শেষ প্রশ্নের কথা ছাড়িয়া দিই। লেকচার দিবার নেশা যখন পাইয়া বসে তখন প্রতিভাবান ব্যক্তিকেও যে কতদূর পথভ্রষ্ট করিতে পারে, শেষ প্রশ্ন তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।···

পল্লীসমাজ তাঁহার একখানি ছোট উপন্যাস। ইহাতে আমাদের পল্লীজীবনের অনেক পাপ দুষ্কৃতি ও অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এখানে সামাজিক সমস্যা কোথাও গল্পকে অতিক্রম করিয়া মুখ্য আসন গ্রহণ করে নাই· তাই সৃষ্টি হিসাবে পল্লী-সমাজ অনবদ্য। অরক্ষণীয়াতে দেখি ঠিক তাহার উল্টা, মানুষগুলা খাটো হইয়া কন্যাদায় সমস্যাকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছে। তাই পল্লীসমাজ যখন ললিতকলার গৌরবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপসৃষ্টির পাশে সগর্বে আসন অধিকার করে, অরক্ষণীয়া তখন বিষ্ণুশর্মা ও চাণক্য পণ্ডিতের দ্বারে প্রবেশার্থিনী হইয়া দীন নয়নে দাঁড়াইয়া থাকে।···

শরৎবাবুর লেখাতেই কোথায় একস্থানে পড়িয়াছিলাম যে তিনি একবার কোথাকার সাহিত্য সভার সভাপতি হইয়া যাইতেছিলেন। পথে কবিবর রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'অভিভাষণের বদলে একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও।' কথাটা কতদূর মর্মান্বেষী তাহা বোধ হয় সেদিন শরৎবাবুও বুঝিতে পারেন নাই। বিধিবিড়ম্বনায় আমরা আজ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।

শরদিন্দুর এই উক্তিগুলি খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ, যদিও পল্লীসমাজ সম্পর্কে 'অনবদ্য' বলায় আমার আপত্তি আছে। সে অবশ্য বিশুদ্ধ চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে। এবং আদর্শের দিক থেকেও। আমি পল্লীসমাজের রমার চরিত্র সম্পর্কে ১৯৫২ সনে শরৎস্মরণিকা নামক সংকলনে একটি ছোট

রচনা দিয়েছিলাম, (পরে তা আমার সপ্তপর্ণ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) তা থেকে আমি তিনটি প্যারাগ্রাফ তুলে দিচ্ছি।

...সাধারণত মানুষের মনের দুই বিপরীত দিক পরস্পর খানিকটা মিশে থাকে, কিন্তু রমা যেন সম্পূর্ণ পৃথক দুই ব্যক্তি। মনোবিশ্লেষণে এর অনেকখানি ব্যাখ্যা মিলবে অবশ্যই, চরিত্র হিসাবেও জীবন্ত, কিন্তু তবু পৃথক পূর্ব-পরিচয়ের অভাবে অস্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র একে বিনা কৈফিয়তে রমেশের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছেন, এটা ঠিক হয় নি। বেণী ঘোষালকে পল্লীসমাজের পটে দেখলেই চেনা যায়। রমেশকে চেনা যেত না, কিন্তু তার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়ে গেছে, সে শিক্ষিত বিদেশে থাকত। কিন্তু রমার পরিচয় কি? পল্লীসমাজের পটে এই রমাকে চেনা যায় না। কিন্তু অন্যত্রও কি তাকে চেনা যেত?

পল্লীসমাজের লোকেরা তার নিন্দা করেছে মনুষ্যত্বের বিচারে নয়, সামাজিক বিচারে। শহরের সমাজে থাকলেও তার নিন্দা হত, কিন্তু তা শহুরে সমাজের বিচারে অবশ্যই নয়। নিন্দা হত তার দুর্বোধ্য ব্যবহারে।

হ্যামলেট যখন দুর্বোধ্য হয়েছে তখন তাকে পাগল বলে চিনিয়ে দেবার লোক ছিল, যদিও বুদ্ধিমানের মতে there was method in his madness। কিং লিয়রের পাগলাকে শেক্সপীয়রই Fool নামে পরিচিত করিয়েছেন। টাচ্‌স্টোনকে ক্লাউনরূপে পরিচিত করিয়েছেন, তবে তারা তাদের পটভূমিতে সত্য হয়েছে। শরৎচন্দ্র রমার যে পরিচয় দিয়াছেন, তা সাধারণ মেয়ের পরিচয়, সেইজন্যই রমা পল্লীসমাজে অবাস্তব। তার চরিত্র সম্পর্কে একটুখানি পূর্ব পরিচয় দিলেই সে সত্য হত। তার দ্বিমুখী ব্যবহারের যেটুকু সমর্থন আছে তা অত্যন্ত দুর্বল। শরৎচন্দ্রের নিজের মনেও রমা চরিত্র খুব স্পষ্ট নয়।

কিন্তু সে যাই হোক রমা পল্লীসমাজের বিচারে এবং সাহিত্য বিচারে এক রকম চলে গেছে। শরদিন্দুর বিচারও এইদিক থেকেই।

আর একটি রচনা শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব সম্পর্কে। শ. চিঠির শ্রাবণ, ১৩৭০ (ইং অগস্ট ১৯৩৩) সংখ্যায় ছেপেছিলাম। লেখক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এটি একটি অতি উচ্চশ্রেণীর সমালোচনা তো বটেই, তা ছাড়া ব্যঙ্গ রচনার দিক থেকেও বিশেষ সার্থক। বিবেকানন্দ তখন আমার বাসস্থান থেকে দুই মিনিট দূরত্বের বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু লেখা পেয়েছি মাত্র একটি। এই লেখা থেকে অনেকখানি নমুনা না দিলে উদ্ধৃতি অসার্থক মনে হবে:

.. আমরা পাঠক, আরও সবনাশের কথা, শরৎচন্দ্রের অনুরাগী পাঠক, সুতরাং রচনা পাঁটের পয়সা খরচ করিয়া পড়িবার মত দুর্বুদ্ধি আমাদের রহিয়াছে, এবং সেইজন্যই

সম্ভবত শরৎচন্দ্র তাঁহার চতুর্থ পর্বে আমাদের এতটা শাস্তি দিলেন। শাস্তি দিন তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, 'কমল'-এর পরেও শরৎচন্দ্র একটা 'লতা' শব্দ যোগ করিয়া 'কমল নেহি ছোড়তা' এই উপহাস বাক্যটি কেন প্রমাণ করিতে বসিলেন, তাহাই বুঝিলাম না। কাহারও কাহারও একটা বিশেষ নামের উপর ঝোঁক থাকে এবং শিথিল-ইন্দ্রিয় বার্ধক্যের অসহায় দিনগুলি সেই নামের মোহে সম্ভবত মধুর হইয়া ওঠে।...

বাস্তবিক চতুর্থ পর্বের কি কোনও প্রয়োজন ছিল?...আমরা ফর্মা হিসাবে টাকার কথা বলিতেছি না, বলিতেছি উপন্যাসের কথা।... চরিত্র, চিন্তা, সৌন্দর্য, কিংবা ঘটনা ও ভ যার দিক হইতে কীর্তিমান গ্রন্থকার আমাদিগকে নূতন কোন আনন্দ...দিয়াছেন?...

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এই গ্রন্থের নায়িকা কমললতা। শেষ প্রশ্নের কমলের মত ইনি উগ্র নহেন, বরং বিপরীত। যাহাকে বলে খাঁটি বৈষ্ণব। আমাদের একটা সন্দেহ জাগিতেছে, পূর্ববর্তিনী কমল, গোবেচারা অজিতের ঘাড়ে চাপিয়া যে দুঃসহ প্রেমের চমক দেখাইয়াছিলেন, তিনিই কয়েক বৎসর পর বৈষ্ণবীর ভেক ধরিয়া ততোধিক গোবেচারা শ্রীকান্তকে মজাইতে চাহেন নাই তো?

...গোমস্তার সঙ্গে মজিয়া কমললতার সন্তানসম্ভাবনা হইল এবং এই কলঙ্কের ঘূর্ণি-পাকে পড়িয়া অল্পবয়স্ক নিষ্পাপ যতীন আত্মহত্যা করিল...অবশেষে কোন আখড়ায় শ্রীকান্তের নাম শুনিবামাত্র তাঁহার 'প্রেম উপজিল।'—পাঠকেদের ভয় নাই বৈষ্ণবী কমল আমাদের গোঁসাইজীকে লইয়া 'ইলোপ' করিতে চাহিলেও স্টেশন হইতে কেবলমাত্র শেষ বিদায়ের করুণ দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি ভালয় ভালয় ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। কমললতার তখন বয়স হইয়াছে, যুবতী বলিলে স্ত্রীলোকের যে মারাত্মক আকৃতি-প্রকৃতি পুরুষের চোখে ভাসিয়া ওঠে...সেই বিপজ্জনক বয়স পার হইয়াই তিনি আখড়ায় ঢুকিয় ছিলেন, এবং আমাদের সর্বজন পরিচিতা সেযানা রাজলক্ষ্মীরও তিনি 'দিদি' পদে অভিষিক্তা হইবার গৌরব লাভ করিযাছিলেন। কিন্তু বয়স হইলে কি হইবে।...

কমললতা শ্রীকান্তকে ভালবাসিলেন, বাসুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি, তজ্জন্য নূতন গোঁসাইজীকে আমরা মোটেই হিংসা করি না। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি, 'কেন বাসিলেন?' তবে হয়ত কমললতার মত মৃদু হাসিয়া শরৎ-ভক্তগণ...জবাব দিবেন, 'ফুল কেন ফোটে? পাখী কেন গায়? এর কি কোন জবাব আছে? সবই ঠাকুরের দয়া।' —হরি হরি। ঠাকুর যদি দয়া করিলেন তবে তিনি কৃপাপূর্বক এই প্রেম কাহিনী প্রচারের জন্য শরৎচন্দ্রকে যথোচিত শক্তি দিলেন না কেন?

তৃতীয় পর্বের শ্রীকান্তকে আমরা পাইতে চাহি নাই, তথাপি চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত তিনি আমাদিগকে টানিয়া আনিলেন।—হয়তো আমরাই তাঁহাকে টানিয়া আনিলাম। এবং এ কি রকম আনা!—এ যেন স্ট্রেচারে করিয়া কোনও ইনভ্যালিডকে আরোগ্যাশ্রমে আনা। ইহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, উৎসাহ নাই—এমন কি বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতে

পারিলে, ইনি কষ্ট করিয়া পাশ ফিরিতে পর্যন্ত ইচ্ছুক নহেন। একটামাত্র আশ্চর্য গুণ ইঁহার দেখিতেছি, তাহা হইতেছে স্ত্রীলোকের আঁচল ধরিয়া থাকা। এই হতভাগ্য—কেবল নারীর কোলে কোলে ফিরিতেছেন—রাজলক্ষ্মী হইতে কমললতা এবং কমললতা হইতে রাজলক্ষ্মী। কি sickening। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে হয়তো খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু শ্রীকান্তের মত ইনভ্যালিডকে ভালবাসাই যদি তাহার পরিচয় হয়, তবে বলিব ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। এই অলস কল্পনা, বীর্যহীন নরনারীর এই সেন্টিমেনটালিটি এবং আর্টের নামে এই প্রকার নির্জীব চিত্র দেশের সম্মুখে যত কম উদ্‌ঘাটিত হয়, জাতির ততই মঙ্গল।—

শরৎচন্দ্রের মধ্যে সম্ভবত বৈধব্য ও আলুকাঁচকলার একটা vision আছে, তাঁহার নায়িকাগণের চরিত্র সংশোধনের পক্ষে সম্ভবত তিনি হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী এই প্রায়শ্চিত্ত বিধিই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।—

·· গ্রন্থখানি শেষ কবিয়া এই কথাটাই মনে হয়, শরৎচন্দ্রের উচিত এক্ষণে ত্রিতল বাটীর বারান্দায় একখানি আবাম কেদারার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া গুড়গুড়ির নল টানা এবং অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়া শেষ প্রশ্নের সেই লাইনটা স্মরণ করা—হায় একদিন আমারও যৌবন ছিল।

মোটামুটি সুর যাতে কেটে না যায়, বজায় থাকে, সেজন্য একটু বেশিই নমুনা দেওয়া গেল। সমগ্র প্রবন্ধে আরো অনেক গুরু চিন্তা ও লঘু পরিহাস আছে। খুব সক্ষম ও সার্থক লেখা মনে হয়েছে এটিকে।

আমি বলেছি শ. চিঠির দ্বন্দ্ব প্রধানত সাহিত্য বিষয়ে, আক্রমণও তাই, এবং তা ব্যক্তিগত ছিল না। কিন্তু একেবারেই ছিল না তা নয়। কিছু নমুনা দিয়েছি। অবশ্য এ-জাতীয় ব্যক্তিগত আক্রমণও মানসিক গোঁড়ামি থেকে জাত। এর স্থায়ী মূল্য বিশেষ কিছু নেই। নগদ বিদায়ের ব্যাপার।

নিখিলচন্দ্র দাস গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি। প্রেসিডেন্সি কলেজের গ্র্যাজুয়েট। ছাত্রাবস্থায় পাঠে অসাধারণ মনোযোগ ও একাগ্রতা। কোনো বই একবারের বেশি পড়েন নি। কারলাইলের পরম ভক্ত, দার্শনিক মনোভাব এবং স্বাস্থ্য চর্চাতেও মনোযোগী। তাঁর কন্যা ও আমার পিতার কন্যা তখন একসঙ্গে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে পড়ে, সেই হেতু ওদের বন্ধুত্ব। আর এই উপলক্ষে নিখিলবাবুর সঙ্গে আমার সামান্য কিছু পরিচয়। সাহিত্যিক সম্পর্কে নিখিলবাবুর আকর্ষণ ছিল এ কারণে যে, তিনি তখন স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচর কম্পানীর কমিশন এজেন্ট। ১৯১২ সনে বি-এ পাস, আমার

আট বছর আগে। এই হল তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় পরিচয় বনফুলের জনার্দন জোয়ারদার উপলক্ষে।

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সমস্ত কাহিনীটা আমার স্মৃতিচিত্রণে বলা আছে। পরেও কিছু বলব।

আমার বাল্যকালের কয়েকটি অভিজ্ঞতা আমার পরজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। একটি এখানে বলি—ছোট্ট চন্দনা নদীটি ছিল গ্রামের দক্ষিণে। গ্রীষ্ম সন্ধ্যা ঐখানে কতদিন ঘাসের উপর শুয়ে কাটিয়েছি। একদিন আমরা চার জনে ঠিক করলাম, আজ রাত্রে কিছু ডাবের জল খাওয়া দরকার। ঘাটের পাশেই বাগান, (মালিক আমার সহপাঠী এক বন্ধু কাশীর ছাত্র প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়) অনেক গাছ, এবং ফল হাতের কাছেই, অর্থাৎ গাছে না উঠেই পাড়া যায়। এক কাঁদি কেটে এনে নদীর ধারে বসে কেটে খাওয়া হচ্ছে, সিরাপ দিয়ে। ১৯১৩ কি ১৪ সন। বতনদিয়া বাজারে বেঙ্গল কেমিক্যালের চৌকো বোতলে নানা স্বাদের সিরাপ বিক্রি হত। এবং আমার কলকাতার সামান্য পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল দোকানে ডাবের জলের সঙ্গে সিরাপ খাওয়া। পূর্ব ব্যবস্থামত সেদিনও ডাবের জলের সঙ্গে সিরাপ মিশিয়ে খাওয়া হবে। বাড়ি থেকে আনা বোতলে অনেকখানি রোজ সিরাপ ছিল। তাই মিশিয়ে খেয়েও অনেকটা বেঁচে গেল। ডাবও বাঁচল কয়েকটা। দু মিনিট দূরের বাড়িতে আমাদের আর এক বন্ধু তখন চিৎকার করে স্কুলের পড়া পড়ছে। রাত তখন ৯টা। ঠিক হল তাকে সিরাপের সঙ্গে ডাবের জলের মিশ্রণ খাওয়াতে হবে। বরুণ তার নাম। খুব উৎসাহ আমাদের। কিন্তু বরুণ রাজি নয়। সে ক্লাস-নাইনে পড়ে, কিন্তু সিরাপ নাম ও বোতল দেখে ভয়ে অস্থির। সিরাপ মানে ভেবেছে সরাব। তাকে তারই অভিধান খুলে মানে দেখিয়ে দিলাম, কিন্তু তাতেও কিছু লাভ হল না। তাকে প্রাণপণে বোঝানো সত্ত্বেও না। তখন তার মা এসে আমাদের বললেন, "তোমরা খাচ্ছ খাও, ওকে আর ধরিও না।"—সমস্ত জিনিসটা কমিক হয়ে উঠল এক মুহূর্তে।

এই ঘটনা আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এবং আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে যেসব ঘটনা কৌতুক রচনায় প্রবৃত্ত করেছে, পরে আবিষ্কার করেছি তার প্রায় সবই তো কারো না কারো দুঃখের কাঠামোয় গড়া।

যখন সম্পাদক ছিলাম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবারের চিঠিতে কিছু লেখেন নি, তাঁর জগৎ ছিল পৃথক, তাতে হিংসা বা ঈর্ষা বা আক্রমণাত্মক কোনো মনোভাব ছিল না। তাঁর সঙ্গ সব সময়েই আমার প্রিয় ছিল। ১৯৩৩ সনে তাঁর সঙ্গে প্রথম ভ্রমণে বেরোই সম্বলপুর জেলায়। শহরের জীবন যে কতখানি কৃত্রিম তা শহর ছাড়ামাত্র বোঝা যায়। আমি তো পল্লীর মানুষ, বিভূতিবাবুও তাই। তৃতীয় সঙ্গী কিরণকুমার রায়ও তাই। চতুর্থ সঙ্গী প্রমোদ দাশগুপ্ত (ব্যারিস্টার-ঔপন্যাসিক নীরদ দাশগুপ্তর ভাই। তখন সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)—তাঁর পল্লীজীবনের সঙ্গে কতখানি পরিচয় আমার জানা নেই। কিন্তু তিনি আমাদের তিনজনের খোলা আকাশ আর অরণ্য-পটের উন্মত্ততায় সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারেন নি, এবং তিনজনের ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন এইটুকু মনে আছে।

বিভূতিবাবুর সঙ্গ সব সময়ে প্রিয় ছিল বলেছি। এই ভ্রমণে তাঁর তিন চার দিনের সঙ্গীরূপে তাঁকে ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। তিনি দুটি সত্তায় বিভক্ত। সেই যে-দ্বিতীয় সত্তাটি তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের সম্পূর্ণ বাইরে, সেই সত্তার আমি কিছু পরিচয় পেয়েছি নানাভাবে। তাকে জানতে পেরেছি বলেই বিভূতিবাবুর সঙ্গ কল্যাণকর বোধ হয়েছে সব সময়। আমার সম্পাদক জীবনে এটি একটি মহৎ প্রাপ্তি।

অর্থাৎ অসম্পাদকীয় কাজের ভিতর দিয়েই, ইনটেলেকচুয়াল আনন্দের বাইরে, গভীর জীবনের আনন্দ আমি পেয়েছি এবং তা আমি সব সময়েই সত্য বলে অনুভব করেছি। মাটির উপর ধুলোর মধ্যে শুয়ে থাকতে আমার যে আনন্দ, একটা গল্প লেখার আনন্দ তার কাছে কিছুই না। রাত্রে মাঠে বসে আকাশের দিকে নক্ষত্র-রাজ্যের ইতিহাস-কল্পনার কাছে সম্পাদকীয় প্যারাগ্রাফ লেখা তুচ্ছ হয়ে যায়। ছেলেবেলার যাবতীয় পরিবেশজনিত আনন্দ বিভূতিবাবুর লেখার মধ্যে ফিরে পাই, তাই বিভূতি-বাবুকে আমার এত ভাল লাগত। সম্প্রতি বিভূতি-রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডের জন্য যে ভূমিকাটি লিখেছি (১৯৭১), মনে হয় তাতে আমি আমার সকল শ্রদ্ধা-প্রীতি বিভূতিবাবুর উদ্দেশে নিবেদন করতে পেরেছি। লিখে খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম। বিভূতিবাবু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্তরের মানুষ, তাঁর শিল্প-সাধনাও স্বতন্ত্র। 'আমি যাঁদের দেখেছি' বইতে তাঁর বিষয়ে একটি

বড় অধ্যায় আছে—সাপ্তাহিক বসুমতীতে বেরিয়েছিল ১৯-৫-৬৬ তারিখে। ওতে পুরো বিভূতিবাবুকে পাওয়া যাবে।

শনিবারের চিঠির আমার প্রায় চার বছরের সীমার মধ্যে বিচিত্র মানুষের স্পর্শ পেয়েছি। প্রমথনাথ বিশীর যে অসমাপ্ত ব্যঙ্গ মহাকাব্য আজও পুনর্মুদ্রিত হয় নি, তা থেকে আমি কিছু নমুনা দেব। এই মহাকাব্যে প্রমথনাথের ভাষা, ছন্দ ও মিলের উপর যে সহজ শাসন আছে, তা বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। লেখক নিজে সম্পূর্ণ আড়ালে থাকলে অন্যকে আক্রমণ করবার যে সুবিধা থাকে এবং ভাষা অনায়াস হয়, বাক্যের সযত্ন বন্ধনের দায়িত্ব কমে যায়, সেই অবস্থাতে লেখকের ক্ষমতার সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। তাই 'মনজুয়ান' ব্যঙ্গ মহাকাব্যে প্রমথনাথের অযত্নগ্রথিত সহজাত ছন্দঃক্ষমতার পরিচয় আছে। তবে আক্রমণটা স্থানে স্থানে একটু মারাত্মক হয়ে উঠেছে। বাদসাদ দিয়ে মাঝখান থেকে কবিতাটির সামান্য কিছু নমুনা দিই—

শুনিয়াছ বর্ণনা কিছু, এইবার শোনো,
তরুণের কথাবার্তা; কহিলেন গাজি,
আমাদের দমাইতে পারিবে না কোনো
বাধা বিঘ্ন, যাবো মোরা দলবলে আজি,
গিরি আরোহণ কার্যে এসো সবে সাজি।
উচ্চতম কোন্ গিরি, বল ত্বরা তুরণ।
চীৎকারে উঠিল সবে—যুবতীর স্তন।

আর এক পেয়ালা দাদা,
আর এক পেয়ালা,
এ হেন দুরূহ কার্য বিনা মদিরায়
সম্ভব হবে কি কভু? তবে হোক ঢালা।
আমাদের সভাপতি দিল যদি রায়
তবে আর কেন দেরি? আস্ত এক জালা
ঢালিল তরল অগ্নি লাভা নদীপ্রায়।

হে পাঠক ভাবিতেছ এ সব কল্পনা,
অন্তত এ সব কথা খাঁটি-সত্য নয়।
শপথি বলিব আমি এ সব গল্প না।
তরুণের অভিযান আর কি বা হয়?

তাদের নাটক, গল্প, কাব্যজাল বোনা,
স্তন আরোহণ ছাড়া আর কি বা কয়।
তাদের সাহিত্য গ্রন্থ করিলে বিশ্লেষ
পাবে শুধু কুচ, কটি, ওষ্ঠাধর, কেশ।...
(শ, চিঠি, কার্তিক ১৩৩৯)

"শুনিলে বর্ণনা কিছু" দিয়ে আরম্ভ করা স্তবক থেকে উদ্ধৃত করেছি, যে বর্ণনার কথা বলা হয়েছে তা পর্বতের ; এবং তাকে ঘিরে যে আবহাওয়া, আলো, ছায়া, কুয়াসা ইত্যাদি মিলিয়ে রহস্য, তার অতি চমৎকার কাব্যময় বর্ণনা। আমি শুধু ব্যঙ্গ অংশটি বেছে নিয়েছি—মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গ থেকে। অতএব অনুমান করা কঠিন হবে না যে, সমুদ্র থেকে এক বিন্দু জল তুলে এনে সমুদ্রের ধারণা জন্মাবার চেষ্টা করা ভুল মাত্র।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটি ব্যঙ্গ কবিতা পেয়েছিলাম, তার শেষ অংশ এই—

এই হবে গল্প লেখার আদর্শ
এবং বিবাহেরও।
তা যদি পার ত ভালই...
না হয় ওপথ থেকে ফেরো।
অস্বাভাবিক ও অকস্মাৎ--
যেমন চোখের ভাষায় বজ্রাঘাত।
অর্থাৎ অঘটন ঘটলে তবে
প্লটের খোলতাই হবে।
কিংবা বিদেশী মাল রং বদলে
তর্জমাতেই সেরো।
আর যদি সুসাহিত্য লিখতে যাও ত
সে তোমার গেরো।

বিষয়টা হবে খাঁটি জ্যাঠামি—
আর যে অপরাধ
সেটা হবে ভাষার ভেল্‌কি, কথার কাঁড়ি
আর সাহিত্যের শ্রাদ্ধ।
(শ. চিঠি, ভাদ্র ১৩৪০)

এটি শুধু শ. চিঠির সুরের সঙ্গে সুর মেলানো ছাড়া আর কিছু নয়।

এখন সমগ্র শ. চিঠির আয়োজনটাই ভাবলে হাস্যকর বোধ হয়। এতে কাজের কথা অবশ্যই ছিল, সাহিত্য বিষয়ে মূল্যবান রচনাও অনেক ছিল। কিন্তু সমস্তটা মিলিয়ে ছিল একটা দলীয় ব্যাপার, এবং আক্রমণটার বারো আনাই ছিল ডন কুইকজোটের উইণ্ডমিলের বিরুদ্ধে আক্রমণ। তবে বাকি চার আনা খাঁটি জিনিস ছিল। অবশ্য যে সময়ে শ. চিঠি চলছিল, সে সময়ের আবেষ্টনে সবটাই সত্য ছিল। সে সময় পার হয়ে এসেছি. এবং এখন পোস্ট-মরটেম করতে গিয়ে সেই সত্যের অনেকখানিই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য সব যুগেই এ রকম হয়। কোনো কিছুর আন্দোলন সে যুগ পার হয়ে এসে পিছনে ফিরে চাইলে, তার অনেক সোনাই মিথ্যা বোধ হয়। যা খাঁটি তার মূল্য একই থাকে।

শ. চিঠির প্রসঙ্গে আর এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে। নাম কৃষ্ণধন দে। সরস গল্প বলা ও লেখার হাত ছিল, কবিতা লিখত ভাল। এখন মাঝে মাঝে কবিতা দেখি নানা কাগজে। তার একটি ছন্দে লেখা গল্প আমার ভাল লেগেছিল, কিছু বর্ণনা করি—

চলেছে রাস্তা শহরের বুক চিরে
রূপিণী যেন হীরক অলঙ্কারে।
ট্রাম-বাস আর মোটর গাড়ির ভিড়ে
বিপুল শব্দ জাগিতেছে চারিধারে।
শরৎ-সন্ধ্যা, বৃষ্টি গিয়েছে থামি
সারি দিয়া লোক চলিতেছে রাজপথে
প্রিয়ার চিঠিতে বেজায় উঠেছি ঘামি
পূজোর বাজারে পয়সাটি নেই হাতে।

এমনি অবস্থায় কাহিনীর নায়ক মরীয়া হয়ে অন্যের পকেটমারার ফন্দিতে ঘুরতে লাগল। শেষকালে, খোলা মনিব্যাগ বুক পকেটে নিয়ে ধীরপদে পথচলা এক বাবুর সঙ্গে কথা বলার ছলে তার মনিব্যাগটি তুলে নিয়ে মহাখুশিতে গোপনে টাকা বার করতে গেল। কিন্তু টাকা কোথায়?—

খুলিলাম ব্যাগ, হায়রে! বয়েছে কেঁপে
শুধু কতগুলি চিঠি প্রেয়সীর লেখা।
সবেতেই শুধু—খরচ পাঠিয়ে দিও,
আর মলিনার প্রেম-চুম্বন নিও।

(শ. চিঠি, ভাদ্র ১৩৪০)

যখন সম্পাদক ছিলাম

ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী (এম-বি, এম-আর-সি-পি, টি-ডি-ডি, ওয়েলস) আমাদের আসরের বন্ধু ছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, এবং তাঁর স্মৃতিশক্তির অসাধারণত্ব দেখে আমি বিস্ময়বোধ করেছি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কোনো উপন্যাসের পনেরো পাতা মুখস্থ বলেছিলেন একদিন। এও এক আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয়েছে।

রামবাবুকে কিছুদিন ধরে বলছিলাম, আজকালকার গল্পে যক্ষ্মা রোগী এত আমদানি হচ্ছে কেন, এ বিষয়ে আপনি যদি কিছু ভেবে থাকেন তবে একটা লেখা দিন এ সম্পর্কে। রামবাবু যক্ষ্মার চিকিৎসক, অতএব দাবি তাঁর উপরেই করা হল। কিন্তু ব্যস্ত মানুষ, আমাকে একটা তারিখ দিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

তখন তিনি হ্যারিসন রোডে থাকতেন (বর্তমানে কাশীবাসী), সেখানে গিয়ে দেখি প্রার্থিত লেখা এক লাইনও লেখেননি। আমাকে বললেন—'আমি বলছি, আপনি লিখে নিন।' অগত্যা তাই করতে হল। একটি প্রবন্ধ কোথাও না থেমে আস্তে আস্তে বলে গেলেন, আমি লিখে নিলাম। কোথাও একটি শব্দও বদল করতে হয়নি—খুব অবাক হয়েছিলাম এ ঘটনায়

॥ পাঁচ ॥

ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীর রচনাটির নাম ছিল বাংলার সুকুমার সাহিত্য ও যৌনতত্ত্ব। তার আরম্ভটা ছিল এই রকম—

যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা করিতে বসিয়া কিংবা যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির পক্ষে অনেকগুলি বক্তৃতা করিতে হইয়াছে বলিয়া সাহিত্যের সঙ্গে রোগের সম্পর্ক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইবে এ কথা মনে করিতে পারি নাই। বস্তুতঃই বিষয়টি আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা মনে করিয়াছি। কিন্তু আজ দেখিতেছি ইহার প্রয়োজন হইয়াছে। তাই কিছু কথা শনিবারের চিঠির পাঠক-পাঠিকাকে শুনাইতে ইচ্ছা করি। কারণ বহু স্থানে উচ্চশিক্ষিত ও জ্ঞানপিপাসু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা প্রায়ই আমাকে বিব্রত করিয়াছেন। প্রশ্নগুলি এই: (১) বাংলার সুকুমার সাহিত্যে যক্ষ্মারোগী-রোগিণীর সহসা প্রাদুর্ভাবের কারণ কি? (২) সুকুমার সাহিত্য যে ধারায় চলিয়াছে সেই ধারার জন্যই যক্ষ্মা রোগ প্রসারিত হইতেছে কিনা? (৩) যক্ষ্মারোগে যৌন আসক্তি অশ্লীলতা প্রীতি (perversion) বাড়ে কিনা? (৪) যক্ষ্মা রোগের সহিত যৌন প্রবৃত্তির ঠিক সম্পর্কটা কি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

...বালক-বালিকাকে তরুণ বয়স হইতে যৌনবিষয়ে অভিজ্ঞতা দান করা প্রয়োজন কিনা ইহা কিছুকাল হইতে শিক্ষানবীশদের মধ্যে আলোচিত হইতেছে। আমি শনিবারের চিঠি পড়িয়া জানিতে পারিলাম যে তরুণ সাহিত্যিকগণ এ অভিজ্ঞতা দানে বড়ই প্রয়াসী। সম্ভবত তকমার অভাবে তাহারা উপন্যাস ও ছোট গল্পের আশ্রয় লইয়াছে। নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিতে সোজা ভাবেই হোক বা বাঁকা ভাবেই হোক, চেষ্টার ত্রুটি কাহারো নাই। বারংবার এই প্রশ্নে বিব্রত হইয়াছেন বলিয়াই সম্পাদক মহাশয় আমার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। শিক্ষানবীশ নহি, সুকুমার সাহিত্যেও অধিকার নাই, তরুণমতি বালকের যৌন পিপাসা সুপেয় দ্বারা নিবারণ করিবার ব্যবস্থাও আমার জানা নাই। তথাপি কিছু আলোচনা করিব।

এর পরের অংশ অনেকখানি উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করছি। অতঃপর রামবাবু লিখছেন—

(১) দেশে যক্ষ্মা রোগ বৃদ্ধি, সাহিত্যে যক্ষ্মাগ্রস্ত নায়ক-নায়িকার প্রাদুর্ভাবের কারণ ইঙ্গিত করিতেছে। ইহা নিশ্চয় সত্য কথা। নচেৎ চার-পাঁচ বৎসর পূর্বেও নায়ক-নায়িকার মধ্যে যক্ষ্মা রোগ সুকুমার সাহিত্যে দেখিতে পাইতাম না কেন, আর আজ তাঁহারাই বা সাহিত্যে এত সুলভ হইলেন কেন?

নিরপেক্ষ সমালোচকগণ ইহার যথার্থতা প্রমাণ করিতে পারিবেন...

যখন সম্পাদক ছিলাম

মহাযুদ্ধের পর ইংল্যাণ্ডে যত কিছু সুকুমার সাহিত্যের প্রসার হইয়াছিল সর্বত্রই যুদ্ধের কথার বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্যাপারটা একেবারে একঘেয়ে হওয়ায় এক তরুণ লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, দেশের যত সবল নর-নারী সকলেই যখন যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট, যাহাদের লইয়া দেশ, যুদ্ধই যাহাদের একমাত্র চিন্তনীয় বিষয়, তাহাদের বাদ দিয়া লিখিব কি? বাস্তবিক বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভবিষ্যতের উজ্জ্বল রত্ন অনেকেরই যখন রোগপ্রবণতা দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের বাদ দিয়া লেখক-লেখিকাগণ লিখিবেনই বা কি? দেশে বড়ই রোগের প্রাদুর্ভাব। নগরে পল্লীগ্রামে রাস্তায় ঘাটে আশেপাশে বাতাসে সে কথা, সাহিত্যে তাহার ছাপ পড়িবে না কেন? সাহিত্য ত সমাজ জীবনের দর্পণ।

(২) কিছুকাল আগে রুশ সাহিত্যেও যক্ষ্মা রোগের বর্ণনা যথেষ্ট ছিল। গ্রীসে প্রথম ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে তদ্দেশের সাহিত্যে উক্ত ব্যাধির যথেষ্ট ছায়াপাত হইয়াছিল। আজ ইউরোপের মানুষের চেষ্টায় এই ব্যাধি নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, কাজেই রোগের উল্লেখ কম।

(৩) যক্ষ্মারোগীকে লইয়া সুকুমার সাহিত্য সৃষ্টি করা সহজ। এমন ট্র্যাজিডি আর কোথাও সহজে মেলে না। এই রোগের প্রারম্ভে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর বিকশিত হয়। কাব্য ইত্যাদি সুকুমার কলায় আসক্তি বাড়ে। মানুষ সর্বত্র বিজয়ী ভাব দেখাইতে চাহে। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি ইহার একমাত্র কারণ।

অস্বাভাবিক চরিত্র সৃজনে যক্ষ্মা রোগীর প্রয়োজনীয়তা বহু মনস্বী লেখক অনেক দিন হইতেই স্বীকার করিয়াছেন। সাহিত্যে যখন কামুকতার নিদর্শন দেখাইতে হয়, এই সব লেখক-লেখিকাগণ অনন্যোপায় হইয়া রোগী ও রোগিণীকে আশ্রয় করে।

প্রকৃত সাহিত্য বিচার অবশ্য যোগ্য লোকের কার্য...আমার দিক হইতে আমি বুঝাইলাম। বাংলার তরুণ সাহিত্য প্রচারের ফলে যক্ষ্মা রোগের প্রসার হইয়াছে ইহা আমি বিশ্বাস করি না। যক্ষ্মা রোগ প্রসারে বীজাণুর প্রয়োজনীয়তা সর্ববাদীসম্মত। তবে এই পর্যন্ত বলা যায়, রোগীর কথা কহিবার ভঙ্গিতে চেহারায় এবং অন্যান্য লক্ষণে রোগ নির্ণীত হইতে পারে, কিংবা সন্দেহ করা যাইতে পারে। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের অনেক নায়ক-নায়িকা এই হিসাবে যক্ষ্মা রোগীর পর্যায়ে পড়িতে পারে, যদিও তরুণ লেখক তাহা স্পষ্ট বলিয়া দেন না।...কোনো গ্রন্থকার বর্ণিত নায়ক যদি দেহের রেখায় সঙ্গীত সুষমা ও সৌন্দর্য ভাসিয়া আসিতে লক্ষ্য করে তবে সে প্রকৃত উন্মাদ না হইলেও যক্ষ্মা রোগীর ন্যায় ভাবোন্মাদ হইতে পারে—ইহাও আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পরীক্ষায় টি-বি না পাওয়া পর্যন্ত কি করিয়া বলিব যে, উক্ত নায়ক প্রকৃতই যক্ষ্মা রোগী? আর যদি কথাগুলি গ্রন্থকারের কথাই হয়, তবে দেহের রেখায় যে কবি এমন স্বর্গীয় অনুভূতি পাইতে থাকেন তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় পুস্তকখানি পুলিস কবলিত হওয়ায় আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম।

(শ. চিঠি, ভাদ্র ১৩৪০)

যখন সম্পাদক ছিলাম

এখনো ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়, রামবাবু বহু বিদেশী বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি সহ সমস্ত রচনাটি একটি লিখিত রচনা পাঠের মতো বলে গিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি এখনো পড়তে ভাল লাগে, যদিও দেশে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব অনেকটা কমে যাওয়ার দরুন সাহিত্যেও তা এখন কমে গেছে। রামবাবু সংস্কৃত, বাংলা বা ইংরেজি আবৃত্তিতে খুব দক্ষ ছিলেন। নিরামিষাশী। বক্তৃতা দানে নিপুণ। বিদেশেও তাঁর এই খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। কত সন্ধ্যা আমরা নবশক্তিতে সরোজ রায়চৌধুরীর ঘরে একত্র মিলেছি। বঙ্গশ্রীতে মিলেছি, শিশিরকুমার ভাদুড়ির সাজঘরে মিলেছি, বিনয়কৃষ্ণ দত্তের আড্ডায় মিলেছি, এবং ১৯৫৪ সনে আমি অসুস্থ থাকাকালে আমাকে দেখতে এসেছেন, মে মাসে। তারপর জুলাই মাসে, তাঁর লেখা ক্ষয়রোগ কথা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে সেখানাও আমাকে দেন। এরপর সম্ভবতঃ আর আমাদের দেখা হয় নি।

প্রায় চল্লিশ বছর আগের এ সব রচনাতে তখনকার সাহিত্য বিষয়ক বা সমাজ বিষয়ক যে চিন্তাধারার পরিচয় আছে তার ঐতিহাসিক মূল্যই বেশি, যদিও আজও এ সব বিষয়ের নিজস্ব মূল্যও যথেষ্ট বোধ হবে। সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে চিন্তাধারা ধীরে ধীরে বদল হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ হয় না। আমি ১৯৩৫, ভাদ্র ১৩৪২ সংখ্যায় যে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলাম (প্রসঙ্গকথা নামে), তাতে দুটি বিষয় আলোচিত হয়েছিল। একটি গ্র্যাজুয়েটদের দুর্দশার কথা, অন্যটি লেখক-প্রকাশক সম্পর্কের কথা। প্রথমটি এখনো আলোচনার বাইরে নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টির কাল পার হয়ে গেছে। দুটিরই কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি। খবরের কাগজে একটি স্কুলের বিজ্ঞাপন দেখে মনে কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটিতে লেখা ছিল—

Wanted a sacrificing graduate strong in Mathematics or English. State minimum pay acceptable.

দেখিবামাত্র মনে আশার সঞ্চার হইল।...যে সহজ আত্মত্যাগ শুধু গ্র্যাজুয়েটদের ভিতরেই আশা করা হয়, তাহা যে তাহাদের মধ্যে নাই ইহাতে তো সন্দেহ নাই। থাকিলে স্যাক্রিফাইসিং গ্র্যাজুয়েট চাহিবে কেন?...

কিন্তু যিনি গ্র্যাজুয়েটদের পক্ষ হইতে স্যাক্রিফাইস আশা করেন, তিনি কি নিজে কিছু স্যাক্রিফাইস করেন না?...স্যাক্রিফাইসিং গ্র্যাজুয়েট চাহিয়া যে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দেন তিনি এই স্যাক্রিফাইসের বিনিময়ে স্কুলটিকেই স্যাক্রিফাইস করেন।...

যখন সম্পাদক ছিলাম

রচনাটির পরবর্তী অংশ লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক নিয়ে। সে দিন যা সত্য ছিল, এ ব্যাপারেও তার কিছু বদল ঘটেছে। কিছু নমুনা দিচ্ছি—

লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে যোগান ও চাহিদার সামঞ্জস্য করিতে হইবে। বর্তমানে প্রকাশকের দিক হইতে কোনো চাহিদা নাই। সে দিব্য আরামে ভরা নদীর তীরে নৌকা ভিড়াইয়া বসিয়া থাকে। লেখকগণ তাহাদের 'সোনার ধান' নিজেই মাথায় বহিয়া সেই নৌকায় তুলিয়া দিতে আসে। নৌকা বোঝাই হইয়া অপর পারে চলিয়া যায়, লেখকগণ তীরে বসিয়া মাঝির কৃতিত্ব দেখিয়া অবাক হয়, আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।...

প্রকাশকের দিক হইতে প্রকাশযোগ্য বই সংগ্রহ করিবার গরজ আছে কিনা তাহা লেখক বুঝিতেই পারে না। লেখক নিজেই তাহাকে সে সুযোগ দেয় না।...প্রকাশককে দুষিয়া লাভ কি? পণপ্রথা মেয়ের পিতার জন্যই আজিও টিকিয়া আছে। কিন্তু যে ছেলেমেয়ে পরস্পর পরিচিত হইয়া, পরস্পরকে পছন্দ করিয়া, বিবাহ করে (অনেক সময় অভিভাবককে অগ্রাহ্য করিয়া) তাহাদের মধ্যে পণপ্রথা অচল।

তাই মনে হয়, লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে যদি পরস্পর পরিচয়ের সুযোগ ঘটিত, যদি উভয়ে উভয়ের প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিত, তাহা হইলে কেহ কাহাকেও এরূপভাবে দুষিতে পারিত না। সুতরাং এখন কর্তব্য, লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে যাহাতে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা। লেখক লেখা ছাড়িয়া, প্রকাশক দোকান ছাড়িয়া, কিছুকাল মোটরে করিয়া লেকে কিংবা বট্যানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরিতে থাকুক। দুইজনে গলাগলি করিয়া ময়দানে বেড়াক, একত্র সিনেমা দেখিতে যাক...তাহা হইলেই বর্তমানের এই অপ্রেমের সম্বন্ধটা সহজেই দূর হইয়া যাইবে। উভয়েই বেড়াইতে বেড়াইতে দরদস্তুর চলিতে থাক, উভয়েরই স্বার্থ যাহাতে পুরা বজায় থাকে এরূপ বন্দোবস্ত হউক, আর যদি দরে না পোষায় উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন-পাশ-বদ্ধ হইয়া ডুবিয়া মরুক। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁহার নবপ্রকাশিত পদ্মা নামক উপন্যাসের ভূমিকায় এই বিষয়টিই অতি নিষ্ঠুরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আমাদের লেখককের প্রধান দোষ তাহাবা কেবল লেখার উপর নির্ভর করে। বাংলা সাহিত্যে এখনও সে সময় আসে নাই, যাহাতে ভাল লিখিব, আবার টাকাও পাইব। কারণ এ সাহিত্যের অধিকাংশ পাঠক মূর্খ। টাকা চাহিলেই মূর্খের মত লিখিতে হইবে। নিজের মত লিখিলে টাকার আশা নাই। এ সাহিত্যে সার্থক রচনা নিতান্তই অর্থভাগ-শূন্য।...আমাদের লেখকেরা এ কথাটা বুঝিয়া বুঝে না। তাই তাহাদের দেখিয়াছি প্রকাশকের আপিসে শুষ্ক মুখে তীর্থের কাকটির মত বসিয়া থাকিতে। তাই তাহারা বই ছাপিয়া ভীতি গদগদ বচনে একবার স্মরণ করে পাঠককে, একবার স্মরণ করে প্রকাশককে। বইটার কৃতিত্ব যেন তাহাদেরই। যেন মগজের অপেক্ষা কাগজের মূল্য বেশি।...

প্রমথবাবু একটি দিকমাত্র দেখিয়াছেন, অন্য দিকটি দেখেন নাই। সে দিকে মগজের অপেক্ষা কাগজের মূল্য যথার্থই বেশি। অধিকাংশ পাঠক যেমন মূর্খ, অধিকাংশ বাংলা বই তেমনই অপাঠ্য। অর্থাৎ অধিকাংশ লেখক তেমনি মূর্খ।

ইহার চেয়ে নূতন বই পড়া বন্ধ করিয়া দিলে কেমন হয়? প্রকাশক যেখানে বিশ্বাসযোগ্য নহে, সেখানে ইহাই উৎকৃষ্ট পন্থা। এ সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট মত উদ্ধৃত করিতেছি,

I rejoice to say that I have no passion for shaking hands with strangers. I do not yearn for vast unexplored regions. I take the North Pole and the South, the Sahara and the Karoo for granted. As Johnson said of the Giant Causeway I should like to see them but I should not like to go to see them. And so with books. Time is so short that I have none to spare for keeping abreast with the circulating library. I could almost say with the Frenchman that when I see that a new book is published I read the old one."

আরম্ভে বলেছি লেখক-প্রকাশকের সম্পর্কের কিছু বদল ঘটেছে। তার কারণ এখন অনেক লেখক প্রকাশক হয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার নিজের বই নিজে ছেপে পথে চেঁচিয়ে বলেছিল, সব লেখককেই এপথে নামতে হবে। তার ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা ফলেছে। কিন্তু তবু যতই বলা যাক, বিক্রির সম্ভাবনা না থাকলে ভাল বই প্রকাশক ছাপতে সঙ্কুচিত হয়। এক মাসে বা ১৫ দিনে তিন-চারটি সংস্করণ না হলে ভাল বইয়ের ভাগ্য এখনো পূর্ববৎ। শুনেছি অনেক বই একেবারে তৃতীয় বা চতুর্থ সংস্করণ দিয়েই আরম্ভ হয়, কারণ এতে বিজ্ঞাপনের জোর হয়। ইংরেজী বইএর বিজ্ঞাপন দেখি বিলিতি কাগজে, কিন্তু কোথাও সংস্করণ সংখ্যা লেখা হয় না। তা শুধু বইয়ের পাতায় লেখা থাকে।

শনিবারের চিঠিতে নানা বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা কৌতুক করা হলেও তার একটি বিশেষ নীতি ছিল এবং তাতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হলেও কৌতুক অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে ছ্যাবলামির পর্যায়েও উঠেছে, এবং তা তখনকার পরিবেশে স্বাভাবিক মনে হলেও আজ তা লজ্জাকর বোধ হয়। আমি সব রকম নমুনাই দিয়েছি।

বঙ্গশ্রী ও শনিবারের চিঠি ঘিরে, যে আড্ডা জমে উঠেছিল তার মধ্যে কনিষ্ঠতম—বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাসব ঠাকুর নামে বেশি পরিচিত। যখন

সে আড্ডায় যোগ দিয়েছিল তখন তার বয়স মাত্র ১৬ বছর। কিন্তু সে বলত তার বয়স ২৪। বয়স কমানোর প্রসিদ্ধিই আছে সর্বজনসমাজে, কিন্তু ১৬কে ২৪ বানিয়ে সবার সঙ্গে সিগারেট খাওয়ার সুবিধা করে নেওয়ার দৃষ্টান্ত সে একা।

বাসবের সত্য প্রতিভা ছিল কাব্য রচনায়, এখন শুধুই তার স্মৃতি মাত্র। যে সুর ছিল তার প্রাণে, তার কবর রচনা করে অন্য শিল্পে মন দিয়েছে রয়্যাল অ্যাকাডেমি থেকে ঘুরে এসে। এখন তার হাতে প্লাস্টার অভ প্যারিস (সোজা বাংলায় যাকে বলে ক্যালসিয়াম সালফেট) অথবা রং ও তুলি। আমি তার আহ্বানে তার ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির বাড়িতে তার ঘরে বসে তার তখনকার লেখা কবিতা শুনেছি তার আবৃত্তিতে। তখন তার বয়স মাত্র সতেরো। পরে ১৯৩৩ সনে তার প্রথম কবিতার বই ছাপা হয়, আমি সেই বই থেকে সেই তখনকার শোনা কবিতাংশ কিছু কিছু উদ্ধৃতি করছি।—

জীবনের বন্যায়
কতকাল বয়ে যায়,
কতদিন ভেসে গেল অকূল পানে
এ জীবন শেষ হবে কবে কে জানে।
ফুলের বাগানে দেখি
সবি ঝরে গেছে এ কি…
চামেলি বকুল আর মালতি বেলা
ভ্রমর কাঁদিছে তার ফুরাল খেলা।
জনহীন মাঝরাতে
আপনার বেদনাতে
যত সুর বেঁধেছিনু বেসুরা হল,
সেতারের তার বলে বাঁধন খোল।…

ভারি মিষ্টি সুর। অন্য একটির আংশিক নমুনা—

ফাগুন ফুরায় পিক উড়ে যায়
শুকায় ফুল,
অশেষ ভাবিয়াছিনু এ জীবন
সে শুধু ভুল।

যখন সম্পাদক ছিলাম

স্বপন মিলায় বুক পুড়ে যায়
তাহার পর,
এই দুনিয়ার কোনোখানে তাই
বাঁধিনি ঘর।

এই বয়সেই বেদুইন হয়ে যাওয়ার কল্পনায় কিছু অকালপক্কতা আছে সন্দেহ নেই। (কারণ পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাকে ঘর বাঁধতে হয়েছে।)

বাসব ঠাকুরের কথা প্রসঙ্গে ফিরে আসি তার দাদুর কথায়। দাদু-কবি ছিলেন অনেকখানি দাদুপন্থী কবি। দাদু অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শনিবারের চিঠির কাছ থেকে তিনি বেদনা পেয়েছিলেন প্রচুর। তাঁকে আঘাত দেওয়া হয়েছে মর্মান্তিক। একটি রচনায় মোহিতবাবু বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে তাঁর অনশন ব্রত উপলক্ষে যে 'প্রাণস্পর্শী আহ্বানবাণী' শুনিয়েছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী যুগের ভাবস্মৃতির পুনঃপ্রকাশ" দেখে মোহিতবাবু মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ দেশী ছিলেন, তারপরের রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রায় বাতিল করে দিয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন এই প্রশংসা কবির হঠাৎ আত্মবিস্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ নিজেকে ভুলে গান্ধীজিকে হঠাৎ প্রশংসা করে ফেলেছেন।

আমি শ. চিঠিতে যোগ দেবার দু' মাস পূর্বে (ইং ১৯৩২. আশ্বিন ১৩৩৯) এটি প্রথম প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়। গান্ধীজির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একখানা চিঠিতে লিখছেন—(শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে), আমি এই প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃত করি।

...মহাত্মাজি সম্বন্ধেও তুমি কিছুই জানো না, আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানি—তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। তোমার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর মতের মিল নেই বলেই তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা শ্রদ্ধেয় নয়। এ ক্ষেত্রেও তোমাকে বলি, মনকে এই বলে নম্র কোরো, "আমি হয় তো তাঁকে জানিনে, জানা আমার সাধ্যের মধ্যে নয়, অতএব নীরব থাকব।"

(চিঠিপত্র-৯, ২।১০।১৯৩২)

কাজেই রবীন্দ্রনাথ ভুল করে বা আত্মবিস্মৃত হয়ে মহাত্মাজিকে প্রশংসা করেছেন, এ কথা মানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের উপর বহু আক্রমণ বিষয়েও তাঁর মতামত নানা চিঠিতে ব্যক্ত হয়েছে। আমি কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি।—

যখন সম্পাদক ছিলাম

সাধ্যমতে স্বদেশকে নানাপ্রকারে সেবা থেকে আমি বঞ্চিত করিনি অথচ আনন্দের সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে অব্যাঘাতে নির্মমভাবে দেশের লোক আমাকে যত গাল দিয়েছে বাংলাদেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন কেউ নেই। এই এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আমার জীবনে।

(ঐ, ৫।১২।১৯৩২)

আমার এতদিনকার অভিজ্ঞতায় এটা আমি দেখলুম, আমার রচনায় বা কর্মে দেশের জন্যে যা কিছু করে থাকিনে কেন, আমার শক্তিকে স্বীকার করেও দেশ আমাকে ভালোবাসতে পারেনি। এই জন্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র আমাকে কুৎসিত নিন্দা করতে নিন্দুক শুধু যে সাহস পায় তা নয়, সে নিন্দা নিয়ে লাভের ব্যবসা সম্ভব হতে পারে। তাতে সাধারণের মনে সে পরিমাণে আঘাত লাগে না বলেই এমনটি হতে বাধা পেল না। তোমাদের গভীর অন্তরে এর বিরুদ্ধে তোমাদের ঘৃণা নেই করুণা নেই …হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেও তোমাদের মনের অবচেতন রাজ্যে এর সমর্থন এমনকি আনন্দ আছে। …অনেকে বলেন, দুই একজনের অপরাধ সকলের পরে আরোপ করা উচিত হয় না।…আমার উত্তর এই, যে-হিংস্রতাকে সকলেই বিনা আপত্তিতে মেনে নেয়, সে হিংস্রতায় সকলেরই ভাগ আছে, দেশে আমার নিন্দাব্যবসায়ের ঘুমন্ত সরিক তোমরা সবাই। এক দিন এ কথা আমার মনে সুস্পষ্ট হয়েছিল যখন তুমি আমার ব্যবহার-সামগ্রী সহজেই এমন কাউকে দান করতে পারলে যাঁর লেখনী আমার প্রতি কটূক্তিতে সর্বদা বিষাক্ত।

(ঐ, ৭।৮।৩৪)

শ. চিঠি রবীন্দ্রনাথকে বহুদিক থেকে আক্রমণ করেছিল। আমি এই রবীন্দ্রবিদূষণের উত্তরাধিকার মাত্র পেয়েছিলাম। কাজেই দোষ কারো একার নয়, সবারই, এ কথা সত্য। রবীন্দ্রনাথের মর্ম বিদ্ধ করে যে আক্রমণ বড়রা আরম্ভ করেছিলেন, তার যোগ্য উত্তর রবীন্দ্রনাথের ঐ পত্রাংশ-গুলিতে আছে। এমন মহৎপ্রাণ ব্যক্তিকে আঘাত করা সহজ ছিল বলেই করা হয়েছে, তিনি পাল্টা আক্রমণ করবেন না জেনেই করা হয়েছিল। মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথকে আপন দলে টানার ব্যর্থতা। তিনি যদি একমাত্র শনিবারের চিঠির দলকেই প্রশ্রয় দিতেন এবং অন্য দলের ক্ষমতা অস্বীকার করতেন তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে একটা কথাও উঠত না। শুধু তাই নয়, তখন তাঁকে অন্যের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার অযাচিত চেষ্টা করা হত, সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ থাকবার চেষ্টা করেছিলেন, এবং দলনির্বিশেষে ক্ষমতাকে স্বীকার করেছিলেন। এ অপরাধ ক্ষমা করা চলে না।

আমার কাছে কোনো দল হিসাবে ভালমন্দ বিচার ছিল না, কারণ

আমি রচনা হিসাবেই ভালমন্দের কথা ভেবেছি—নিজের রুচি অনুযায়ী এবং শিক্ষা অনুযায়ী। এবং রবীন্দ্রনাথ যখন ছাত্র অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লিখেছিলেন 'তোমার প্রতিভা আছে স্বীকার করি, তাতে আমার বিচলিত হবার লেশমাত্র কারণ ছিল না, হইও নি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ে সমাজ বিষয়ে এবং ধর্ম বিষয়ে যাবতীয় মতকে আমি শ্রদ্ধা করেছি। এমন কি আর্ট বা চিত্রশিল্প বিষয়ে তাঁর মত তাঁর পায়ের কাছে বসে (১৯২১) শুনে আমার নতুন জ্ঞান লাভ হয়েছিল সে কথা আমি একাধিক ক্ষেত্রে স্বীকার করেছি, এবং তাঁর নিজের পেনটিং ও রেখাচিত্র নিয়ে বিচিত্রা ও বঙ্গলক্ষ্মী মাসিকে প্রবন্ধ লিখেছি, শ. চিঠিতে যোগ দেবার অনেক আগে। এবং অনেক পরে লিখেছি যুগান্তরে।

এ কথা সত্য যে, আমার মনের দিক থেকে আমি কোনো দলের ছিলাম না। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার একটা ধারাবাহিকতা বাল্যকাল থেকে অদ্যাবধি অটুট আছে, এবং কোনো বিরূপ সমালোচনাতেই তা যাবে না। এবং আমি ভাল ভাবেই জানি যে, তাকে কোনোমতেই স্তাবকতা বলা চলে না। স্তাবকতা কথা থেকে রবীন্দ্রনাথেব আর একটি স্তাবকতা বিরোধী ঘটনা মনে পড়ল। সে ঘটনা বলবার আগে স্তাবকতা কথাটি আমার মনে যে অর্থ বহন করে সে কথাটা বলি। স্তবস্তুতি—ভুলিয়ে কিছু আদায়ের চেষ্টা বলেই আমি জানি। লোকে যে ভাবে দেবতাকে স্তব করে। সেও কিছু স্বার্থ আদায়ের ব্যাপার। পুরাণে অনেক কাহিনী আছে, তাতে দেখা যায় দেবতারা স্তব বা স্তুতি পছন্দ করতেন, জোর করে আদায়ও করতেন অনেকের কাছ থেকে। স্তুতি আদায় করতে না পারলে যে অবিনয়ী তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন। সে অর্থে আমার শ্রদ্ধাকে আমি স্তুতি বলতে রাজি নই। স্তুতি কথাটিই আমার কাছে ঘৃণ্য।

অনেকের মুখে শুনেছি—"তাই বলে তিনি যা লিখবেন তাকেই প্রশংসা করতে হবে?"—এই রকম একটা প্রশ্নের সাহায্যে নিজের 'নিরপেক্ষতা' অহঙ্কারের সঙ্গে তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন। এরকম একটি কথা উচ্চারণ করাও আমার কাছে হেয় মনে হয়। কারণ এমন একটি প্রতিশ্রুতি—অর্থাৎ যা লিখবেন তাকেই ভাল বলতে হবে—কে দাবি করে আদায় করতে চায়.

আমি জানি না। এমন কথা যে বলে, সে রবীন্দ্রনাথের দান গ্রহণে অক্ষম বলেই বলে। যদি কেউ বলে আমি "শেক্সপীয়রের ভক্ত" তৎক্ষণাৎ কি কি কেউ বলে "তা বলে তিনি যা লিখেছেন তাই ভাল বলতে পারি না।" —তা হলে বুঝতে হবে সে শেক্সপীয়রের গুণ গ্রহণে অক্ষম বলেই সঙ্গে সঙ্গে এমন কথা তোলে। সম্ভবত এমন কথা শুধু আমাদের দেশেই ওঠে। এটি ঈর্ষার কথা, কেননা কোনো মহৎ লোক সম্পর্কেই তাঁর প্রশংসা করা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে একথা ওঠে না যে, "তাই বলে তিনি যা করেন তাই ভাল বলতে পারব না।" একটু ভাবলেই বোঝা যায় সমগ্রের প্রতি কতখানি ঈর্ষা থাকলে এমন জবাব দেওয়া সম্ভব। যথার্থ মূল্যায়ন সব দেশেই সমালোচকেরা করে থাকেন, এবং রবীন্দ্রনাথের সমালোচকও কখনো রবীন্দ্রকাব্য-সৌন্দর্য বিচারে বলবেন না যে, 'কাঁটাবনবিহারিণী সুরকানা দেবী'—উৎকৃষ্ট রবীন্দ্র কাব্য। এবং তিনি একথাও বলবেন না যে, 'এ রচনা আমি পছন্দ করি না।' কারণ এ প্রসঙ্গে এ কথা তোলাটাই অসমালোচকোচিত। এর স্থান পৃথক।

স্তাবকতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি আমার কাছে মূল্যবান বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ অকারণ আক্রান্ত হয়ে তাঁর সমালোচকের প্রতি যে সৌজন্য ধৈর্য এবং শালীনতা দেখিয়েছেন, তা রবীন্দ্রনাথেরই উপযুক্ত, শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট। অন্য কেউ হলে যেখানে argumentum baculinum-এর আশ্রয় নিতেন, সেখানে ৫০ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ লজিকের আক্রমণে প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করেছেন। চিঠিখানি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীতে আমি প্রথম দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সেই চিঠিখানা আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। এখানি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে বোলপুর থেকে লেখা—

প্রিয়বরেষু

আপনি আমার স্তাবকবৃন্দের মধ্যে ভরতি হইতে পারিবেন না এ কথাটা জোরের সঙ্গে কেন যে বললেন আমি ভাল বুঝতে পারলাম না। "আপনার নিন্দুকের দলে আমি যোগ দিতে পারব না" এ কথাও তো আপনি বলতে পারতেন। এ সমস্ত অনাবশ্যক কথা গায়ে পড়ে উত্থাপন করা কি জন্যে?

স্তাবকতা বলতে যদি এই বোঝায় যে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরের স্তুতিবাদ

সবা তবে একাজ আপনি পারবেন না এমন কথা বলাও আপনার পক্ষে অযোগ্য হয়েছে।

স্তাবকতা বলতে যদি এই বোঝায় বিচারশক্তির দোষে একজনের মন্দকেও ভাল বলা • সে কাজ আপনি পারবেন না এ কথা আপনি জোর করে কি বলবেন? আপনার 'চন্দ্র'কে আমি ভাল বলেছিলেম বলে অনেকে আমার বিচারশক্তির প্রতি দোষারোপ করেছিলেন ..যদি বস্তুতই আমি সে দোষের ভাগী হই তবে তার উপরে আমার হাত নেই।

স্তাবকতা বলতে যদি এই বোঝায় অন্যের ভালকে ভাল বলা তবে আমার সম্বন্ধে আপনি সে কাজে অক্ষম এ কথা এতটা উগ্রতার সঙ্গে না বললেও ক্ষতি হত না।

বোধ হয় আপনার বিশ্বাস আমার একদল স্তাবক আছে···অর্থাৎ যাদের প্রশংসা উক্তির সঙ্গে আপনার মতের মিল হয় না···হয় তাদের বুদ্ধির, নয় তাদের স্বভাবের দোষ দিয়ে আপনি তাদের প্রশংসাবাক্যকে স্তাবকতা শব্দে অভিহিত করছেন। আপনি তাদের যা মনে করছেন তারা যদি সত্যই তা হয় তবে নিজেকে তাদের চেয়ে অনেক উঁচু দরের লোক বলে ঘোষণা করবার কিছু না হোক অনাবশ্যক। ওতে কেবল আপনার অন্তঃকরণের একটা অতিমাত্র উত্তেজিত অবস্থা প্রকাশ হচ্ছে।

অপ্রিয় সত্য বলা সম্বন্ধে আপনি কিছু অহঙ্কার প্রকাশ করেছেন। এমন একদল লোক আছেন অপ্রিয় সত্য বলাটা তাঁদের একটা বিশেষ সখ—আমরা কাউকে খাতির করে কিছু বলিনে মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলে থাকি এই বলে তাঁরা গায়ে পড়ে গর্ব প্রকাশ করে থাকেন। মনের অবস্থাটা এ রকম হলে সত্য নির্ণয়ের প্রতি তেমন দৃষ্টি থাকে না, ঔদ্ধত্যের আনন্দে অপ্রিয়তাটাকেই যতদূর সম্ভব কচলে তোলা হয়।

কিন্তু সে আপনার নিজের স্বভাব নিজে বুঝবেন—আপনি আমাকে অপ্রিয় সত্য জানাবার জন্যে যতটা উদ্দীপনা অনুভব করেছেন যতদূর শ্রমস্বীকার ও সময় ব্যয় করেছেন··· কোনোদিন প্রিয় সত্য শোনাবার জন্য ততটা উৎসাহ অনুভব ও ক্লেশ স্বীকার করতে যদি না পেরে থাকেন তবে তার ক্ষতিপূরণ আপনার অন্তরের মধ্যে থেকেই অনুভব করবেন।

এবারে আপনার চিঠি থেকে এই বুঝলুম আমাদের পরিবারের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা যে আমরা অহঙ্কৃত। এর বিপরীত ধারণার কথাও আপনারই ন্যায় ভাল লোকের মুখে শুনেছি, আপনি বলবেন যাঁর কাছে শুনেছি তিনি স্তাবক—তা যদি হয় তবে যাঁরা নিন্দার কথা বলেন তাঁরা যে নিন্দুক নন তা কেমন করে বুঝব? এর থেকে বস্তুত এই বোঝা যাচ্ছে আমাদের পরিবারকে কেউ বা এক রকম বলেন কেউ বা অন্য রকম বলেন—সকলেই এক ভাবে একই কথা বলেন না।

দ্বিতীয় নালিশ এই যে, আমাদের বাড়িতে নিজেদের নাটকেরই অভিনয় করা হয়েছে সেটা আপনার মতে 'self-advertising'। আপনার বাড়িতে এবং অন্য বাড়িতেও আপনার মুখে আপনারই রচিত গান বিস্তর শুনেছি কিন্তু কোনোদিন সে কাজটাকে "self-advertising" বলে গণ্য করিনি। এমন কি, আপনার নিজের শিশুসন্তানগুলিকেও আপনি

যখন সম্পাদক ছিলাম

নিজের গানের দোহারকি বানিয়ে যখন অতিথিদের আপ্যায়িত করেছেন তখনো এক মুহূর্তের জন্য আমার এবং আশা করি আর কোনো ভদ্রলোকের মনে আপনার প্রতি এ রকম সংশয় উদয় হয়নি—আপনি যখনই কবিতা আবৃত্তি করেছেন তখনি আপনার স্বরচিত কাব্য আপনার মুখ থেকে শুনেছি একবারও তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু তাতে আমি প্রত্যেকবারেই বিশুদ্ধ আনন্দলাভ করেছি "disgusted" হইনি। তারপরে আর একটা কথা বলা আবশ্যক আপনি বোধ হয় জানেন আপনার "বিরহ" সমারোহ সহকারে আমাদের বাড়িতে অভিনীত হয়েছে—এছাড়া আলিবাবা, আবু হোসেনের অভিনয় হয়েছে—কিন্তু হয়েছে কি না হয়েছে সে তর্ক আমি অনাবশ্যক বোধ করি।

সঙ্গীত সমাজে আমার লেশমাত্র কর্তৃত্ব নেই—এমন কি, সেখানে জ্যোতিদাদাও নিজের শান্ত স্বভাববশতই কর্তৃত্ব করতে বিরত। সেখানে অন্যান্য বহু নাটকের অভিনয়ের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে আমার রচনাও অভিনীত হয়ে থাকে তবে তার থেকে আপনি এইটেই জানবেন সেখানে কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেউ কেউ আমার রচনা পছন্দ করে থাকেন—তাদের সবাইকে আমার স্তাবক বলে যদি সান্ত্বনা লাভ করেন তবে সে পথ মুক্ত আছে।

নিজের কথা বলা মাত্রের মধ্যেই অহমিকা আছে আত্মজীবনী লিখতে গেলে সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে লেখা চলে না সেই অনিবার্য অহমিকার জন্যই আমি উক্ত লেখার আরম্ভে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেম—এটাকে ইচ্ছাপূর্বক অহঙ্কার করতে বসে মাপ চাওয়ার বিড়ম্বনা বলে মনে করবেন না।

মেজদাদা আমার রচিত কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে advertize করে বেড়িয়েছেন এ কথা আপনার মুখে শোনা গেল—তার কারণ আপনি অপ্রিয় কথা বলবার ভার নিয়েছেন—আর কারো মুখে শুনিনি তার কারণ এ নয় যে, আপনি ছাড়া আর কেউ সত্য বলেন না। আপনি অতি সহজেই এমন কথা মনে করতে পারতেন যে আমার কবিতা তাঁর কাছে পরিচিত এবং প্রিয় সেই জন্যেই তিনি এ কথা ভুলে যান যে, আমার কবিতা আবৃত্তি করলে আর কারো মনে বেদনা জাগতে পারে। আমার কবিতা আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে অবিবেচনার কাজ হতে পারে। কিন্তু যিনি চিরজীবন নিজের মান-মর্যাদা সমস্তই অতি সহজে সকলের কাছে নত করে রেখেছেন একদিনের জন্যও যাঁকে কেউ অহঙ্কার অনুভব করতে দেখেনি তিনি আমার কবিতা advertize করার ভার নেবেন এ কথা অশ্রদ্ধেয়। এমন কি, আমার বিশ্বাস, আপনিও জানেন তিনি পারিবারিক আত্মশ্লাঘার জন্য একাজ করেন নি—স্নেহবশত বা পরিচয়বশতই করেছেন—কিন্তু আপনি এমন এক স্থানে ক্ষুব্ধ হয়েছেন যেখানে আঘাত পেলে শান্তভাবে সত্যগ্রহণের প্রতি লক্ষ্য থাকে না।

আদি ব্রাহ্মসমাজে আমাদেরই রচিত গান গাওয়া হয় এ কথা সত্য নহে—এমন সকল লোকের গান আছে যাহাদের নামও কেহ জানে না এবং ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে আমাদের কোন গান যে কার এ পর্যন্ত তা advertize করাও হয় নাই—কোন গানই যে আমাদের তা অনুমান ছাড়া জানবার উপায় নাই।

আপনি আমার এবং আমাদের সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব অকুণ্ঠিত চিত্তে আমার এবং সর্বসাধারণের সমক্ষে ঘোষণা করতে পারেন, আমাকে এই কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছেন···ভালই করেছেন···আমার এ বয়সে আমি যদি কোনো শিক্ষা পেয়ে থাকি তবে আশা করি আপনার অপ্রিয় আচরণ আমার পক্ষে দুঃসহ হবে না। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩১২।

এ চিঠি থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল কি কি অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সোজাসুজি এনেছিলেন বোঝা যায়। বিরোধিতা মাত্রা ছাড়িয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ অকারণ। কোনো লেখা নিয়ে বা নীতি নিয়ে বিরোধিতা তো তিনি 'আনন্দ বিদায়' নাটকে করেছিলেন, এবং তার ফল ভোগও করেছিলেন হাতে হাতেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজে এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। তবু তো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক 'দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে ওটা ছিল মতভেদজনিত কিছু নিম্নরুচির আক্রমণ। কিন্তু তিনি এ চিঠিখানি লিখে যে রুচিহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার কোনো অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমি আমার এই রচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মাত্রা নামক রচনার যে প্রতিবাদে সবাই উল্লসিত হয়েছিলেন, সে কথার উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একখানি চিঠির কথা বলি। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

আমার যে প্রবন্ধ নিয়ে···ও···ছেঁড়াছেঁড়ি করেছেন সেটা তাঁদের বিরুদ্ধে লিখিত নয়।—তাঁর রচনা ভালো লাগে না বলে দু'চার পাতা ছাড়া তাঁর কোনো বই আমি পড়তে পারি নি। ···র গোড়াকার বই পড়ে আনন্দ পেয়েছি তাঁর···বই ভালো লাগল না বলে তাঁর হাল আমলের বই আমি পড়িনি। তাঁরা গায়ে পড়ে ধরে নিয়েছেন যে, তাঁদেরই লক্ষ্য করে আমি লিখেছি। ঝগড়া তাঁরাই করেছেন তাল ঠুকে, আমি চুপ করে আছি।

চিঠিখানা ১৯৩৪, অগস্ট মাসে লেখা। অর্থাৎ 'ছেঁড়াছেঁড়ি'র আট মাস পরে। ছাপা চিঠিতে নাম উহ্য থাকলেও আমি পরে জেনে নিয়েছি। চিঠিপত্র-৯ (বিশ্বভারতী) থেকে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের এ সব চিঠি বাংলা সাহিত্যের একটি ক্রান্তিকালের মূল্যবান ইতিহাসের উপকরণ যোগাবে। আগেই বলেছি, এই রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা সহজ ছিল বলেই তিনি এত আক্রান্ত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমি আর্টের অর্থ নিয়ে যে

পাঠ গ্রহণ করেছিলাম (১৯২১), তাঁর কাছে একান্তে বসে, সেই শিক্ষা ভাঙিয়েই আমি বিচিত্রা ও বঙ্গলক্ষ্মীতে যে দুটি প্রবন্ধের কথা পূর্বে বলেছি, সে দুটি লিখেছিলাম। প্রথমটি ১৯৩১ সনে, দ্বিতীয়টিও ওর কাছাকাছি সময়েই যত দূর মনে পড়ে। এর পর ঠিক ঐ একই দৃষ্টিতে ছবি দেখতে আরম্ভ করেছি, এবং পরে কয়েকটি প্রদর্শনী দেখে এবং বিশেষ করে বীডন স্কোয়ারে আয়োজিত একটি চমৎকার প্রদর্শনী দেখে শনিবারের চিঠিতে (ফাল্গুন, ১৩৪০) একটি ছোট্ট রচনা লিখি। সেটি আরম্ভ করেছিলাম এই ভাবে—

প্রকৃতির যে শোভা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, চিত্রকর যদি সেই শোভা অল্পপরিসর জায়গায় আমার জন্য আঁকিয়া দেন তাহা হইলে ঘরে বসিয়া আমি তাহা প্রত্যহ দেখিতে পারি। বাহিরে চোখ চাহিলেই যাহা দেখা যায়...নানা আয়োজন করিয়া তাহারই ছবি আমি ঘরে বসিয়া দেখিব এরূপ ইচ্ছা আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক। অনেক সময় উন্মুক্ত আকাশের নিচে যাহা আমার চোখে পড়ে না, ছোট ছবিতে আমি তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। আকাশে যে মেঘ দেখিয়া আমার ভাল লাগে ছবিতে সেই মেঘ দেখিয়া আমার ভাল লাগা স্বাভাবিক। তাজমহল দেখিতে ভাল লাগে, তাহার একটি মডেল প্রস্তুত করিয়া ঘরে রাখিয়া দিলাম...প্রত্যহ তাজমহল দেখিবার কাজ হইতেছে। কাজেই যাহা বাহিরে আছে তাহারই হুবহু নকল যিনি যত সফলতার সহিত করিতে পারিবেন তাঁহাকেই আমরা চিত্রকর হিসাবে তত বেশি সম্মান দিয়া থাকি। চিত্রশিল্প বলিতে সাধারণ লোক ইহার চেয়ে অধিক কিছু বুঝে না।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, কাব্যে আমরা অধিকাংশ সময় প্রকৃতিকে একটা কল্পিতরূপে দেখিতেই বেশি ভালবাসি। অর্থাৎ...যাহা প্রকৃতির নিজস্ব রূপের সঙ্গে মেলে না।

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।

এই যে সন্ধ্যার চিত্র ইহা সন্ধ্যার ফোটোগ্রাফ নহে। ইহা কবির নিজের কল্পিত সন্ধ্যার একটি রূপ। কিন্তু তথাপি ইহাকে আমরা পুলকিত চিত্তে মানিয়া লইয়াছি। সন্ধ্যা, দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ মাত্র। কিন্তু কবি দেখিতেছেন প্রত্যক্ষত একটি নারী প্রদীপ হস্তে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন। প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে ইহার মিল কোথায়?...কিন্তু এরূপ ছবি আঁকিবার অধিকার শিল্পীর আছে। বস্তুত এই অধিকার আছে বলিয়াই শিল্পী শিল্পী।...কাব্যের রূপসৃষ্টি এবং চিত্রের রূপসৃষ্টি একই শিল্পীমনের বিভিন্ন প্রকাশ।...একজনকে বলিব সৃষ্টি কর, আর অন্যজনকে বলিব নকল কর তাহা হইতে

পারে না। চিত্রশিল্পের বেলায় অজ্ঞতা ও গোঁড়ামি দর্শককে এমন কঠিনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া শিল্পকে শিল্প বলিয়া সে চিনিতে পারিতেছে না।...

শিল্পপরিচয়ের প্রথমভাগের ভাষায় লেখা। এমন লেখা তখন দরকার ছিল। এবং এর ১৮ বছর পরে যুগান্তরে (১৯৫২) যখন রবীন্দ্রশিল্প প্রসঙ্গে নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি তখনও এই কথাই অন্য ভাষায় লিখেছিলাম, কিন্তু তার বিস্তার ছিল অনেক বেশি। (পরে ম্যাজিক লণ্ঠন (১৯৬২) নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ব্যক্তিগত পাল্টা আক্রমণ সম্ভব হয়নি কখনো। তাঁর মন ছিল উদার এবং বিনীত। মহত্তের কাছে তিনি ছিলেন চির শ্রদ্ধানত। বেদনা পেলেও তার ঊর্ধ্বে উঠে যাবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। এবং আমার মনে হয় তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি বলতে পেরেছেন গ্লানিহীন মুক্ত মন নিয়ে—মানবতার পূজারীরূপে :

—হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে কেহ রাতে, বসন্তে শ্রাবণবরিষণে।
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।—

শত্রুমিত্র সকল মানুষের মধ্যে তিনি তাঁর দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন

যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।—

এমন মানুষকে আঘাত দেওয়া নিম্নরুচির পরিচয় ছাড়া আর কি বলা যায়?

(বৈশাখ ১৩৭১)

॥ ছয় ॥

চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের বন্ধুদের দু'টি তালিকা দিয়েছিলাম, মৃত ও জীবিত। বলেছিলাম লেখাটি ছাপা হতে হতে জীবিত তালিকা থেকে আরো কোনো নাম মৃতের তালিকায় স্থান পেলে বিস্ময়ের কিছু নেই। একটি নাম আগেই গেল। সরোজকুমার রায়চৌধুরী গত ২৯শে মার্চ ১৯৭২ মারা গেল। কিন্তু আরো একটি নাম আমার অজ্ঞানতা বশত জীবিতের তালিকায় স্থান পেয়েছে। হরিপদ রায়ের নাম। শোনা গেল তিনি গত ফেব্রুয়ারি অথবা তার আগে মারা গেছেন। তারিখের খবর আজও জানি না।

হরিপদ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯২১ সন থেকে। বিশ্বভারতীর আরম্ভকালে তিনি ও আমি প্রায় একই সঙ্গে সেখানে ভর্তি হই, এবং এক ঘরেই থাকি। তিনি কলাভবনের ছাত্র, আমিও তাই। উপরন্তু তিনি গান গাইতে পারতেন। তিনি শিল্পীর বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গশ্রী যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তিনি তার মলাটের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। শনিবারের চিঠিতে তিনি অনেক কার্টুন ছবি এঁকেছেন। আমার সেখানে যোগ দেবার আগে থেকেই তিনি সেখানে ছবি আঁকতেন। তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে চিঠি লেখা চলত, শেষ চিঠি পেয়েছি ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭০ তারিখে। সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যিক প্রীতিতে তাঁর চরিত্র ছিল মধুর।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর মৃত্যু হ'ল অকালে। এর কথা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। আমার স্মৃতিচিত্রণে উল্লেখ আছে। বিচিত্র জীবন সরোজের। দেশ মুর্শিদাবাদের মালিহাটি, জন্ম গিরিডি ১৯০৩। হাজারিবাগ থেকে ১৯১৮ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে বহরমপুর কলেজে ১৯২০ পর্যন্ত পড়ে, তারপর ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলেজ ত্যাগ করে। একবার ব্যবসা আরম্ভ করেছিল পাটের কেঁসোর (waste jute)। সিলকের ব্যবসাও করে। এই উপলক্ষে নাগপুর, মেদিনীপুর এবং পাটনায় বাস। পাটনায় সচ্চিদানন্দ মহম্মদ পাল নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং দর্জির কাজ করতে ইচ্ছুক হয়। কাজ শিখতে কলকাতায় আগমন।

তারপর সাসারামে কিছুকাল শিক্ষকতা। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ১৯২৭ সনে গ্র্যাজুয়েট হয়। এখানে শিক্ষক ছিলেন কিরণশঙ্কর রায় ও সুভাষচন্দ্র বসু। সরোজ যখন নবশক্তির সম্পাদক তখন আমি সে কাগজে অনেক লিখেছি, সে কথা আরো একবার স্মরণ করছি তার সৌজন্যের আনন্দ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। এই কাগজের সম্পাদনকালে সে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের এক কবিতা ছেপে গ্রেফতার হয়েছিল। আনন্দবাজারে সে অনেক দিন সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেছে। পরে সে বর্তমান নামক মাসিক চালায়। আমি সে কাগজে গল্প লিখেছি—সে ১৯৫০ সনের কথা।

আমার সম্পাদনা জীবনের সঙ্গে কিরণকুমার রায় ও সরোজকুমার রায়-চৌধুরী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। শনিবারের চিঠিতে প্রবেশের আগে কিরণ উপাসনাতে এবং সরোজ নবশক্তিতে আমাকে স্থান দিয়েছে। নবশক্তি আমার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এনেছিল।

শনিবারের চিঠি যাদের বিরোধিতা করেছে তারা নিশ্চিত শক্তিশালী লেখক। দলাদলি এখন অর্থহীন বোধ হয়। কিন্তু মনে হয় একথাও সত্য যে, বিরোধিতা ছিল বলে বিরোধী শক্তিশালী লেখকেরা অন্তত আত্মরক্ষার জন্যও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন, এবং পরম উৎসাহের সঙ্গে আপন আপন আদর্শ অনুসরণ করে চলেছিলেন এবং লেখকধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। কল্লোল কালিকলমকে কেন্দ্র করে সত্যিই একদল লেখক সৃষ্টি হয়েছে এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যাকে কল্লোল যুগ বলেছেন তা সার্থকনামা যুগ বলেই আমি মনে করি। কল্লোল যুগের কথা মনে এলেই প্রথমে মনে পড়ে দীনেশরঞ্জন দাশের কথা। এমন মানুষ সংসারে খুব বেশি নেই, যে মানুষ পরিচয় মাত্র বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যেতে পারেন। এমন মধুর চরিত্র, এমন নিরহংকার এবং বন্ধুবৎসল মানুষকে ভোলা সহজ নয়। আবার এ কথাও সত্য, এঁরা মানুষরূপে যে স্মৃতি যে চিহ্ন বন্ধুদের মনে এঁকে যান, বন্ধুরা সে স্মৃতি বহন করে মাত্র, তারপর তাদের সঙ্গেই সব ফুরিয়ে যায়। বংশ বংশ ধরে এ স্মৃতি রেখে যাওয়া যায় না, এ যে কি জিনিস তা আর এক যুগের মানুষ উপলব্ধি করবে কেমন করে? এই হচ্ছে মানুষের জীবনের সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য একই সঙ্গে। সংসারে এমন কত মানুষের স্মৃতি যে হারিয়ে গেছে! [illegible] তাঁরা সমকালের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে

গেছেন তারও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে, নইলে সংসার নিতান্তই অরণ্য মনে হত। দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯২৮ কিংবা ২৯ সনে। আমি কল্লোলে দুটি গল্প লিখেছি সাক্ষাৎ আলাপের পূর্বেই। যতদূর মনে পড়ে, গিরিজা মুখুজ্জে আমার গল্প বহন করেছিলেন। আমি প্রথম লেখা থেকেই কোনো মাসিক বা সাপ্তাহিকে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য কখনো অযাচিত ভাবে লেখা পাঠাইনি। তার কারণ সম্ভবত এই যে, আমার লেখা যে আদৌ প্রকাশযোগ্য এ কথা আমি বিশ্বাস করিনি। এখনো আমি বিশ্বাস করি, আমি সাহিত্যের এলাকা থেকে দূরে আছি। সে জন্য অল্প ক'জন শুভার্থী যাঁরা আমার লেখা পছন্দ করেছেন এবং লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের সবাই আমার মন জুড়ে আছেন।

দলের কথা বলছিলাম। আমি কল্লোলে লিখেছি। সেই আমি শনিবারের চিঠির দলের। আবার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ আর প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোল দলের, কিন্তু দুজনেই সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্গশ্রী মাসিকের লেখক। অবশ্য আমার আমলে প্রেমেনের একটি লেখাই বেরিয়েছিল। কবিতা সেটি। আবার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ছায়া সাপ্তাহিকে আমি লিখেছি। কবি প্রণব রায় কল্লোল দলের, অথচ তাঁর সম্পাদিত নাগরিক কাগজে লিখেছি। পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় কল্লোল দলের, তাঁর সম্পাদিত মাসিকপত্র নামক মাসিকে আমি লিখেছি। এবং নাগরিক অফিসে অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে ১৯৩৪ সনে বাগাটেল খেলেছি। তবে আর দল কোথায়? আমার সময়ে 'কোটারি' বলতে যা বোঝায় তা আর ছিল না। প্রেমেন্দ্র সম্পর্কে তার আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবার কথা বলতে হবে। সে কল্লোল দলের অথচ শনিবারের চিঠিতে এক কবিতা লিখেছিল বেনামী। আমার সে সময়ের শনিবারের চিঠিতে কবিতার পাশে লেখকের নাম আমি লিখে রেখেছিলাম, তাই সহজে পাওয়া গেল। সে কবিতার কথা পরে বলছি।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কল্লোল দলের লেখকেরা যাঁরা বঙ্গশ্রীতে এসে ভিড় করেছিলেন, শৈলজা, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রমুখ, প্রেমেনকে সে দলে আমি কম দেখেছি। কিরণ যখন উপাসনায় ছিল (যে উপাসনা পরে বঙ্গশ্রী হয়েছিল) তখন প্রেমেন সেখানে নিয়মিত আসত। কারণ

কিরণ ছিল তার বন্ধু। প্রেমেন ভাই অনিয়মিত দলের।

বঙ্গশ্রীতে একবার (১৩৩৩) পূজা সংখ্যার জন্য গল্প কাদের কাছ থেকে নেওয়া হবে, প্রায় সব গল্পলেখকই সেখানে উপস্থিত, অথচ সবার গল্প একসঙ্গে ছাপা অসম্ভব। শেষে এক চমকপ্রদ ব্যবস্থা হল। সবাই এক পৃষ্ঠা করে গল্প লিখবেন, মিনিয়েচার গল্প। এখনকার ভাষায় মিনি। গল্প তো সংগ্রহ হল, (অবশ্য দলের বাইরের গল্পও আছে এতে) কিন্তু কার গল্প আগে, কার গল্প পরে দেওয়া হবে, সে হল এক সমস্যা। সে সমস্যা সমাধানও হল সহজে, গল্পের নাম বর্ণানুক্রমে ছাপার প্রস্তাবে। আমাদের কয়েক জনের কানে একথা আসাতে অ-আদ্য নাম দিলাম আমাদের গল্পের। অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর গল্পের নাম বদল করে রাখলেন 'অ'। আমাদের গল্পের নাম এই রকম: অকস্মাৎ (মনোজ বসু), অকারণ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যো), অদ্বিতীয়া (বনফুল), অনুকম্পা (পরিমল গোস্বামী), অমনোনীত কবিতা (সরোজকুমার রায়-চৌধুরী)। —অ এই পর্যন্তই। পরবর্তী আরম্ভ অনেক দূরের ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে। যথা: পুষি (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়), মৃত্যুর পরে (কৃষ্ণধন দে), শনি-কবচ (প্রেমেন্দ্র মিত্র), সধবা (সীতা দেবী) সাপ্তাহিক (বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়), হাতে হাতে ফল (শিবরাম চক্রবর্তী)। অনেকেই এক পৃষ্ঠায় আবদ্ধ থাকেননি। আড়াই পৃষ্ঠা পর্যন্ত কেউ কেউ গেছেন।

প্রেমেন্দ্রের যে কবিতাটি আমি শ. চিঠিতে ছেপেছিলাম সেটি একটি ব্যঙ্গ কবিতা, নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। তিক্ত স্বাদের। সিনিক-এর লেখা। মোহ-ভঙ্গজনিত ধিক্কার। কিন্তু কাকে? সমস্ত দুনিয়াকে। পৃথিবী জ্ঞানের ভারে মুমূর্ষু, হজম করতে পারছে না আর, অতএব

> ...জীবনের দুধের বাটিতে দাও দখল
> টকে যাক সব ধর্ম, আর সমাজ,
> নীতি আর আদর্শ,
> সব হোক টোকো দই,
> সেই দই মরে বানাও ঘোল।...

সমগ্র কবিতায় বদহজমের লক্ষণসমূহে বেশ মিল আছে, মনে হয় লেখাটি কোনো ডাক্তারের অথবা কোনো অভিজ্ঞ রুগীর। কবিতায় দারুণ নিরাশা

কিন্তু তবু নিরাশার বোতলের কর্কটা সম্পূর্ণ শক্ত করে আঁটা নয়, কয়েকটি শর্ত পূরণ হলেই কর্ক খুলবে, পৃথিবীতে আবার আনন্দ ফুটে উঠবে, শুধু শর্তগুলি যা কঠিন। ভূমিকার উপর এতখানি বিতৃষ্ণা ফুটেছিল কবিমনের কোন্ মুহূর্তে তা বোঝা যায় না, প্রেমেন নিজেও হয়তো বলতে পারবে না। তবে ব্যাধিবর্ণনায় প্রেমেন চিকিৎসকদের চেয়ে বেশি নিপুণ বরাবর।

সজনীকান্ত নানা দিকে ভাগ্য পরীক্ষা করে অবশেষে শনিবারের চিঠিকে আঁকড়ে ধরতে মনস্থ করলেন। তাঁর বেকার অবস্থায় ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শনিবারের চিঠির মলাটে বাঁয়ের দিকে লেখা হল পরিচালক শ্রীসজনী-কান্ত দাস, ডান দিকে সম্পাদক শ্রীপরিমল গোস্বামী। ১৯৩৫ জানুয়ারি পর্যন্ত (পাঁচ মাস) মলাটে ছিল—সম্পাদক : শ্রীপরিমল গোস্বামী, সহকারী সম্পাদক : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি এই ফেব্রুয়ারি মাসে একটি নিবেদন লিখলাম এইভাবে—

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস পুনরায় শনিবারের চিঠির পরিচালনাভার গ্রহণ করিলেন। গত দুই বৎসর চিঠির সম্পূর্ণ ভার আমার একার উপর পড়ায় আমাকে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল সজনীবাবু পুনরায় ইহাতে যোগদান করায় সেই সব অসুবিধা দূর হইল। এখন হইতে 'চিঠি' যাহাতে সকল বিষয়ে চিত্তাকর্ষক হয়, আমরা সেজন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

শনিবারের চিঠির পরিচালনা অফিসের নূতন ঠিকানা হইয়াছে। টাকাকড়ি এবং গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠি—দাস এণ্ড কোং, বি-৩ ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (ভিক্টোরিয়া হাউসের নিকট) কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সম্পাদকীয় অফিস ২৫।২ মোহনবাগান রো, ঠিকানাতেই রহিল।

পরিমল গোস্বামী

(নিখিলচন্দ্র দাস ও সজনীকান্ত দাস, দাস অ্যাণ্ড কোং নামে ভাগে ব্যবসা খুলেছিলেন, এ লেখার তৃতীয় অধ্যায়ে তার পুরো বিবরণ আছে।)

উন্নতির প্রতিশ্রুতি যা ঐ নিবেদনে দেওয়া হল, তার কিছুই হয়নি, যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগল। ১৯৩৬ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত (অর্থাৎ পরিচালক সজনীকান্ত ছাপা হবার পর ঠিক এক বছর) ঐভাবেই চলল। এই ১৯৩৬ মার্চ পর্যন্ত বই আমার কাছে আছে, তারপর বাঁধানো না থাকাতে সবই প্রায় হারিয়ে গেছে, তাই ঠিক বলতে পারছি না। আমার নাম আরো কয় মাস সম্পাদকরূপে ছাপা হয়েছিল। তবে জুন পর্যন্ত

আমি সম্পাদক ছিলাম, এই রকম মনে পড়ে। মোটের উপর আমি সাড়ে তিন বছরের কিছু বেশি ছিলাম।

নলিনীকান্তের পক্ষে শনিবারের চিঠিকে আশ্রয় করা তখন অবশ্যম্ভাবী ছিল। নিখিলবাবুর সঙ্গে একত্র কাজ করলে (পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী) আমার এখনো বিশ্বাস, অনেক উন্নতি করতে পারতেন, কিন্তু প্রেস কেনার পর থেকে আর সে কথা বলা চলে না। প্রেসের সম্পূর্ণ ভার তাঁকে নিতেই হল।

'সেনোলা' নামক গ্রামোফোন ও রেকর্ড ইত্যাদি তৈরির প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পুস্তিকা লেখার ভার ছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের উপর। নৃপেনকে, যতদূর মনে পড়ে, রেডিওতে কাজ নেবার পর সেখান থেকে চলে যেতে হয়। ১-৭-৩৬ তারিখে আমাকে সেই স্থানে ওরা সবাই মিলে বসিয়ে দিল। এতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের হাত ছিল প্রায় ষোলআনি।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আরো এক ব্যবস্থা করল এই সঙ্গে। মনোমোহন ঘোষ 'চিত্রগুপ্ত' নামে স্টেজ অ্যাণ্ড স্ক্রীন সমালোচনা করত প্রতি সপ্তাহে। সে ছেড়ে দেওয়াতে সেই পদটি দখল করলাম আমি ৫-৭-৩৬ থেকে মাসিক কন্‌ট্রাক্টে। আমার নাম হল 'স্পেক্টেটর'—বীরেন্দ্রকৃষ্ণের দেওয়া নাম। ১৯৩৬-এর জুলাই থেকে ১৯৪১-এর কিছুদিন পর্যন্ত প্রতি রবিবার স্টেজ অ্যাণ্ড স্ক্রীন সমালোচনা চালাতে লাগলাম। পরে বিস্তারিত বলব এ সময়ের কথা।

এদিকে রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখি সেখানে বেশ একটি আসর। উমাপদ ভট্টাচার্য এম-এ সুরকার, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি-এল সুরকার ও প্রধান উপদেষ্টা। তিনি রেডিওতেও সঙ্গীত বিভাগে প্রধান। রেকর্ডিং-এর আসরে আরো দেখা গেল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, মন্মথ রায়কে, ও কবি অজয় ভট্টাচার্যকে। তা ছাড়া সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্ত ও নিতাই ঘটককে। এখানে প্রথম পরিচয় হল কবি অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে, হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের সঙ্গে। সন্তোষ সেনগুপ্ত তখন সেনোলা রেকর্ডের গায়ক।

নতুন পরিবেশ। তবে অধিকাংশই পরিচিত। রেকর্ডের জন্য নাটক লিখতেন মন্মথ রায়, গান লিখত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, অজয় ভট্টাচার্য ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত আমাকেও এ কাজ করতে হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানা রেকর্ডনাট্য এখানে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকদের মধ্যে আর ডেকে-ছিলাম আশু দে ও বনফুলকে। আশু দে'র কমিক-কথনের একটি রেকর্ড করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর হাসাবার অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করতে অন্তত আধঘণ্টার বিস্তার দরকার। সাড়ে তিন মিনিট+সাড়ে তিন মিনিট, সাত মিনিট মোট এবং মাঝখানে বিরাম (দুটি সাইডের জন্য)—এতে তিনি ঠিক জমাতে পারলেন না।

বনফুল-এর শালা কবিতাটিও রেকর্ড করা হল। দুটিই ১৯৩৭ সনে। কবির নিজের কণ্ঠের আরত্তি এযুগে হলে খুব আদর হত, এবং শিক্ষিত মহলে ঐ কবিতাটিও উপভোগ্য বোধ হত। কিন্তু তখন যে সমাজে রেকর্ড বেশি বিক্রি হলে প্রস্তুতকারকের টাকা খরচ সার্থক হত, সে সমাজে এ জাতীয় ব্যঙ্গ কবিতার ব্যাপক চলন স্বভাবতই হতে পারে না।

আমি দুটি রেকর্ডিং-এই এইচ-এম-ভি স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলাম। অনেকবারই সেখানে যেতে হয়েছে, শরদিন্দুর জন্য এবং আমার নিজের অনেক রচনা রেকর্ডিং-এর জন্য। বনফুলের শালা কবিতাটি যখন রেকর্ডিং হয়, তখন আমার মনে পড়া উচিত ছিল যে, ঐ সঙ্গে শরদিন্দুর কণ্ঠে তার শালী কবিতাটিও আবৃত্তি করিয়ে দুটিতে একত্র করে একটি সেট করলে বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই বাড়ত। শালা ও শালীর সেট। আমি দুটি থেকেই কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি :

সামান্য মনুষ্য নহ
    নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা
হে শ্যালক, হে স্বভাবশালা।
বঙ্গদেশে বহুবেশে বহুবার
    দেখেছি তোমারে
রচিয়াছি তব জয়মালা।

*

অপরিচয়ের মাঝে থাকো তুমি
    অশ্যালক বেশে
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালামূর্তি
    বাহিরায় এসে।

যখন সম্পাদক ছিলাম

আত্মবন্ধু পরিজন কাছে গিয়ে
দেখি হায় শেষে
শালা, সব শালা।
দিন যায় ক্রমে দেখি
শালা সাগরেতে এসে মেশে
দুনিয়ার যত নদী নালা…
হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা।

দীর্ঘ কবিতার প্রথম ও শেষ স্তবক মাত্র দেওয়া গেল। শালী কবিতার অংশ উদ্ধৃত করার আগে শালা বিষয়ে একটি ঘটনা মনে এলো। আমি তখন ভাগলপুরে। মাসটি সম্ভবত ফেব্রুয়ারি (১৯৩৫)। বলাই তার ল্যাবরেটরিতে বসে সবে কবিতাটির রচনা শেষ করেছে। সেখানে উপস্থিত আছেন ভাগলপুরের আর এক বন্ধু ডাক্তার ক্ষিতীন সেন। তিনি বলাইয়ের লেখার খুব অনুরাগী ছিলেন। বলাই ঝোঁকের মাথায় 'আত্মবন্ধু পরিজন'—ইত্যাদির স্থলে বাবা কাকা ইত্যাদি লিখেছিল, আক্রমণে নিজেদের বাদ দিতে চায়নি। তা ছাড়া এখানে নিজেদের অর্থে ব্যক্তিগত কাউকে ভেবে সে লেখেনি। কিন্তু তবু ওটা শুনতে নিষ্ঠুর লেগেছিল তাঁর কানে, যদিও কবিতার সুরের সঙ্গে তার অসঙ্গতি ছিল না। আমার কাছেও অসঙ্গত মনে হয়নি, কারণ বলাইয়ের চরিত্রের সঙ্গে এটা সঙ্গত ছিল। কিন্তু ক্ষিতীনবাবু অনুরোধ জানালেন, 'ঐ কথাগুলো বাদ দিয়ে দিন, বলাইবাবু।' বলাই তাঁর অনুরাগী বন্ধুর অনুরোধে ঐ কথাগুলো বাদ দিয়ে 'আত্মবন্ধু পরিজন' বসিয়েছিল। ওতে কঠোরতা বা নিষ্ঠুরতাটা আর রইল না।

শালা পাঠাতেই শরদিন্দু'র প্রেরণা জাগল শালী লিখতে। অংশত উদ্ধৃত করছি—(বৈশাখ, ১৩৪২)

নহ প্রৌঢ়া নহ বৃদ্ধা নহ শিশু নহ নাবালিকা
হে তরুণী রূপসী শ্যালিকা।
ওষ্ঠে যবে আলতা দিয়া ভালে পর খয়েরের টিপ,
চাহিয়া তোমার পানে বুক মোর করে ঢিপ ঢিপ।
মনে হয় কেন আমি হলাম না
দিল্লী-বাদশাহ,
অথবা কুলীন পুত্র…
গুটিসুদ্ধ করিয়া বিবাহ

জীবন নির্বাহ

কবিতাম মহানন্দে কুসুমে কুসুমে
পরিমল চুমে ।...
আদম বাবার যুগে ছিলে তুমি ঈভ সহোদরা,
তারপর যুগে যুগে যত বীর শাসিল এ ধরা—
টুটেনখামেন, মনু, হাম্মুরাবি, আরো লক্ষ শত
আটিলা চেঙ্গিজ খান্ মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত
তব নেত্রাহত
পড়ে ছিল পদপ্রান্তে দন্ত নিকাশিয়া
রভসে ভাসিয়া ।
অভাগার কল্পলোকে মূর্তিমতী স্বর্গ-নাগরিকা
তুমি লীলা ললিতা শ্যালিকা ।
বঞ্চিতের লালাস্রোতে ধৌত তব তনুর তনিমা
লোভার্তের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা
হে ছলনাময়ী, তব উচ্ছল পিচ্ছল রসধারা
পথিকের পদতলে কদলী চর্মের চেয়ে বাড়া...
কে বহিবে খাড়া ?
অখিল পুরুষবর্গ পড়ে অকস্মাৎ
হয়ে চিৎপাত ।..

শালা ও শালী দুই বিপরীত চিত্র, আমাদের মনের দুই বিপরীত কল্পনা। পুরুষদের দৃষ্টিতে শালা যে কেন গাল দেবার ভাষা হয়ে দাঁড়াল, তা নিতান্তই দুর্বোধ্য এবং দুর্ভাগ্যও। (এবং বিশেষ ক্ষেত্রে শালীও তাই।) কিন্তু হয়েছে যখন তখন বনফুল তার ষোল আনা সুযোগ নিয়ে জীবনের ষোল দিকে যত শালা আছে, অর্থাৎ ভণ্ড ও প্রতারক আছে, তাদের উপর ছন্দোবদ্ধ আক্রমণ চালিয়েছে। বলছিলাম, শালা ও শালী এই দুইয়ের যুগ্ম আবৃত্তিতে সুন্দর এক সেট রেকর্ড করার সুযোগ চলে গেছে। তা ছাড়া এ যুগে আর তা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ শালা আবৃত্তির জন্য বনফুল জীবিত আছে, কিন্তু শালী আবৃত্তির জন্য শরদিন্দুকে পাওয়া যাবে না। ছন্দের সমস্ত মাধুর্য ঠিক রেখে সরসতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তির মতো লোক এ যুগে বিরল হয়ে এসেছে। রেডিওতে অদ্ভুত যে রকম নমুনা শুনছি তাতে আর আশা করার মতো বিশেষ কিছু নেই। হয়তো যাঁরা আবৃত্তিতে প্রকৃত পটু তাঁদের কণ্ঠ এখনো সেখানে পৌঁছয়নি।

গাঁর বাজনা অভিনয় প্রভৃতির পরিবেশে নতুন পাওয়া বন্ধুদের সঙ্গ বেশ ভালই লাগল। আমার এই একই সঙ্গে পার্সটিন প্লেসের বাড়িতেও অনেকটা এই রকম পরিবেশ। সকালে সিনেমা দেখা ও সপ্তাহান্তে সে বিষয়ে বলাও ভালই লাগল। মঞ্চ ও পর্দা—থিয়েটার ও সিনেমা নতুন কোনোটাই বাদ পড়ল না। প্রতি রবিবারে পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গীত শিক্ষার আসর শেষ হওয়ামাত্র আমার কথিকা আরম্ভ হত।

ক্যামেরা ছিল আমার নেশা, সেজন্য ওটা প্রায় সব সময়েই ঘাড়েতে ঝোলানো থাকত। শেষে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, এখানকার সব ফোটো তুমিই তুলে দাও বেতার জগতের মলাটে ও ইণ্ডিয়ান লিসেনারের মলাটে ছাপার জন্য। প্রস্তাবটা খুব পছন্দসই হল। আর এই কারণে আমি এমন সব ব্যক্তির ছবি এখানে বসে তুলেছি, যাঁদের ছবি অন্যত্র পাওয়া এখন দুর্লভ। বেতার জগতের তখন সম্পাদক ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার।

এ কাজ ছিল আমার স্বতঃপ্রবৃত্ত। রেডিওর কোনো আদেশ পালনের জন্য নয়। সব রকম অবস্থায় নিয়মিত ছবি তুললে ক্রমে অভিজ্ঞতা বাড়ে। তা ছাড়া এ কাজে আমার বরাবর একটা মত্ততা ছিল দূর ১৯১৮ থেকে। যার জন্য ক্যামেরা নিয়ে পথে পথে, গ্রামাঞ্চলে, নদীর ধারে ধারে, ঘুরে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন। রেডিওতে যেদিন বাধ্যবাধকতার কথা উঠল, সেই দিন থেকে ওখানে ছবি তোলা ছেড়ে দিয়েছি।

অন্যের রুচিতে যে আমি ছবি তুলতে পছন্দ করি না, তার একটি ভাল দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আগেই বলেছি এ জিনিষ আমার মানসিক গঠনের সঙ্গে খাপ খায় না। ১৯৩৯ সনে, যতদূর মনে পড়ে, বিখ্যাত ইমপ্রেসারিও হরেন ঘোষ আমার কাছে এসে প্রস্তাব পেশ করলেন—সেরাইকেল্লার রাজার বাড়িতে অনেক নাচের ছবি তুলতে হবে, অনেক টাকা তাঁরা দেবেন। ইতিমধ্যে আমার চিত্রধর্মী ফোটোগ্রাফ অমল হোম ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী অতি উচ্চশ্রেণীর মুদ্রণে প্রকাশ করে আমাকে পিকটোরিয়ালিস্ট রূপে পাঠক সমাজে কিছু পরিচিত করিয়েছেন।

আমি হরেনবাবুকে বললাম, টাকার জন্য তোলা মানে তাঁদের পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করা। সে আমার দ্বারা হবে না। যদি গ্যারাণ্টি দিতে পারেন আমি যা তুলব তাই গ্রাহ্য হবে, তা হলে বিবেচনা করতে

পারি। হরেনবাবু বললেন, রাজমেজাজ, তিনি হয়তো তাঁর পছন্দমাফিক তোলাতে চাইবেন। আমি বললাম, তবে আমি এর মধ্যে নেই। আমার কাছে তিনি দু'দিন এসেছিলেন।

আমার ফোটোগ্রাফ যে গুণীজনও পছন্দ করতেন, তা জানতাম, পরেও জেনেছি। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন, যিনি রাজশেখর বসুর গড্ডলিকা, কজ্জলী প্রভৃতি পুস্তকে ছবি এঁকে গল্পগুলিকে অধিকতর আকর্ষক করেছিলেন, আমাকে (১৯৬০ সনের ২২শে জানুয়ারি, ৭২ বকুলবাগান রোডে) আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তিনি ১৯৩২ সনে সচিত্র ভারতে প্রকাশিত আমার একটি পদ্ম ফুলের ফোটোগ্রাফ কেটে রেখেছেন, তাঁর খুব ভাল লেগেছিল বলে। আমি যা ভুলে গিয়েছি তা কবে তাঁর মনে একটুখানি আনন্দ জাগিয়েছিল এবং এতদিনেও তা মনে রেখেছেন শুনে নতুন করে আনন্দ পেয়েছিলাম সেদিন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার তোলা তাঁর ছবি পছন্দ করেছিলেন। এবং আরো ছবি চেয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ছবি অবনীন্দ্রনাথ খুব পছন্দ করেছিলেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তাঁর ছবি দেখে এক প্রশস্তিপত্র লিখেছিলেন। এই ভাবে বহু গুণীজনের খুশিতে আমার মূল্য আমি পেয়েছি, তাই টাকার বিনিময়ে আমার আনন্দ হরণ করতে দিতে আমি সঙ্কুচিত হয়েছি।

রেডিওতে ফোটোগ্রাফ তোলা ছিল আমার স্বাধীন ইচ্ছাধীন। তবে এই উপলক্ষে আমি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। মনোমোহন ঘোষের কথা আগে বলেছি। সে ছিল 'চিত্রগুপ্ত', চিত্রসমালোচক, তার স্থলে আমি হয়েছি স্পেকটেটর, বলেছি আগে। মনোমোহন প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট। তার সঙ্গে গেলাম একদিন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে। মনোমোহন গিয়েছিল তাঁর বাণী রেকর্ড করাতে। তিনি বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ অধঃপতনের কথা বললেন। বেতার জগতে ছাপার জন্য মাইক্রোফোনে ভাষণরত প্রফুল্লচন্দ্রের ছবি তোলা হলে আমি পৃথক ছবি দু'তিনখানি তুললাম। সেক্সপীয়রের নাটক পাঠরত অবস্থায় তাঁকে বসিয়ে যে ছবিখানি তুলেছিলাম তা নানাস্থানে ছাপা হয়েছে। (এই ছবির তারিখ নিয়ে একটি ভুল ছাপা দেখলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রফুল্লচন্দ্র রায় শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে। সেই ছবির সঙ্গে ও সূচীপত্রে, ১৯১৬ সন লেখা আছে। কিন্তু এ

সময়ে আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের এবং ক্যামেরা প্রথম কিনেছি ১৯১:তে।)

মনোমোহন ঘোষ বাংলাদেশে পাঁচ শতাধিক, কাজেই এর নামের সঙ্গে চিত্রগুপ্ত ব্র্যাকেটে লিখতে হত। কিন্তু 'চিত্রগুপ্ত' ছদ্মনামধারীও অন্য দু' একজন লেখককে পাওয়া গেছে। রেডিও-খ্যাত চিত্রগুপ্ত মনোমোহন ঘোষ বহুমুখী বিদ্যাধর। আবৃত্তিতে নিপুণ। নাটকে অভিনয় এবং নিজে প্রচার-বিমুখ হয়েও অন্যের প্রচার কাজে, প্লাজা, উত্তরা ও শ্রী সিনেমার ম্যানেজার হয়ে কাজ করা, নানা মীডিয়ামে ছবি আঁকা, গ্রামোফোন রেকর্ডের লাইব্রেরিয়ানের কাজ করা, বছর ছয়েক প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাজ করা, রেডিওতে প্রাচ্য কলা বিষয়ে নিয়মিত বলা, নৃত্যকলা, রঙ্গমঞ্চ সিনেমার সমালোচনা কাজে তার কৃতিত্ব ছিল। এ ছাড়া সপ্তাহে একবার বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ ব্রডকাস্ট করা, এবং সর্বশেষ বি-এ পাস করা। এমন নিরহঙ্কার এবং সকল প্রকার দ্বন্দ্ববিরোধী অমায়িক মানুষটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি দুইই ছিল। এখনও আছে।

আমি যখন রেডিওর তরফ থেকে সিনেমা দেখতাম সপ্তাহে তিন দিন সকালে, সে সময় আমার মেট্রোর ফ্রী পাস ছিল। লাইটহাউস, নিউ এম্পায়ার, প্লাজার স্থায়ী পাস ছিল না, প্রতি সপ্তাহে ডাকে কার্ড আসত ওঁদের কাছ থেকে। ওঁদের নিয়ম ছিল Admit two। আমার একা যাওয়া ভাল লাগত না। কিছু দিন অনাদি দস্তিদারকে পেয়েছিলাম সঙ্গীরূপে, তারপর অনেক দিন সঙ্গী ছিল মনোমোহন। মনোমোহন সিনেমা সমালোচনা অনেক দিন করে সিনেমা-addict হয়েছিল। আর আমি যখন এ কাজ ছাড়লাম (যুদ্ধের জন্য নিয়মিত সমালোচনা বন্ধ হয়েছিল) তখন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, আসক্তি এলো না। ১৯৪১ সনেও অনিয়মিত সমালোচনা করেছি। এ সময় রেডিওতে আমরা তিনজন নাটক ও সিনেমা সমালোচনা করেছি অনিয়মিত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী ও আমি। আমি ১৯৫৩ সনেও দু'একবার সিনেমা সমালোচনা করেছি। ১৯৩৬ থেকে অদ্যাবধি আমি এই প্রায় ৩৬ বছরে সমালোচনার বাইরে, এবং পুরস্কারের জন্য বিচারকমণ্ডলীভুক্ত হয়ে (১৯৬৬) যা দেখেছি তার বাইরে তিন চারটি ছবি দেখেছি, এর মধ্যে চার্লি চ্যাপলিনের লাইম-

লাইট ও গোল্ডেন বাথ (পুনর্দর্শন) আছে। বাংলা একটি দেখেছি—কাবুলিওয়ালা, খুব ছেলেমি ব্যাপার মনে হয়েছে এটাকে।

আমার চিত্র বা মঞ্চ সমালোচনা কয়েকজন গুণী ব্যক্তি পছন্দ করতেন। পাহাড়ী সান্যাল আমাকে কয়েকবার বলেছিলেন, তাঁর ভাল লাগে। অমর মল্লিকও একথা বলেছেন আমাকে। সিনেমার শিল্পীদের মধ্যে ইন্দু মুখোপাধ্যায় আমাকে এ কথা বলেছিলেন। নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র শিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁর পরিচয় নাটকের সমালোচনা শুনেছিলেন, এবং আমার বিশ্লেষণ পছন্দ করেছিলেন। ১৯৩৮ বা ৩৯ সনে আমার কাছে কোনো একটি ছবির রেডিও সমালোচনার পূর্বে, ছবির তরফ থেকে একজন এসে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, 'আমরা তো প্রচার কাজে অনেক খরচ করি, আমাদের এই ছবিখানা যাতে একটু প্রচার হয় তা দেখবেন, আমরা এর জন্য কিছু খরচ করতে রাজি আছি।' আমি বললাম, ছবি যদি খারাপ লাগে তবে খারাপ বলব, ভাল লাগলে ভাল বলব, তার জন্য টাকা দিতে হবে না। প্রস্তাবকারী হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

সে ছবি অবশ্য খুবই খারাপ লেগেছিল এবং কোনোমতেই তাকে প্রশংসা করতে পারিনি। আমার সে সব আলোচনার কপি রাখিনি। অন্তত ৩০০ দিন এ কাজ করেছি, কিন্তু তিন চারটি সমালোচনার কপি পাওয়া গেছে সম্প্রতি। আমি দু'চার লাইন করে তা থেকে উদ্ধৃত করছি—আমি গত ৩৬ বছর থেকে ২০ বছর আগে পর্যন্ত, কি ধরনের বলতাম এ থেকে তার আভাস পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি আলোচনাই ছিল ১৫ মিনিটের।

১১-৪-৩৭ তারিখে দিদি সম্পর্কে আরম্ভ করেছিলাম :

আমি গত সপ্তাহে দিদি (নিউ থিয়েটার্স) সম্বন্ধে সামান্য কিছু ভূমিকা করেছিলাম, আজ বিস্তারিত আলোচনা করছি। নিউ থিয়েটার্সের পূর্বে প্রকাশিত ছবিগুলির চেয়ে দিদি যে উজ্জ্বলতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশী ছবির প্রধান দোষ, গল্পে সামঞ্জস্য এবং পরিমিতির অভাব। দিদি গল্পের সামঞ্জস্যে ত্রুটি আছে, কিন্তু পরিমিতির দিক থেকে নিন্দার কিছু নেই। এখানে পরিমাণ জ্ঞানকেই আমি পরিমিতি বলছি। চরিত্রগুলি নিজ নিজ সীমা ছাড়িয়ে বিপথে যায়নি, কিন্তু শেষের দিকে গতি একটু দ্রুত হয়ে পড়েছে।... ভাল অভিনয়, উচ্চাঙ্গের টেকনীক, ফোটোগ্রাফি এবং শব্দব্যঞ্জনা, যদি ভাল গল্পের সঙ্গে যুক্ত হয় তা হলেই তা সমগ্রভাবে সার্থক হয়। এরা পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে, একটার অভাবে অন্যটার উৎকর্ষের কোনো মূল্য থাকে না।...

এর সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষামূলক ছবির কথাও কিছু আছে।

…আমি ইতিপূর্বে একবার এডুকেশনাল ফিল্ম, যেমন ইতিহাস, ভূগোল, বা বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি—এই ধরনের ছবি আমাদের দেশে তৈরি হওয়া উচিত। বিদেশী ট্রাভেল টক আমরা অনেক দেখি অথচ ভারতবর্ষের মতো এত বড় দেশে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী ছবিতে দেখানো যেতে পারে। আমাদের স্টুডিওর ছবি…এখনো বিদেশে দেখাবার মতো হয়নি, কিন্তু ভ্রমণকাহিনী উপলক্ষে ছবি তৈরি করলে তা বিদেশে চালান দেওয়া যেতে পারে…জীবনী চিত্র আমাদের তৈরি হওয়া উচিত…।

৩২ বছর আগে এ সব বলেছি। এখন তা ঘটছে সিনেমায়।

এর পরবর্তী ১৩ বছরের মধ্যকার কোনো কপি আমার কাছে নেই। অতএব ১৯৫০ থেকে যে দু'চারটির কপি আছে তা থেকে কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি: এটি বৈকুণ্ঠের উইল বিষয়ে।

২-৩-৫০। উপন্যাসে কাহিনী বর্ণনার একটি বিশিষ্ট নীতি বা ভঙ্গি আছে। উপন্যাসের আবহাওয়া রচনার জন্য লেখক এমন কতকগুলো উপাদান বেছে নেন কথার সাহায্যে আমাদের কল্পনায় যার একটা সম্পূর্ণ ছবি তৈরি হয়ে যায়। লেখকের রচনার সঙ্গে পাঠকের মনের যোগাযোগ এমন একটা আশ্চর্য কৌশলে ঘটে, যে কৌশল লেখকের আয়ত্ত না থাকলে পাঠকের মনে পূর্ণ ছবি ফোটে না। লিখিত কাহিনীতে যে সব মানুষ থাকে তাদের আমরা দেখি না, তারা যে কথা বলে তা ধ্বনিত নয়, যে আবহাওয়া থাকে তাও আমাদের চোখে অদৃশ্য। অথচ কোন্ মন্ত্রবলে তা আমাদের মনের চোখে সত্য এবং প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু সিনেমার রীতি পৃথক। এখানে সবই প্রত্যক্ষ এবং সঙ্গীত বা কথা ধ্বনিত। তাই এর প্রকাশরীতি অন্য রকম হতে বাধ্য। এখানে লিখিত কাহিনীর উপাদানকে নতুন অর একটা ছাঁচে ঢালা দরকার।…বৈকুণ্ঠের উইলে তা হয়নি।. এখানে যে সব দৃশ্য দেখলাম, পল্লী সমাজ ফুটিয়ে তুলতে যে সব লোকজন দেখলাম, তারা সর্বত্রই প্রায় এক। একই ভঙ্গিতে মুখ নাড়া, হাত নাড়া, একই ভঙ্গিতে কথা বলা। তাই সব আছে তবু তারা বাস্তব হয়ে ওঠেনি। গল্প-বিচ্ছিন্ন একটা অংশমাত্র গল্প নয়, অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে সমগ্র গল্প ব্যর্থ। যে সব চরিত্র এতে আছে তারা এত বেশি কথা বলেছে যে, তা ঘটনাকে ছাড়িয়ে গেছে। সামান্য একটি কথায় যা স্পষ্ট হয়, সেখানে দশটা কথা দেওয়া মানে সিনেমার নিজস্ব রীতিকে অমান্য করা।…

সিনেমা সমালোচনায় আমি যা বলেছি সবই সহানুভূতির সঙ্গে, কিন্তু যে ত্রুটি এক একটা গল্পকে নষ্ট করে দিয়েছে তা স্পষ্ট ভাবে বলা এবং

সংশোধন: পূর্ব পৃষ্ঠার শেষ প্যারার উপরে যে তারিখ ছাপা হয়েছে সেটিকে ১১-৪-৩৭ পড়তে হবে।

বুঝিয়ে বলার রীতি অনুসরণ করেছি সব সময়। তবু যে সব অংশ উদ্ধৃত করছি তা বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়লে মনে হবে সমালোচনা কঠোর হয়েছে। আসলে তা নয়। অবশ্য কঠোরতা অনেক ক্ষেত্রে দরকার হয়েছে, তা আমার সমালোচনার প্রতিটি ভূমিকাংশে বিশ্লেষণ করেছি বিস্তারিত ভাবে। আরো কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি। (অর্থাৎ এই সময়ের যে দু'একটি কপি আছে তার।)

৩-৫-৫১ (গাঁয়ের মেয়ে)···যেখানে বাস্তব জীবনের কাহিনী বলতে গিয়ে ঘটনা সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে, সেখানেই কাহিনী অসঙ্গত হয়ে ওঠে।.. তাই গল্প অনেক সময় প্রায় রূপকথায় পরিণত হচ্ছে। এ ঘটনা রূপকথার পক্ষে অসম্মানজনক। ···ভাষায় কাহিনী লেখা হয়, তা অনেক সময় চিত্রিত করা হয় নানা ছবি দিয়ে। কিন্তু ছাপা গল্পাংশ বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু এই ছবিগুলি দেখি, তাহলে অবশ্যই গল্পের সমগ্র আমরা দেখি না। এই রকম ত্রুটি 'গাঁয়ের মেয়ে' ছবিতে।···

তারিখ ঐ:

পরিত্রাণ ছবিখানা বিশেষ আলোচনার যোগ্য। কারণ এতে শক্তির প্রকাশ আছে। তবে এর প্রাথমিক ত্রুটি ঘটেছে নায়কের পরিচয় পর্বে। তাকে একই সঙ্গে গায়ক এবং চিত্রশিল্পী করার মধ্যে কোনো সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না, যদিও গল্পের অনেক-খানি ঐ দুটি বিদ্যাই কাহিনীর অঙ্গরূপে দেখানো হয়েছে। এতে অসুবিধা হয়েছে এই যে, তাকে চিত্রশিল্পীরূপে সম্পূর্ণ ফোটানো হয়নি, গায়করূপেও না। চিত্রশিল্পী রূপে তার যে পরিচয় তাতে আঙ্গিকের ত্রুটি আছে। শিল্পীর পিছনে আলো, সামনে ক্যানভাস, আলোর দিকে তার পিঠ, এটি অসঙ্গত হয়েছে, এবং সে যখন স্পষ্টতই অয়েল-কালারে ছবি আঁকছে, তখন তার পক্ষে ছবি ধোয়ার জন্য জল চাওয়া কি ঠিক হয়েছে?···কিন্তু এ গল্পের এই সব ত্রুটি ঢেকে দিয়েছে এ গল্পের নায়িকা। এ ছবির বারো আনা ভাল অংশের সঙ্গে একটা ছায়া অনুসরণ করলেও শ্রীমতী শিপ্রার সফল অভিনয় মনকে শেষ পর্যন্ত গল্পের দিকে টেনে রাখে।

১০৯ ধারা (সমালোচনার তারিখ লেখা নেই কপিতে)

১০৯ ধারা গল্পটি তৈরি করার সময় চিত্রনির্মাতার উদ্দেশ্য ছিল এটিকে একটি মর্মস্পর্শী ট্র্যাজিডি করতে হবে, তাই একেবারে গোড়া থেকেই ট্র্যাজিডির সুর খুব উঁচু পর্দায় বাঁধা হয়েছে। ফলে দুঃখ ভোগ, কান্না এবং মৃত্যুর সাহায্যে ছবির বারো আনা অংশ অধিকার করানো হয়েছে। ···পুত্রের জন্য মায়ের যে বেদনা তা তো স্বাভাবিক ভাবেই দর্শক নিচ্ছে, তবু তাকে অস্বাভাবিক করার কি দরকার ছিল? তার কান্নার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, নানা রকম ক্লোজ-আপ, চলতে চলতে কান্না, পথে গড়িয়ে গড়িয়ে কান্না, এই সব কান্নার সৌন্দর্য এত দীর্ঘকাল ধরে দেখানো হয়েছে যাতে ট্র্যাজিডি আর ট্র্যাজিডি নেই।...

৪-১২-৫২ (কবি চন্দ্রাবতী)···বহু নারকল গাছ শোভিত নদীর দৃশ্যে গল্পটি সুরু করা হয়েছে। কিন্তু মৈমনসিংহের নিসর্গদৃশ্য এটি নয়। প্রথমেই পটভূমি অবাস্তব।···নৌকোয় যাতায়াত এই কাহিনীর একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু নৌকো চালনার রীতি এতে অমান্য করা হয়েছে। চন্দ্রাবতীর প্রণয়ী যে নৌকো ব্যবহার করেছে তাতে পাল আছে একটি। পাল ও রকমভাবে ব্যবহার হয় না। এবং নৌকো ঘাটে দীর্ঘকাল বাঁধা থাকলে পাল গুটিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু এই নৌকোয় পাল কখনো গুটিয়ে রাখা হয়নি। তা ছাড়া নৌকো যখন চলে তখন ঝড়ের আভাসমাত্র দেখলেই পাল তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলা রীতি। কিন্তু এ ছবিতে মারাত্মক ঝড়ের মধ্যে, বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে, পাল নামানো হয়নি। বরং যাতে ওটা খাড়া থাকে এবং নৌকোটা যাতে ডোবে তার চেষ্টা করা হয়েছে প্রাণপণ।···

৫-২-৭৩ (সাড়ে চুয়াত্তর)···হাস্যরস সৃষ্টিতে বাস্তব জীবনের উপর অনেকখানি রং চড়াতে হয়। হয় চেপে বেঁটে করতে হয়, আর না হয় টেনে লম্বা করতে হয়। কিন্তু দু'দিকেই একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত।·· হাস্যরস যিনি সৃষ্টি করবেন, তিনি তাঁর হাতের চরিত্রগুলিকে বেপরোয়াভাবে ছেড়ে দিতে পারেন না, আর্ট সৃষ্টির রীতি অনুযায়ী ই চরিত্রগুলিকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করবেন। . মনে হয়েছে যেন চরিত্রগুলি হাস্যরস সৃষ্টি করবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে, হাত-পা-মাথা বেশি নেড়েছে, চীৎকার করেছে আরো বেশি, তারা এ বিষয়ে একটু বেশি মাত্রায় সচেতন।···

কিছু টুকরো নমুনা স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া গেল সে দিনের সমালোচনার, যদিও এই বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে সমগ্রের চেহারা পাওয়া যাবে না।

শুনেছি এখন সিনেমার উৎকর্ষ অনেক বেড়েছে, ১৯৬৬ সনে পুরস্কারের জন্য বিচারকমণ্ডলীর একজন হয়ে যে কটা দেখেছি, তার মধ্যে একটিমাত্র ছবি গল্পের দিক দিয়ে আমার কাছে অনেকটা সম্পূর্ণ মনে হয়েছিল—বাক্স বদল। তারপরে আর দেখিনি, তবে অনেকবার রেডিওতে সমালোচনা শুনেছি, সমালোচনার মান উচ্চ মনে হয়েছে সব সময়েই।

(জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯)

॥ সাত ॥

১৯৩৬ সনে একদিকে রেডিওর কনট্রাক্ট প্রোগ্রাম (স্টেজ অ্যাণ্ড স্ক্রীন), অন্য দিকে সেনোলা স্টুডিওতে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে মিলে রিহার্সালে উপস্থিত থেকে রেকর্ডনাট্য ইত্যাদির কাহিনী ও অভিনয়বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, যাতে পরিচয়-পুস্তিকায় এই সব নাটক বা গান সম্পর্কে যথার্থ বিবরণ লেখা সহজ হয়। আবার আর এক দিকে সচিত্র ভারত নামক সাপ্তাহিকে প্রায় নিয়মিত লেখা, সজনীকান্ত দাসের ব্যবস্থায়। তিনি তখন সচিত্র ভারতের সম্পাদনাভার পেয়েছিলেন, যদিও তাঁর নাম সম্পাদক হিসাবে ছাপা থাকত না। সচিত্র ভারত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে অবস্থিত আর্ট প্রেস থেকে ছাপা হত। মালিক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সার রাজেন্দ্রনাথের ভাই)। শুনেছিলাম ইনিই প্রথম বাঙালী, বিমানে বিলেত গিয়েছিলেন।

সচিত্র ভারতে ১৯৩৬-৩৭ প্রায় নিয়মিত গল্প বা প্রবন্ধ লিখেছি—গল্পই বেশি। এগুলির মধ্যে মতিলালের খেলা নামক একটি গল্প একটু ভিন্ন ধরনের ছিল। ট্রেনের ভিতরের একটি ঘটনা। যাত্রী কয়েকজন সার্কাস বিষয়ে আলাপ করছিল। অদ্ভুত সব খেলার গল্প। একটি বিড়ি ফোঁকা লোক এদের বিস্ময়কর এক-একটা খেলার কথা শোনে আর বলে ওতে অবাক হবার কি আছে, অথবা ওতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যারা গল্প বলছিল, তাদের একজন ওকে (ওর নাম মতিলাল) ক্রমে বানিয়ে বানিয়ে অসম্ভব সব খেলার কথা বলতে লাগল, মতিলালও ক্রমাগত ওদের দমিয়ে দিয়ে বলতে লাগল মতিলালের কাছে ওসব কিছুই না। মতিলালকে জব্দ করার জন্য আরো একটা গল্প বলা হল। একটি লোক ইচ্ছামাত্র মরে যেতে পারে এবং ইচ্ছামাত্র বেঁচে উঠতে পারে, কিন্তু মতিলাল দমে না। ওরা শেষে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, তুমি তো দেখছি সবই পার, কেউটে সাপের বিষ খেতে পার ? মতিলাল সহজভাবেই বলল, সেটাও পারি।

ওরা চ্যালেঞ্জ করে বসল মতিলালকে। বলল, শুধু মুখে বললে হবে না, করে দেখাতে হবে।

গল্পে আছে, ব্যবস্থাটা আমার বাড়িতেই করেছিলাম এবং মতিলালকে আমার বাড়িতে এনে রেখেছিলাম পরদিন যাতে প্রতিদ্বন্দ্বীরা এসে তার পরাজয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে পারে। আমারও ইচ্ছাটা ছিল তাই। তা ছাড়া একটি গল্প রচনা হবে এতে, সেটাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু কারো কোনো উদ্দেশ্যই পূরণ হল না। মতিলাল যা যা বলেছিল সবই সাফল্যের সঙ্গে করে দেখাল। দর্শকেরা শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে আমাকে বিদ্রূপ করে চলে গেল।

জনতা বিদায় হলে আমি বললাম, মতিলাল আমার গল্পটা মাটি করলে তুমি। মতিলাল বুঝতে পারল না আমার কথা। বললাম, তুমি জব্দ হবে এটাই আমরা সবাই আশা করেছিলাম। আর তা হলে ওরাও খুশি হত, আমার গল্পটাও জমত। তুমি যা চাইলে তাই ঘটল—এ আমরা সহ্য করি কি করে।

মতিলাল সব বুঝতে পেরে বলল, গল্প যাক, আমার সম্মান বাঁচল সেটা ভাবছেন না কেন?— (স. ভারত, ১৩।১১।৩৭)

গল্পটার প্লটটি মনে এসেছিল এই ভেবে যে, কোনো গল্পের নায়ক যা ইচ্ছা করে তাই যদি ঘটে, যা বলে তাই যদি করতে পারে যা চায় তাই যদি পায়, তা হলে গল্প জমানো কঠিন। আঘাত আসবে, বাধা আসবে, তবে তো তা আমাদের ভাল লাগবে। রূপকথার গল্পেও ঘটনা অবাধ চলে না, চললে ছোটরাও তা পছন্দ করত না। অবশ্য এর আর একটা দিকও আছে। সব প্রত্যাশা উলটে গিয়ে যে গল্প রচিত হল, সেও গল্পের নিয়মেই হল।

১৯৩৮ সনে আমাকেই সচিত্র ভারতের সম্পাদক হতে হবে তা কল্পনা করিনি। কেন, কোন্ উপলক্ষে আমাকে সেখানে ডাকা হয়েছিল তা এখন কিছুই মনে পড়ে না। সজনীকান্ত ছাড়লেন কেন, তাও কিছুই মনে নেই। তবে আমি এ সময় তিনটি কাজ করছি। সেনোলায় প্রচার পুস্তিকা লেখার কাজ, রেডিওতে সাপ্তাহিক সিনেমা ও থিয়েটার সমালোচনা ও সচিত্র ভারতের সম্পাদনা। এই সচিত্র ভারত অফিসেই যাদুকর পি সি সরকারের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। তা ছাড়া কারটুন শিল্পী প্রমথ সমাদ্দারও এখানকার কর্মী ছিলেন। অরবিন্দ দত্ত ও পি-সি-এলও ছবি আঁকতেন

এখানে। প্রথমে প্রবোধ সমাদ্দার এম-এ'র নাম সম্পাদকরূপে ছাপা হত, আমি যাবার কিছু পরে আমার নাম ছাপা হতে লাগল।

আট বা নয় মাস এখানে আমি ছিলাম। লেখকদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), বনফুল, আশালতা সিংহ, হাসিরাশি দেবী, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। ফোটোগ্রাফ ছাপা হত অজস্র।

সচিত্র ভারতের অনুকরণে এর একটি হিন্দি সংস্করণ ছিল। সেটি সম্পাদন করতেন ধন্যকুমার জৈন। বেশ হাসিখুশি মানুষ। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি বিশাল ভারতেও ছিলেন। এই হিন্দি সংস্করণের জন্যই এই ধন্যকুমারের একটি অবিমৃষ্যকারিতায় ভীষণ এক কাণ্ড ঘটে গেল। অবশ্য মূল দোষ আমার। আমি খাপছাড়া নামক একটি ফীচার লিখতাম, সংবাদ নিয়ে টিপ্পনি। একটি সংবাদের টিপ্পনিতে এক সম্প্রদায়ের (মুসলমানের নয়) ধর্মে আঘাত লেগে বসল। বাংলা টিপ্পনির জন্য নয়, ধন্যকুমার আমার সমস্ত টিপ্পনিই হিন্দি করতেন, এবং সেই হিন্দি পাঠক যে প্রদেশের সেই প্রদেশ থেকে নির্দেশ পেয়ে বহু ছোরাধারী আর্ট প্রেস আক্রমণ করে বসল। নরেনবাবু লালবাজারে টেলিফোন করে পুলিস আনিয়ে তবে সমস্যাটার সমাধান হল। আর তার ফলে পরবর্তী এক সংখ্যায় একটি ক্ষমাপ্রার্থনার প্যারাগ্রাফ ছেপে ৫০ কপি সচিত্র ভারত তাদের দিতে হল। কি যে ঘটনা, তা বলবার উপায় নেই, বললে আবার গণ্ডগোল হবে।

যতদূর মনে হয় এই ঘটনা উপলক্ষেই সচিত্র ভারতের রূপান্তর ঘটেছিল। সজনীকান্ত আবার সম্পাদকীয় লিখতে লাগলেন ১৩৩৯ থেকে। কিন্তু তিনিও এমন এক কাণ্ড করে বসলেন যে, তাঁকেও ঐ রকম ক্ষমা চাইতে হল। এবং এবারের ক্ষমা চাওয়া হল আরো অপমানকর। তখন যুদ্ধ চলছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরী রেডিওতে যুদ্ধ বিষয়ে সমালোচনা প্রচার করতেন। নীরদবাবু মিত্রপক্ষের জয়লাভের সপক্ষে যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করতেন। আমিও করতাম। সজনীকান্ত এঁরই কোনো কথিকা নিয়ে বিদ্রূপ করে এমন কথা লিখেছিলেন, যাতে মনে হয় নীরদবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতেই পারে না।

সজনীবাবুর এটি অবিমৃষ্যকারিতা। তখন যুদ্ধের দরুন দেশে জরুরি অবস্থা চলছে, এমন সময় যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যঙ্গ করা তাঁর ঠিক হয়নি।

নীরদবাবু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং সরকারী চাপ পড়ল সচিত্র ভারতের উপর। প্রেস বাজেয়াপ্ত হতে পারে এমন ভয় দেখা দিল। অবশেষে সজনীবাবুকে ক্ষমা প্রার্থনা লিখতে হল। লিখতে হল নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রতি বিদ্বেষ বশত, আমি তাঁকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বেচ্ছায় এ কাজ করেছি।—ঠিক এভাবে না লিখলে তাঁর অপরাধ খণ্ডিত হত না। উকিলের পরামর্শ অনুযায়ীই এই রকম ভাষায় লিখতে হয়েছিল।

এই ক্ষমাপ্রার্থনা ছাপা হওয়ার কথা জানতাম না। একদিন বালিগঞ্জ থেকে ফেরার পথে এসপ্ল্যানেডে নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা, হাতে এক গাদা সচিত্র ভারত। সচিত্র ভারত তখন আকারে ছোট হয়েছে। নীরদবাবু বেজায় উল্লসিত। আমাকে ডেকে একখানা কাগজ আমাকে দিয়ে বললেন, দেখুন দেখুন কি কাণ্ড! যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা সাহিত্যের সীমানায় এখন আর না আনাই ভাল। সেটি Canis Minorএর ব্যাপার।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে গেল। কোনো একটা হোটেলে একজন আই-বি অফিসারের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। আমাকে তিনি বললেন, আপনি যেমন মাসিক পত্রাদিতে গল্প লেখেন এবং সেখান্ থেকে টাকা পান, তেমনি লিখবেন, শুধু যুদ্ধের ব্যাপারে মিত্রপক্ষের জয় হবে এমন একটা ইঙ্গিত দেবেন এবং তার জন্য এমন সব ঘটনা ঘটাবেন যাতে মনে না হয় এটা প্রচার। আপনি তো বিশ্বাস করেন মিত্রপক্ষ জিতবে। এবং সেই বিশ্বাস থেকেই লিখবেন। আমরা সেজন্য পৃথক টাকা দেব আপনাকে। প্রস্তাবটা আগাগোড়া মন দিয়ে শুনেছিলাম। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, সজনীকান্তের প্রেস বাজেয়াপ্ত করার কথা হচ্ছে, তিনি যেভাবে লিখছেন, তাতে বাজেয়াপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

আমি তাঁর ইচ্ছামতো গল্প লিখিনি। কারণ এর মধ্যে একটা গোপনীয়তা আছে, কিছু প্রতারণা আছে। আমি তখন যুদ্ধের ব্যাপারে নীরদবাবুর শিষ্য বলা চলে। যুদ্ধের গতি বিষয়ে তাঁর কাছে প্রায়ই যেতাম শুনতে, কারণ আমাকেও নিয়মিত রেডিওতে বলতে হত। সেজন্য গোপনে টাকা নেওয়ার প্রস্তাব আমার ভাল লাগেনি। যুদ্ধ বিষয়ে যা বলছি সব তো প্রকাশ্যেই বলছি, নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী বলছি, তবে আবার অন্য পথ

কেন? লেখার স্বাধীনতা না থাকলে তা আমার মনের সঙ্গে মেলে'না, অস্বস্তিকর বোধ হয়। অতএব লিখিনি'

এ পর্যন্ত লেখার পরে থামতে হল। আজই রাতে (২৩।৪।৭২) রেডিওতে সংবাদ শুনলাম শিল্পী যামিনী রায় মারা গেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের বৈঠকের যে তালিকা দিয়েছিলাম, তার দুটি ভাগ ছিল—মৃত ও জীবিত। পঞ্চম অধ্যায়ে জীবিতদের তালিকা থেকে ইতিমধ্যেই সরোজকুমার রায়-চৌধুরীর নাম মুছে গেছে। হরিপদ রায়ের নাম মুছে গেছে। এবারে যামিনী রায়ের নাম মুছে গেল। মৃতের তালিকায় নাম বাড়ছে। জীবিতের তালিকা থেকে নাম কমে যাচ্ছে। যামিনী রায়ের সান্নিধ্যে এসেছি অনেকবার। বঙ্গশ্রী গোষ্ঠীতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন গোড়া থেকেই। তাঁর ব্যবহারে উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাস দেখিনি। তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে কথা বলতেন। তাঁর পুত্র জীমূতবাহন অল্প বয়স থেকেই চিত্রশিল্পে পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিল। কিন্তু তার অকালমৃত্যু ও অত্যন্ত শোচনীয় মৃত্যুর বর্ণনা (দেহটিকে জঙ্গলে শেয়ালে-খাওয়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল)—যামিনীবাবুর কণ্ঠেই শুনেছি—উচ্ছ্বাসহীন শান্ত কণ্ঠের বর্ণনা। এতবড় মর্মান্তিক ঘটনাকে তিনি, মনে হয়েছিল, প্রশান্ত চিত্তে ভাগ্যের নির্মম দান-রূপেই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এই প্রশান্তির প্রতিফলন আছে তাঁর চিত্রে।

চিত্রাঙ্কন বিষয়ে তিনি প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যকে কিছু নতুন আকার দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্থানকালের চিহ্নের যতটা সম্ভব অতীত করে চিত্রকে ন্যূনতম রেখার সাহায্যে একটা ভাবমূর্তিতে ফুটিয়ে তোলা। এক দিনের কথা মনে আছে, বঙ্গশ্রী অফিসে আমরা বসে আছি। বঙ্গশ্রী ভাদ্র (১৩৪০) সংখ্যায় নন্দলাল বসুর আঁকা 'জন্মাষ্টমী' নামক ছবিটি রঙীন ছাপা হয়েছে। আমি ছবিটি তখন দেখছিলাম। যামিনীবাবু আগেই দেখেছেন। তিনি আমাকে ঐ ছবিতে যে ত্রুটি আছে সেই কথা বলছিলেন। তাঁর মতে বসুদেব যখন সদ্যোজাত কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দগৃহের দিকে রওনা হচ্ছেন, তখন তার পটভূমিতে কারাগারের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। যামিনীবাবুর মতে এটা ঠিক হয়নি। এতে স্থান ও কালের চিহ্ন পড়েছে। এ জাতীয় ছবিতে এ চিহ্ন থাকা উচিত নয়।

যখন সম্পাদক ছিলাম

এ বিষয়ে আমার নিজের মত পৃথক। আমি বলব না যে, নন্দলাল বসুর ও-রকম আঁকা উচিত হয়নি। বলব না, দেবীপ্রসাদ বা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বা গোপাল ঘোষ—এঁরা প্রত্যেকেপৃথক ভঙ্গিতে আঁকেন কেন। কেন আঁকেন তা শিল্পীরাই বলতে পারবেন। যামিনীবাবু কেন তাঁর জন্য বাংলা পটের ভঙ্গিটি বেছে নিয়েছিলেন, সে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। এই বৈচিত্র্য শিল্পীমনে আছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাধ্যম বেছে নেন আত্মপ্রকাশের জন্য। এবং এ ঘটনা এমনই স্বাভাবিক, অথচ এমনই দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী যে, এটি বুঝিয়ে বলার জন্য আমাকে পরে (১৯৫২) একটি বড় প্রবন্ধের ভূমিকাস্বরূপ অনেক কথাই বলতে হয়েছিল। বলেছিলাম এইভাবে :

> প্রত্যেক ছবিতেই শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়বে এবং সে ছবি অন্য কোনো ছবির সঙ্গে মিলবে না। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় এক একটা জাতির মধ্যে শিল্পরূপের এক একটা ভঙ্গি গড়ে ওঠে। জাতির চরিত্রের সঙ্গে তা মিলে যায়। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এতে চাপা পড়ে না, তবু মোটের উপর একটা মিল থাকে। একটা জাতির লোকের চেহারায় যেমন মিল থাকে, অথচ প্রত্যেকটি ব্যক্তিই স্বতন্ত্র। ·· কিন্তু ক্ষমতাবান শিল্পী যে ভঙ্গিতে নিজেকে বেশি প্রকাশ করতে পারেন বলে মনে করেন, সেটাই তাঁর সার্থক বাহন।··· শিল্পের কোনো রূপমাধ্যমই চরম বলে মানা উচিত নয়। জগতে চরম বা ultimate বা absolute কিছু আছে কিনা ধারণা করা শক্ত। ·· (১৯৫২)

আমার নিজের মতে যামিনীবাবুর শিল্প, প্যাটার্ন বা ডিজাইনের একটি চমৎকার রূপ অথবা রূপান্তর। ডিজাইন অনেকটা যান্ত্রিক। যা অল্প আয়াসে কপি করা যায়—এবং যত ইচ্ছা। এ রকম জ্যামিতিক কোনো কোনো ডিজাইনে যামিনীবাবু প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশুদ্ধ ডিজাইনে শুধু চোখের তৃপ্তি, সেই ডিজাইন প্রাণধর্মে স্পন্দিত হয়ে উঠলে তা হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু তবু এমন ছবিতেও ডিজাইনের ত্রুটি সম্পূর্ণ বর্জন করা যায় না। যে আর্ট উচ্চ সৃষ্টির স্তরে উঠে যায়, তার আর অনুকরণ হয় না, শিল্পী নিজে অস্তুত করতে পারেন না। যে জিনিসে শিল্পী প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন তার মধ্যে শিল্পীর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। বার বার একই স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে আমার দেখা গ্রাম্য পটুয়াদের একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমি ১৯৪৬ সনের নভেম্বর ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির নানা স্থানে ভ্রমণে গিয়েছিলাম

বন্ধুদের সঙ্গে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে বেরিয়ে দুদিন দুটি হাট দেখতে গিয়েছিলাম। একটি গৌরীর হাট, অন্যটি নতুন হাট।

ভ্রমণ শেষে প্রবাসী মাসিকে চার মাস ধরে আমার ভ্রমণ কথা বেরিয়েছিল। এই রচনায় গৌরীর হাটের বর্ণনায় এক স্থানে লিখেছি—

…আমরা মালাকরদের কাগজ ও শোলার উপর আঁকা ছবিগুলোব দিকে আকৃষ্ট হলাম। মনসাদেবী, কালীমূর্তি ও পূজারিণীদের ছবি তুলি ও রঙের সাহায্যে আঁকা। কালীমূর্তিতে অসাধারণ ক্ষমতার প্রকাশ পেয়েছে। পূজারিণীদেব ছবি সবই এক, কিন্তু পরপর অনেকগুলিতে বেশ একটা প্যাটার্ন। আমরা ইচ্ছে করলে এই প্যাটার্ন বইয়ের মলাটে বা অন্যত্র ব্যবহার করতে পারি।…

…এখানেও (নতুন হাটে) দেখলাম মালাকরদের কাগজ ও শোলাব উপর আঁকা দেবদেবীর ছবি বিক্রি হচ্ছে। আরও কিছু কিনলাম এখান থেকে। বহুকাল ধরে এরা একই ধরনের ছবি এঁকে আসছে, ছবির অর্থও এবা ভাল কবে জানে না, কিন্তু হাত এদের পাকা। বংশানুক্রমিকভাবে একই ভঙ্গিতে এঁকে এদেব এমন অভ্যাস হযে গেছে যে, আঁকবাব সময় একটুও ভাবতে হয না…অভ্যস্ত হাত দ্রুত চলিয়ে যেতে পারে। হাটে বসে বসেই কয়েকটি অর্ধসমাপ্ত ছবি শেষ করছিল দেখলাম। (প্রবাসী, ১৯৪৭; পথে পথে গ্রন্থে সঙ্কলিত, ১৯৫৫)

এ সমস্ত পটই আমি ভ্রমণ শেষে নমুনা সংগ্রহকারী সুভো ঠাকুরকে উপহার দিয়েছিলাম। এই ছবির ফোটোগ্রাফ প্রবাসীর রচনার সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। রচনায় বলেছি, চিত্রকর বংশ বংশ ধবে একই ছবি আঁকা অভ্যাস করেছে, এবং প্রত্যেকের হাতেই একই ছবি হচ্ছে, এবং ছবির অর্থ চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারিনি। কারণ যে ছেলেটি এঁকে যাচ্ছিল, সে এ সব কিছুই জানে না, অভ্যাসবশত শুধু আঁকতে পারে। যামিনী রায়ের ছবিরও এই রকম যান্ত্রিক অনুকরণ সম্ভব ছিল, এবং যদিও তা বাংলার পটশিল্পের ঐতিহ্যের বিরোধী নয়, তবু এই রীতির পুনঃপ্রচলন সব ক্ষেত্রে সার্থক নয়। কিন্তু যামিনী রায়ের শিল্পের সার্থকতার দিকের কথা আগেই বলেছি। তিনি ডিজাইনকে একটা পরিচ্ছন্ন রূপ দিয়ে তাতে বিশেষ করে তাঁর মাতৃমূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। ন্যূনতম রেখার সাহায্যে তিনি ভাবকে রূপ দিতে পেরেছিলেন, সেটাই তাঁর সম্পর্কে বড় কথা। যে প্রশান্ত ভাব তাঁর নিজের অন্তরে ছিল, তাঁর ছবিতে তিনি তা প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন। অন্য কথায় এই অর্থ ও ভঙ্গির মধ্যে তিনি তাঁর আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন। আনন্দ চাটুজ্জে লেনে তাঁর বাড়িতে তাঁর

সঙ্গে একাধিকবার মিলিত হয়েছি, এবং তিনি যে পূর্ব শিক্ষাজাত ফর্ম ও বর্ণবিন্যাসের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পাননি, তা আমাকে বার বার বলেছিলেন।

সচিত্র ভারত ছাড়ার পর ১৯৭৯ সনে ডাক পড়ল 'অলকা' নামক মাসিক সম্পাদনে। সজনীকান্ত দাসকে সম্পাদক করে এ কাগজ আরম্ভ হয়েছিল। তারপর তিনি বাদ পড়লেন কেন তা আমি কিছুই জানি না। অলকা মাসিক বার করেছিলেন সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ সরকার। শুনলাম প্রমথ চৌধুরী ও আমি দুজনে এতে থাকব (ছাপা হবে যুগ্ম সম্পাদক—প্রমথ চৌধুরী : পরিমল গোস্বামী)। এ এক চমকপ্রদ যোগাযোগ। শনিবারের চিঠির মধ্যযুগে শনিমণ্ডলের লেখকদের অনেকেই ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর একান্ত বিরোধী। আমি যখন ১৯৩২এর শেষে শনিবারের চিঠিতে যোগ দিই, তখন পূর্ব "শনিমণ্ডল" আর নেই, সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণও আর নেই। যাই হোক শনিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এটাই আমার পক্ষে অপরাধ মনে হলে আমার বলবার কিছুই ছিল না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে মিলতে গিয়ে দেখি তিনি আমাকে উদার স্নেহের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। আমার পূর্ব পরিচয় তাঁকে বলা হয়েছিল, কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করে আমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। কাগজের কাজেই প্রতি সপ্তাহে তাঁর কাছে যেতে হত পরে।

বেশি কথা বলতে তাঁর একটু অসুবিধা হলেও কথা চালিয়ে যেতেন উৎসাহের সঙ্গে। অনেক রকম গল্প করতেন। সে সব কথা আমি কিছু কিছু লিখেছি আমার পূর্ব স্মৃতিমূলক বইগুলিতে। সবুজপত্রের আমলে তাঁর সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল কতখানি সে কথা আমাকে বলেছিলেন। তিনি নতুন লেখকদের রচনায় চিন্তাক্ষমতার পরিচয় পেলে তাদের লেখা খুব যত্নের সঙ্গে সংশোধন ও পরিমার্জন করতেন এবং প্রয়োজনবোধে অনেক জায়গায় রচনার দুর্বলতা ঢেকে দিতেন নিজে স্বাধীন ভাবে তার উপরে কলম চালিয়ে। বলতেন, সম্পাদকের নানা বিষয়ে পড়াশোনা করা দরকার এবং প্রাপ্ত রচনাদি সংশোধনের বিদ্যা ও অধিকার থাকা দরকার। সব চেয়ে বড় কথা, নতুন লেখকদের প্রতি সহানুভূতি থাকা দরকার।

এই প্রসঙ্গে আর এক সম্পাদকের কথা মনে পড়ে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের কথা। অন্যের রচনা সংশোধনে তাঁর নাম ছিল এবং সব চেয়ে বড় কথা, তিনি সমস্ত জীবন নিজের লেখাই বহুবার এডিট করেছেন।

অন্যের লেখা ছাপার আগে সংশোধনের এক অদ্ভুত কাহিনী এই প্রসঙ্গে বলি। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আজ অনেকেরই অজ্ঞাত। ইনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। এঁর সঙ্গে আমার বন্ধু অতুলানন্দ চক্রবর্তীর (প্রথম অধ্যায়ে এর কথা বলেছি)—সম্পাদক-লেখক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সাময়িকভাবে। অতুলানন্দের ভাষাতেই সেই স্মরণীয় কাহিনীটি বলি। (অতুলানন্দ বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক ইংরেজী পত্রিকায় কাজ পেয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধীন) অতুলানন্দ সুরেন্দ্রনাথের কথা দিয়ে কাহিনী সুরু করছে, আমি মাঝখান থেকে উদ্ধৃত করছি :

তাহলে তুমি কাজ আরম্ভ কর। হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের অফিসে আমি বসি, আর আমাদের কাগজ ছাপা হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ধারে একটা প্রেসে। তোমার প্রধান কাজ হবে আমার আর প্রেসের মধ্যে খবরদারি করা। প্রেস বড়ই দেরি করে …খুব চেষ্টা করতে হবে তোমাকে যাতে প্রেসকে তাড়া দিয়ে, আর প্রেসের কাছে লেখা ও প্রবন্ধ ঠিকমত পৌঁছে দিয়ে সময়মত কাগজ বের করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া নিজে একটা-আধটা লিখতেও অভ্যাস করবে।

বিশ্বভারতীর কাগজের লেখা নিয়ে প্রেসে যাতায়াত সুরু করলাম। …যে সময়টা অফিসের বিরাম সেই সময়টা সুরেন ঠাকুরের কাছে যেতাম ছোটখাটো নিজের লেখা নিয়ে। অসীম ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে তিনি লেখাগুলি মাঝে মাঝে দেখতেন। সংশোধন ও লেখার চেহারা পরিবর্তন করে দিতেন। তাঁর এই সংশোধন প্রণালী অতি মোলায়েম। একটি লেখা নিয়ে কাগজখানির উপর নিজের কলমটি ধরলেন।

বাঃ বাঃ, দিব্যি আরম্ভ করেছ তো। বলেই, তারপর দু' আড়াই লাইন অতি অনায়াসে কেটে দিলেন, তার উপর দিয়ে নিজে একটু লিখলেন। বললেন, "এই রকম লিখলে তোমার ঐ আগেরটুকুর সঙ্গে মিল খাবে।" তারপরে একটু পড়লেন। "তোমার শব্দ বাছাই তো বেশ ভাল, কতক কতক শব্দ সত্যি বেশ চমৎকার"—এই বলেই আবার দুচারটে লাইন কাটলেন। "এই কথা কটি কিন্তু অমন জুতসই হয়নি।" আর একটু পড়লেন, "তোমার লেখার ধাঁচ তো বেশ। এ রকম লেখার অভ্যাস রাখবে।" বলতে না বলতেই পরের তিন চারটে লাইন কেটে দিলেন। "আচ্ছা এই কথাগুলো এইভাবে একটু সহজ করে লিখলে হয় না?" একবার আমার দিকে তাকালেন। তারপর নিজে খানিকটা লিখলেন।

এইভাবে আমার লেখার অন্তত দশ আনা তিনি কাটতেন, বড়জোর ছ' আনা আন্দাজ তিনি রাখতেন।…

যখন সম্পাদক ছিলাম

সম্পাদনায় এতখানি সহানুভূতি ধৈর্য ও আন্তরিকতা এঁদের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।

অলকা থেকে কয়েক মাস পরেই চলে আসতে হল। প্রমথ চৌধুরীও চলে এলেন। কেন, তা এখন আর মনে পড়ে না। মনে হয় ব্যবসা হিসাবে এর কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না, এবং যুদ্ধ ঘাড়ের উপরে এসে পড়েছে, এসব কারণে শখ মিটে গেল। আমার একমাত্র লাভ হল প্রমথ চৌধুরীর সান্নিধ্য লাভ। অলকা অফিসের আর একজন বন্ধু নাটোর রাজকুমার জয়ন্তনাথ রায় পরে (আমার স্মৃতিমূলক বইগুলি প্রকাশের পর) আমার লেখার অনুরক্ত হয়েছিলেন এবং আমার বইগুলি সবই কিনে পড়েছিলেন। (উল্লেখযোগ্য ব্যাপার!) এবং সে কথা তাঁর মুখেই শুনলাম যেদিন তিনি (১৯৬৫) আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে।

১৯৩৭ সনের দুটি ঘটনা এপ্রসঙ্গে বলা যাক। জানুয়ারি মাসে পাটনা প্রভাতী সঙ্ঘের আমন্ত্রণে কলকাতা থেকে আমরা চার জন গিয়েছিলাম পাটনায়। সেখানকার সাহিত্য অধিবেশনে নীরদচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন সভাপতি। তিনি তাঁর সভাপতির অভিভাষণ কলকাতা থেকে ছেপে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দুটি ছাপা গল্প পড়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন সংবাদপত্রের কয়েকটি সামাজিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা (সংবাদপত্রে সেকালের কথা) পাঠ করেছিলেন। আমি পাটনায় গিয়ে ছোট্ট একটি লিখন লিখে সন্ধ্যার আসরে পাঠ করেছিলাম। দ্বিতীয় দিন আমার একটি ছাপা ব্যঙ্গ গল্প পাঠ করেছিলাম।

আমি যে ভাষণটি ওখানে গিয়ে লিখেছিলাম, তার কপি যে কোথাও ছিল তা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। অল্প দিন হল হঠাৎ সেটি আবিষ্কার করেছি সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত শনিবারের চিঠিতে (ফাল্গুন ১৩৪৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭)। ঐ লেখাটি হঠাৎ পেয়ে সব মনে পড়ে গেল। আদৌ যে ছাপা হয়েছিল তাই মনে ছিল না। আমি এই ভাষণের অনেকখানি এখানে তুলে দিচ্ছি। এর নাম দেওয়া হয়েছিল সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। ভাষণটির অংশ বিশেষ এই:

আমি প্রথমেই একটি অবান্তর বিষয়ের আলোচনা করিতেছি, আপনারা আমাকে

সেজন্য ক্ষমা করিবেন। বাহির হইতে এখানে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদেরই একজন বহুদিন পূর্বে আমাকে একটি গল্প বলিয়াছিলেন। ইহা ঠিক গল্প নহে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

বন্ধু তখন বালক ছিলেন, তখন একবার তাঁহার পল্লীগ্রামের এক বাগানে যোজনগন্ধা ফুলের এক গাছ কোথা হইতে আনিয়া রোপন করা হইয়াছিল। গাছ, গাছের ধর্ম অনুসরণ করিয়া যখন বড় হইল এবং ফুল ফুটাইতে উদ্যত হইল, তখন আমার বন্ধু ফুলের সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মতো বালকের পক্ষে তখন যোজনগন্ধা নামটি এত বড় একটা বিস্ময় বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, ফুল ফুটিবার আগের রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। কখন ফুল ফুটিবে এবং তাহার গন্ধ এক যোজন দূর হইতে পাওয়া যাইবে—ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি বিছানায় নিদ্রাহীন চাঞ্চল্যে ছটফট করিতে লাগিলেন। রাত্রি যখন তিনটা তখন তিনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। কুঁড়ির অবস্থা দেখিয়া তিনি অনুমান করিয়াছিলেন শেষ রাত্রে ফুল ফুটিবে।

কিন্তু লোকের অনুমানও তাঁহার কানে আসিয়াছিল। বন্ধু বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চিম আকাশে চাঁদ তখন সমস্ত পরিমণ্ডলে স্বপ্ন সৃজন করিয়াছে—সেই অপরূপ আকাশের নিচে বন্ধু আসিয়া দাঁড়াইলেন যোজনগন্ধার কল্পিত গন্ধের আহ্বানে। প্রাণপণে তিনি একশত গজ দূরে ফুলের গন্ধ অনুভব করিবার জন্য সম্মুখে ঝুঁকিয়া নাকটি বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু কোথায় গন্ধ? তারপর একপা একপা করিয়া ফুলগাছের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিন চারি পা অগ্রসর হন, আর থামেন। থামিয়া গন্ধ লইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোথায় গন্ধ? এইভাবে প্রায় আধ ঘন্টা ধরিয়া তিনি ফুলের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই গন্ধ পাওয়া গেল না। ফুল হইতে যখন তিনি পনেরো হাত দূরে তখন প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া ফুলের দিকে নাকসুদ্ধ মাথা বাড়াইয়া ধরিলেন আর ক্লান্ত কুকুরের মতো শ্বাস টানিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় গন্ধ? …বন্ধুর আর ধৈর্য রহিল না। তিনি অত্যন্ত দ্রুত ছুটিয়া গেলেন ফুলের কাছে—গিয়া ফুল ছিঁড়িলেন, ছিঁড়িয়া নাকের মধ্যে প্রায় গুঁজিয়া দিলেন। তারপর এক বিকট উল্লাসে দুই হাতে ফুলটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন, শেষে গাছটাকে ছিঁড়িয়া গাছের জন্মস্থানে প্রলয় নাচ নাচিয়া ঘামিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সেই দিন হইতে যোজনগন্ধা সম্বন্ধে বন্ধুর যে মোহ ছিল তাহা দূর হইয়াছে।

যে কোনো সাহিত্য সম্মিলন সম্বন্ধেও আমার ঠিক এই ধরনের একটা মোহ ছিল এবং ঠিক ঐ বন্ধুর পন্থাতেই আমিও এককালে সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছি… কিন্তু অত্যন্ত নিকটে গিয়া দেখিয়াছি তাহাতে কোনো সৌরভ বা রহস্য নাই।…

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মত যাহাই হউক সাহিত্য সম্মিলনীর প্রয়োজন আছে। সাহিত্য যতদিন ব্যবসায়ের সামগ্রী না হইবে ততদিন ইহার প্রয়োজন থাকিবেই।

কাপড়ের ব্যবসায়ী বা ধানের ব্যবসায়ী এই ধরনের সম্মিলনী করে না। কারণ দরকার হয় না। কিন্তু আশার আলো দেখা যাইতেছে। আপনারা ততখানি অনুভব করেন কিনা জানি না, আমরা বড় শহরে থাকিয়া ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, সাহিত্য ব্যবসায়ের পথে ধীরভাবে চলিতে সুরু করিয়াছে। শেষ লক্ষ্য সিনেমা। শুধু সাহিত্য কেন, যে যার যাহা কিছু সম্বল আছে সবই চলিয়াছে সিনেমাকে লক্ষ্য করিয়া। গল্প লেখক, কবি, চিত্রকর, ইঞ্জিনীয়ার, রাসায়নিক, পদার্থবিদ, ব্যায়ামবীর, যাদুকর, গায়ক, সবাই আসিয়া ভিড় করিতেছে সিনেমা স্টুডিওতে।...একই সঙ্গে প্রায় হাজার জিনিসের টুকরা এত সস্তায় আর কোথাও পাওয়া যায় না। আর সেইজন্যই লোকে, অর্থাৎ আমরা, সিনেমাগতপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছি। সিনেমার শক্তি অতি প্রবল, ইহা নিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, করা উচিতও নয়। আমি এমন ছবি দেখিয়াছি যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক তত্ত্ব হইতে পকেট মারার দৃশ্য এবং এতদুভয়ের মধ্যে যতগুলি ক্রমপর্যায় আপনারা কল্পনা করিতে পারেন সবই আছে। রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, গোরুর গাড়ি, পালকি, নাচ, গান, ঝড়, নৌকাডুবি, মদ খাওয়া, লাম্পট্য, প্রেম, বিচ্ছেদ, মিলন, ফুটবল, পূর্ণিমার চাঁদ, সমুদ্র, পাহাড়, চাষ, মাছধরা, ডাকাতি, নারীহত্যা, খুন, বিচার, জেল, বন্দুক, গোয়েন্দা, পাহাড় হইতে পতন, ভিখারী, বাউল ইত্যাদি কত রকম বৈচিত্র্য যে আছে তাহার তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। এত জিনিস অথচ কত সস্তা। এই দলে সাহিত্যিকের একটা স্থান হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গোরাও এখন স্টেজে অভিনয় করিতেছে।...

এই ভাষণ পাঠকালে যোজনগন্ধা ফুল যে বন্ধু ছিঁড়েছিলেন, তিনি আমার পাশেই বসে ছিলেন। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম... বলেছিলাম ইনিই সেই বন্ধু। বন্ধুর নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। হাসির রোল উঠেছিল সভায়।

দ্বিতীয় ঘটনা ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বোটের মধ্যে বৈঠক। আমি অমল হোমের সঙ্গে সাহিত্য সভা থেকে পালিয়ে প্রথমে বোটে চলে আসি এবং কয়েকখানা ছবি তোলার পর ক্রমে অনেকেই এলেন সেই বোটের মধ্যে। আর এক সাহিত্য সভা বসল সেখানে। পাটনায় যা বলেছিলাম সিনেমা প্রসঙ্গে, তারই কিছু অংশ নিয়ে কবির সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। গোরা নাটক নিয়েই আমি কথা তুলেছিলাম। সেই নাটকের দর্শকরূপে রবীন্দ্রনাথের একখানা ফোটোগ্রাফ তুলেছিলাম কয়েকদিন আগে। ঐ নাটকে কে কেমন অভিনয় করেছিলেন সে কথাও তুলেছিলাম। সে সব কথা আমার পূর্ব স্মৃতিগ্রন্থে বলা আছে

বিস্তারিত ভাবে। এখানে শুধু একটি কথার পুনরাবৃত্তি করছি। আমি বললাম—যার যা কিছু কৃতিত্ব আছে সবই এখন থিয়েটারে সিনেমায় বিক্রি হচ্ছে। যেমন এই গোরা নাটকে একটা পুরো ব্যায়াম সমিতিকে এনে তাদের খেলা দেখানো হয়েছে। কবি মৃদু হেসে বললেন, বইতে হঠযোগের কথা থাকলে তাও দেখতে পেতে।

চন্দননগরের হরিহর শেঠের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করেছিলাম। প্রথম পরিচয়েই তিনি যে বিশেষ সদাশয় উদার প্রকৃতির সেই ছবিটি মনে জেগে আছে। তারপর অনেক উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে পত্র বিনিময় হয়েছে। তিনি তাঁর রচিত রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর (১৯৬১) নামক সুসম্পাদিত সঙ্কলন গ্রন্থখানিতে 'ফ্রনটিসপীস' রূপে মুদ্রণের জন্য চন্দননগরে আমার তোলা রবীন্দ্রনাথের একখানি ফোটোগ্রাফ আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি চন্দননগর সংক্রান্ত যাবতীয় রচনা (রবীন্দ্রনাথের রচনা সমেত) বা রচনাংশ এ বইতে সংকলন করেছেন। আমার একটি রচনার অংশ তিনি তাঁর এই বইতে এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন:

> নবপ্রকাশিত প্রবাসী ষষ্টি-ব র্ষিকী, গ্রন্থখানি দেখিতে কবিগুরু ও চন্দননগরের কথায় পূর্ণ শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী মহাশয়ের '২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭' প্রবন্ধটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহাতে এক স্থানে দেখিলাম···চন্দননগর কত দর্শনীয়-ভরা ফরাসীদের রাজত্ব। আমি শুধু জেনেছি, একটি বেল স্টেশন মাত্র। আর কিছু দেখিনি সেখানকার। তারপর দেখলাম হুগলী নদীর ঘাট, যে ঘাটে রবীন্দ্রনাথের হাউস বোট বাঁধা আছে। 'অধ্যাপক' গল্পের নায়ক চন্দননগরের যে ঘাটে তার শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল এবং যে শকুন্তলার তপোবন কুটিরটি গঙ্গার ধারেই ছিল, সেটি ঠিক কণ্বের কুটিরের মতো ছিল না। গঙ্গা থেকে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দায় উঠে গেছে। বারান্দাটি ঢালু কাঠের ছাদে ছায়াময়।

এরপর হরিহরবাবু লিখছেন—

> আমি ত সামান্য, চন্দননগরের এমন সন্তান কে আছেন, যিনি এইটুকু পাঠের পর 'অধ্যাপক' গল্পটি না পড়িয়া পারেন। আমি সন্ধান করিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডে গল্পটি পাইলাম।···

হরিহর শেঠের মৃত্যু ঘটেছে গত ১০ই মার্চ ১৯৭২, তাঁর স্বদেশ চন্দননগরে। তাঁর স্মৃতি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি।

আট

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছু আগে একখানা সিনেমা ছবির ডায়ালগ লেখায় সাহায্য করতে ডেকেছিলেন অমর মল্লিক। সে জন্য মাঝে-মাঝে নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিওতে যেতাম। একদিন সন্ধ্যায় কে একজন, ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করল এই রকম একখানা বিশেষ সংখ্যা খবরের কাগজ নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।

মনে দারুণ উত্তেজনা, সামনে বিরাট অনিশ্চয়তা। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য এবারে ধ্বংস হবে এমন একটা ভুল আশঙ্কায় মন পীড়িত হল। বাজার থেকে বহু বিদেশী জিনিস উধাও হল এবং মাটির নীচে ঢুকল। ভেবেছিলাম যা মজুত ছিল, তাতে না হয় প্রচুর মুনাফা করা যাবে, কিন্তু সব বিক্রি হয়ে গেলে তখন কি হবে? কিন্তু আমার সমস্ত অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হল। জিনিষপত্র বাজার থেকে সাময়িকভাবে অদৃশ্য হয়েছিল, কিন্তু বাইরের জিনিষ আসা বন্ধ হয়নি। অ্যামেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশের পথ খোলা ছিল। পরে শুধু অ্যামেরিকার। ইতিমধ্যে অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দূরের কথা, বোধ হয় পূর্বের অপেক্ষা দশগুণ বেশি লাভ করে রাতারাতি ধনী হয়ে উঠল। তারপর ব্যবসায়ীরা মন্বন্তর ঘটিয়ে, বহু লক্ষ বাঙালী বধ করে, কত কোটি টাকা মুনাফা করল তা আমার ধারণার বাইরে।

যুদ্ধ ঘোষণা হল, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হতে তখনো দেরি। নাম হল 'ফোনি ওঅর'—নকল যুদ্ধ। মিত্রপক্ষের সৈন্যরা 'ম্যাজিনো লাইন'-এর এধারে, ও জারমান সৈন্যেরা 'জিগফ্রিড লাইন'-এর ওধারে তৈরি হয়ে শুধু অপেক্ষাই করতে লাগল। সামরিক ভাষায় যাকে বলে marking time অনেকটা সেই অবস্থা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের প্রচার-কাজেই যে আমাকে অনেকখানি সময় দিতে হবে তা তখন ভাবতে পারিনি।

এই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ৩৬ দিন আগে, পাবনা অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৩০শে জুলাই (১৯৩৯) তারিখে আমার

সহপাঠী বন্ধু তৎকালীন পাবনার অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, লেখক, ফণীন্দ্রনাথ রায়ের আমন্ত্রণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি পাবনা গিয়ে পৌঁছলাম। এবং বিষম দুর্যোগের মধ্যে অনুষ্ঠানাদি শেষ করে সেই দুর্যোগের মধ্যেই ফিরে এসেছিলাম, মোটরে ঈশ্বরদি পৌঁছে, দারজিলিং মেলে। সকালের দিকে দুর্যোগ ছিল না। সকালে বিভূতিবাবু পাবনা শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম দেখতে চলে গেলেন সেখানকার শিষ্যদের সঙ্গে। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না নানা কারণে, যা উল্লেখ করাও অসম্ভব। আমাকে পাবনার বন্ধুরাই যেতে দিলেন না। বিভূতিবাবু এই আশ্রম পরিদর্শন বিষয়ে কোথাও কোনো ডায়রি লিখেছেন কিনা আমার চোখে পড়েনি। অথচ আমি জানি তিনি বেশ প্রফুল্ল মনেই ফিরে এসেছিলেন। আমার স্মৃতিচিত্রণে পাবনার অভিজ্ঞতার কিছু বর্ণনা আছে। দীর্ঘ ২২ বছর পরে পাবনা দর্শন আমার। ১৯১৭তে আই-এ পাস করেছি ঐ কলেজ থেকে। তখন টিনের ঘরে বাঙালী মতে ছিল কলেজটি। ইচ্ছামতী নদীর ওপারে রাধানগরে একদিন কলেজের শিলান্যাস হল। প্রিন্সিপ্যাল তখনকার দিনে খ্যাতনামা রাধিকানাথ বসু (আর. বোস) সেই উপলক্ষে সুন্দর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ইংরেজিতে, মনে আছে। ১৯৩৯ সনে গিয়ে দেখি বাঙালীর টিনের ঘরের সেই কলেজের পুরো সাহেব প্রিন্সিপ্যাল আর. বোস, তৎপরবর্তী ১৯৩৯ সনের সাহেবী ধরনের কলেজে, বাঙালীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, সাধারণ বাঙালী পোশাকে বসে দাবা খেলছেন।

যুদ্ধ ক্রমে আরম্ভ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ১৯৪০ সনে যুদ্ধের দৈনিক খবর প্রচারের জন্য পাবলিক রিলেশনস সাব-কমিটি গঠিত হল ব্যাংকশাল স্ট্রীটে। সেক্রেটারি কুমুদকুমার ব্যানার্জী রেডিওতে খোঁজ করেছিলেন তাঁদের একবেলার জন্য একজন সংবাদ অনুবাদক দরকার। নৃপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার আমার নাম দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে, আমি তখন যুদ্ধের অবস্থা প্রতি সপ্তাহে রেডিওতে বলতাম। এবং নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতি ভালভাবে বুঝতে প্রায় দেখা করতাম। যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রচারে আমার সঙ্গে প্রমথনাথ বিশীও ছিল। আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতাম (এবং বিশ্বাস করতে ভাল লাগত) যে, মিত্রপক্ষ শেষ পর্যন্ত

জিতবে। নীরদবাবুর কাছে এ বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল। পাবলিক রিলেশনস সাব-কমিটি থেকে 'সাব' উঠে গেল—সংক্ষেপে পি-আর-সি। অফিসও উঠে গেল ২৯ ওয়াটারলু স্ট্রীটে। যে সংবাদটুকু ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে দিতাম, তা কয়েকখানা ভ্যানে লাউড স্পীকারের সাহায্যে প্রচার করা হত। শহরের স্বাস্থ্য বিষয়েও মাঝে মাঝে বলা হত ভ্যানে। হিন্দি অনুবাদ করতেন প্রফেসর এস পাণ্ডে। যাঁরা বলতেন তাঁদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ দাস, দীপনারায়ণ মিঠোলিয়া (পরে আকাশবাণীতে হিন্দি বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন)। ধীরেন দাস ছিল আমার বিশেষ অনুগত, সে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে তাঁর নর-নারায়ণ নাটকে গান গেয়ে খুব খ্যাতিলাভ করেছিল। আমি শুধু অনুবাদই করতাম না। যখন কিছুদিন ইংরেজিতে কথিকা আমাকেই লিখতে হয়েছে, তখন সংবাদ ব্যাখ্যাও করেছি সেই সঙ্গে। এ রকম 'ভ্যান টক' লিখলে জ্যোফ্রে টাইসন (পি-আর-সি'র সংগঠনকারী) তা পড়ে প্রয়োজন মতো অদলবদল করে দিতেন। পরে ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে শুধু সংবাদ সঙ্কলন করে দিয়েছি দু' একবার। ১৯৪৫ সনে মার্চ মাসেও ইংরেজি সংবাদ তৈরি করেছি এবং তাব অনুবাদ করে দিয়েছি। ১৯৪৫-এর ১লা মার্চ যুগান্তরে ম্যাগাজিন সেকশনের সম্পাদক রূপে যোগ দিই এবং পি-আর-সিকে এক মাসের নোটিস দিই। অর্থাৎ মার্চ মাসে একবেলা পি-আর-সির কাজও করেছি যুগান্তরের কাজেব সঙ্গে। যুগান্তর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে অনুমতি নিয়ে নিয়েছিলাম। ৮ই মার্চ ১৯৪৫ তারিখে যে ইংরেজি সংবাদটি ভ্যানের জন্য তৈরি করেছিলান, তার একটা কপি আমার কাছে আছে। আমি সেটি এখানে তুলে দিচ্ছি। এবং তা শুধু এ কারণে যে, তার আগের দিন যুদ্ধের কি অবস্থা ছিল জানা যাবে। সংবাদ সব সময়েই ইংরেজি কাগজ থেকে সঙ্কলন করতে হত, শুধু কোন সংবাদগুলি বলতে হবে তা খবরের কাগজ থেকে বাছাই করে সাজিয়ে দেওয়া মাত্র।

Van Talk 8-3-45

On the East European Front General Rokossovsky has begun a general converging movement on Danzig. In the three main directions his troops are within 20 to 50

miles of the port. The Germans say that the Russians during the past 24 hours have launched a large-scale attack on the Berlin Front with extremely heavy bombardment. Latest news says that a town 22 miles south of Danzig has been captured by the Red Army.

In the west American First Army troops have entered the town of Alfter, 3 miles west of Bonn. Coblenz, the third great Rhine city is coming nearer to General Patton as he continues to drive towards the Rhine. According to the latest report the American Third Army has also reached the Rhine.

In Burma the Allied 14th Army troops and tanks have fought their way to the villages only four and half miles from Mandalay. In the fighting to capture Meiktila it is now estimated that 2000 Japanese were killed.

In Iwojima the offensive at the north end of the island has been resumed, preceded by the most intense artillery bombardment of the campaign The Japs are offering very stiff resistance, and up to Monday Japanese dead counted totalled 14,456.

পরবর্তীকালে লেখকরূপে ও সাংবাদিকরূপে খ্যাত, নিরঞ্জন মজুমদার গোড়া থেকে এই কমিটিতে কাজ করতেন। কর্মতৎপরতায় তাঁর জুড়ি ছিল না ওখানে, ইংরেজি কথনে নিপুণ ছিলেন, আর সে জন্য কেরানি পদ থেকে দ্রুত উন্নতি হল তাঁর। ১৯৪১ থেকে ডক্টর পরিমল রায় হলেন কমিটির সেক্রেটারি। পূর্বে ছিলেন সার আজিজুল হকের পুত্র আসাদ-উল হক। নিরঞ্জন মজুমদার অতঃপর টাইসন সাহেবের ক্যাপিট্যাল নামক কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তারপর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে এবং সর্বশেষ স্টেটসম্যানে। আমি ১৯৪৫ সনে যুগান্তরে যোগ দেবার পরে তাঁর লেখা ছেপেছি। এই সময় আমি তাঁর একটি ছদ্মনাম ঠিক করে দিয়েছিলাম নামের প্রথম অক্ষর কেটে—'রঞ্জন'। এই নামে তিনি আজও লেখেন।

ফিরে যাই ১৯৪১ সনে।

যখন সম্পাদক ছিলাম

১৯৪১ সনের জুলাই মাসে আমি এক মাসের উপরে শয্যাশায়ী ছিলাম। পেটে প্রথমে একটি ফুসকুড়ির মাথা দেখা দিয়েছিল, পরে সেই একটি মাথা দশ মাথায় পরিণত হল। বন্ধুদের কাছে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছি—প্রথমে ঐ মাথাটিকে রামের মাথা বলে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু পরে বোঝা গেল ওগুলি রাবণের মাথা। অর্থ দাঁড়াল এই যে, আমার 'কারবাংকল' হয়েছে। ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য নানাভাবে আমাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তখনো অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ আরম্ভ হয়নি। এই অসুখের যাবতীয় অভিজ্ঞতার কথা যদি এখন লিখি তবে মনে হয় অপরাজেয় ব্যাধি-কথা-শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পরাজিত করতে পারি। কিন্তু সেটি আমার পক্ষে অন্যায় হবে বলেই লিখব না। কিন্তু তবু এই অসুখটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ আছে। কারণ—পশুপতি ভট্টাচার্য। সে কথা পরে বলছি।

১৯৪১, ৭ই অগস্ট। বাংলার পরম পূজনীয় সর্বজনহৃদয়বাসী রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটল। আমি রোগশয্যায়। ওঠবার উপায় নেই বিছানা ছেড়ে। শুয়ে শুয়ে রেডিওতে শুনছি মৃত্যু সংবাদ, আর আমার সেই দুর্বল দেহে মনটাও এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তখন অশ্রু আর কোনো বাধা মানছে না। এর আগে কয়েক দিন ধরে এলোমেলো সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত হচ্ছিল। কখনো জানানো হচ্ছে অবস্থা একটু ভালর দিকে, কখনো শুনছি হঠাৎ খারাপের দিকে। খবরগুলি ছিল এই রকম :

শুক্রবার ১লা অগস্টের বুলেটিন : সময় ৮-১৫ রাত্রি। কবির রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, খুব অস্থিরতার প্রকাশ ছিল।

শনিবার, ২রা অগস্ট : সময় ১২টা মধ্যাহ্ন : মোটামুটি অবস্থার কিছু উন্নতি বোধ হয়। রাত্রে বলা হয়—অবস্থার বদল ঘটেছে। অস্থিরতা বেড়েছে। রবিবার খুব সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

রবিবার ৩রা অগস্ট। অস্থিরতা চলছে, দুর্বলতা বেড়েছে। ৮-৩০ রাত্রে প্রচার করা হয় : উদ্বেগের কারণ থাকলেও এখনই ভয় পাবার মতো কারণ ঘটেনি।

সোমবার ৪ঠা অগস্ট : সমস্ত রাত অস্থিরতায় কেটেছে, দুপুরের পর থেকে জ্বরের মাত্রাও কিছু বেড়েছে।

মঙ্গলবার ৫ই অগস্ট, রাত ৮-১০এ প্রচারিত হল : অবস্থার অবনতি

ঘটেছে, উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়েছে।

বুধবার ৬ই অগস্ট : সমস্ত দিন বার বার বুলেটিন প্রকাশ হতে থাকে। সকাল ১১-২০ এর বুলেটিনে বলা হয় : কবির দুর্বলতা এবং অস্থিরতা উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছে। সন্ধ্যা ৬টায় বলা হয়, অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। ৭-৩০এ বলা হয়, অবস্থা আরো খারাপ। ৮-৩০এ বলা হয়, দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ১১-৩০ রাত্রি পর্যন্ত অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

বৃহস্পতিবার, ৭ই অগস্ট : মধ্যরাত্রির পরে, ২-৩০এর সময় : অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শেষ বুলেটিন ভোর ৩-৩০তে : অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ। কবির গৃহাঙ্গণ লোকারণ্যে পরিণত। বেলা দশটায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও সার্জন ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শেষবারের মতো কবিকে পরীক্ষা করেন। ৭ই অগস্ট দুপুর ১২-১৩ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা তারিখ ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮। (অমল হোম সঙ্কলিত এই তথ্য মিউনিসিপ্যাল গেজেট বিশেষ সংখ্যা ২৩/৯/৪১ থেকে গৃহীত)

ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য ৬ই অগস্ট মৃত্যুর পূর্বদিন কবির পাশে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি শেষ পর্যন্ত ইউরীমিয়া হয়েছিল। প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড অপারেশনের পর অবস্থার আর উন্নতি ঘটেনি। অ্যান্টিবায়োটিক তখনো অজ্ঞাত।

কি বিপুল বিষণ্ণতা আর শোকবিহ্বলতা বাংলার বুকে। রবীন্দ্রনাথের কথা, জন্মের পর থেকেই প্রায় জেনে আসছি, মুখে মুখে শুনে আসছি, রবিবাবু মস্ত বড় কবি। রবিবাবু, রবি ঠাকুর, ঠাকুর কবি—এই সব নাম শুনেছি ছেলেবেলায়। তিনি আমাদের মনের পটে আকাশের মতো ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তাঁকে স্মরণ করবার দরকার ছিল না তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতির জন্য। তিনি যে কত বড়, তাঁর বৈশিষ্ট্য কি, এ সব চিন্তা করবার ক্ষমতা ছিল না যখন, তখন থেকে তিনি আছেন আমার মনে। তারপর বিভিন্ন বয়সের ছবির ভিতর দিয়ে তাঁর যেমন চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, তেমনি আমিও বড় হয়ে উঠেছি। তাই তাঁর রূপের যে পরিবর্তন বছরের পর বছর তাঁর নানা ফোটোগ্রাফের ভিতর দিয়ে দেখলাম, তাতে পূর্বের সঙ্গে পরের সামঞ্জস্যহীনতা চোখে পড়েনি। তিনি যেন আমার

চোখের সামনে বড হয়ে উঠছেন। মনের মধ্যে অজ্ঞাতসারেই একটা বিরাট পটভূমি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর কালক্রমে তাঁকে দেখলাম, তাঁর কাছে বসে তাঁর বক্তৃতা শুনলাম, তারপর তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলাম। কতদিন তাঁর ক্ষণসঙ্গ লাভ করেছি, তাঁর পায়ে মাথা নত করেছি কতবার। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমার মনের আকাশ এমন পূর্ণ করে ছিলেন যে তাঁর মৃত্যু ঘটলে আমার মনের অবস্থা ঠিক কেমন হবে তা শুধু যে কল্পনা করতে ভয় হত তাই নয়, কল্পনা করা সম্ভবই ছিল না। তাই যখন তাঁর সত্য মৃত্যু ঘটল, তখন চিন্তা অসাড হয়ে গিয়েছিল। রেডিওতে খবর শুনছি, চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে। আমি তখন কৈলাস বসু স্ট্রীটে বাস করি। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে মৃতদেহ এগিয়ে চলেছে, পথ জনতায় নিরেট, সব সংবাদই শুনছি—যারা দেখছে তাদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে। কিন্তু আমার তখন ওঠবার ক্ষমতা নেই। একটা মূঢতার ভাব। মৃত্যু এত সত্য, অথচ বিশ্বাস করতে ভয়ে কেঁপে উঠছি। বাংলার সমস্ত পরিবেশ থেকে, সমস্ত বাঙালীর হৃদয় থে.ক, রবীন্দ্রনাথরূপী সুন্দর পুরুষমূর্তি এবং তাঁব ভাবমূর্তি হঠাৎ 'নেই' হয়ে গেল, মনের উপর এ এক নির্মম আঘাত। এর প্রচণ্ডতা মনকে যে কি পরিমাণ চিন্তামূঢ করে তুলেছিল তা ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। দৈহিক ব্যাধি-বেদনা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর রাত্রে আবার রেডিও—শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা। সুনীল রাযের কণ্ঠে গান শুনছি—

সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।—

অথচ এ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি ছিল। রবীন্দ্রনাথ ৮০ বছর সদ্য পার হয়েছেন, কঠিন অসুখে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত, সব সত্য, কিন্তু সব সত্যই মৃত্যু এসে চূর্ণ করে দিয়ে গেল। একটা অকল্পিতপূর্ব শূন্যতার মধ্যে হঠাৎ নিক্ষিপ্তবৎ পড়ে রইলাম। সম্ভবত আমার সেই সময়েব দৈহিক পঙ্গুতা এর জন্য কিছু পরিমাণে দায়ী।

মনের এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে কয়েক দিন দেরি হল, পশুপতিবাবুর ব্যবস্থাগুণে পেটের উপরকার সেই কারবাংকল-এর প্রদাহও ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল। সমস্ত ফুসকুড়িগুলো প্রথমে একটিতে পরিণত হল, তারপর

সদ্য-অগ্নি-উদ্‌গিরণ হয়ে যাওয়া আগ্নেয়গিরির চূড়ার মতো একটি 'ক্রেটার'-এর আবির্ভাব ঘটল। কি উন্মাদ-করা কণ্ডূয়ন তার। পশুপতিবাবু একজন কবিরাজকে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি গরম ঘি-এর (তখনো ঘি পাওয়া যেত!) ছেঁকা দিতে লাগলেন তার উপর। ভীষণ আরাম বোধ হতে লাগল তাতে। ক্রমে ক্রেটারের মুখ বুঁজে এলো, এবং আরো কয়েক-দিন পরে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা লাভ করলাম। কিন্তু তখনো শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থানে চারদিক থেকে এমন টান পড়ে যে, হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হয়।

২০শে অগস্ট (রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ১২ দিন পরে) পশুপতিবাবু এসে আমাকে বললেন, ২২শে অগস্ট বাগবাজারে একটি ঘরোয়া শোকসভা হবে, আপনাকে সেখানে কিছু বলতে হবে। আমি আমার অক্ষমতার কথা তাঁকে বললাম। তিনিও জানতেন। এবং বোধহয় ভালই জানতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি বললেন, সে ব্যবস্থা আমরা করব। আপনি প্রস্তুত থাকবেন।

আমি শুয়ে শুয়ে ছোট্ট একটি কথিকা লিখলাম। ২২ তারিখে সন্ধ্যাবেলা পশুপতিবাবু তাঁর গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। বললেন—উঠুন। দেখি তিনি একা নন, আমাকে কিডন্যাপ করার জন্য লোক এনেছেন সঙ্গে। অবশেষে সবার ঘাড়ে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিচে নেমে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। হিমানীশ তখন স্কুলের ছাত্র, সেও সঙ্গে চলল।

মদনমোহন তলায় বৈঠক। ২২-৮-১৯৪১ তারিখ। যেটি পাঠ করেছিলাম সেই মূল লেখাটি আজও আমার কাছে আছে। সভায় পশুপতিবাবু একটি গান গেয়েছিলেন। তাঁর রবীন্দ্রসান্নিধ্য এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ ছিল বলেই হয়তো তিনি বেদনা ভোলার জন্য এইভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে মনের সান্ত্বনা খুঁজছিলেন। তাঁর কথা চতুর্থ অধ্যায়ে কিছু বলেছি। বাকিটা তাঁর সাম্প্রতিক একখানা চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি। আমার 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' নামক বইখানি পড়ে তিনি লিখছেন—

১৬ বাগবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৩
১৪।৬।৭২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

...আপনি চমৎকারভাবে গুছিয়ে পর্বে পর্বে ভাগ করে ধারাবাহিকভাবে আপনার বক্তব্যকে এমন সাজিয়েছেন যাতে বইখানি মূল্যবান থিসিসে পরিণত হয়েছে।

যখন সম্পাদক ছিলাম

রবীন্দ্রনাথ যে বিজ্ঞানভক্ত ছিলেন একথা আমরা বিলক্ষণ জানি।...তিনি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকে চিরদিনই উৎসাহিত করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখতে তিনিই তো আমাকে প্ররোচিত করেছিলেন। আমার 'ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা' গ্রন্থটির একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা তিনি লিখে দিয়েছিলেন। সেকথা তো আপনি জানেন, কারণ আপনিই বইখানির প্রুফ দেখে অনেক সংশোধন করে দিয়েছিলেন।...

শুধু বিজ্ঞান কেন, রবীন্দ্রনাথ সব দিক দিয়েই অসাধারণ ছিলেন। মানুষের জ্ঞান যত দিক দিয়ে এগিয়েছে সব দিকেরই তিনি সংবাদ রেখেছেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধও খেতেন এবং দিতেন, আবার আমার কাছে ইনজেকশনও নিতেন।...

পশুপতি ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রপ্রীতি ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা পশুপতিবাবুর কেন এসেছিল তার কিছু আভাস দেওয়া গেল। আমার আরোগ্য ব্যবস্থা করে, তিনিই আবার আমাকে বিপন্ন করলেন, প্রায় গুণ্ডার সাহায্যে অপহরণ। এতে আমার প্রতি তাঁর কতখানি প্রীতি ছিল তার প্রকাশ পেয়েছে। সবাই মিলে সমদুঃখভাগী না হওয়া পর্যন্ত তাঁর তৃপ্তি ছিল না।

পশুপতিবাবুর চিঠিতে আমার 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' বইখানার উল্লেখ আছে। এই সুযোগে ঐ বইখানার বিষয়ে আর এক ডাক্তারের চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে, আমি আমার স্মৃতিকথাগুলিতে নিজেকে কিছু আড়ালে রাখি, এমন একটা অপবাদকে খণ্ডন করছি। কারণ হয়তো পরে আর সুযোগ পাব না।

এ চিঠির লেখক ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, এঁর বিষয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে অনেকখানি বলেছি। এ চিঠি অপ্রত্যাশিত, এবং রামবাবুর সঙ্গে আমার বহুকাল দেখাশোনা হয়নি। যোগাযোগটা একটু বিস্ময়কর মনে হয়েছিল এ জন্য যে আমি যখন তাঁর কথা লিখছি, তিনি তখন দূর প্রদেশে আমার বই পড়ছেন। চিঠিখানা এই—

ওঁ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পোঃ পণ্ডিচেরী-২
১৪।৫।৭২

শ্রদ্ধাস্পদ পরিমলবাবু,

বহুদিন লেখা হয় নাই। পণ্ডিচেরীতে গরমকালে কয়েক বৎসর আড়াই মাস থাকি; নয় মাস কাশীতে। বারাণসীতে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে, রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বিজ্ঞান কলেজে

(কলিকাতা) কিছু কিছু বলিতে বা পড়িতে হয়। সম্প্রতি কলিকাতায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বসুর আহ্বানে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে Evolution and human destinyর কতক অংশ ইংরাজীতে পড়িয়াছি। অধ্যাপকের আদেশে সে লেখা বাংলায় অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছি। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

এ পত্র লেখার অব্যবহিত কারণ, এখানে নলিনদা (নলিনীকান্ত সরকার) আপনার 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' বইটি পড়িতে দিয়াছেন। এই অপূর্ব সঙ্কলন এবং সারগর্ভ সিদ্ধান্ত পূর্বে পড়িলে, আমার প্রবন্ধে অনেক কিছু বুঝাইতে পারিতাম। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যই পত্র লিখিতেছি। প্রায় বারো বৎসর বঙ্গ সাহিত্য থেকে দূরে আছি। অনেক প্রগতির বিষয় জানিতে পারি না। প্রণাম লইবেন। ইতি—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী

প্রায় এই সময় থেকে বা কিছু আগে থেকে যুগান্তর পূজা সংখ্যার জন্য প্রতি বছর গল্পের জন্য চিঠি পেতাম। গল্পসংগ্রহের জন্য প্রতি বৎসর একজন যুবক আসত আমার কাছে। তাকে দেখে ভয় হত। ঠিক সময়ে তার হাতে দিতে হত লেখা। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির এবং সামান্য যা কথা হত তাতে তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বলে বোধ হত। ভয়টা সেই জন্যই। পরে নাম জেনেছিলাম ভূষণচন্দ্র দাস, যুগান্তর ম্যাগাজিন সেকশনের সহ-সম্পাদক প্রথম দিন থেকে। যুগান্তর ম্যাগাজিন বিভাগের প্রথম সম্পাদক প্রবোধ-কুমার সান্যাল, তারপর বিনয় ঘোষ। এ সময়টা বোধহয় বিনয় ঘোষের আমল। বিনয় ঘোষকে তখনো দেখিনি। একমাত্র বিবেকানন্দ মুখো-পাধ্যায় ও বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত ছিলেন আমার পূর্ব পরিচিত, বিজয়ভূষণের সঙ্গে ট্রামে মাঝে মাঝে দেখা হত, যুগান্তরের সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখো-পাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯৩২ থেকে পরিচয় যখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় ছিলেন। যুগান্তর অফিসে ১৯৪৫ এর আগে কখনো যাইনি।

সেই যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল ১৯৩৯ সনে. ১৯৪২ সনে তার আওয়াজ শোনা গেল প্রায় মাথার উপর। জাপানী বোমার আওয়াজ। হাতীবাগানে প্রথম, ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪২। ২১শে তারিখে আর একবার, ২২ তারিখে তৃতীয় আক্রমণ, ২৪ তারিখে চতুর্থ আক্রমণ। কলকাতার লোক আতঙ্কে দিশাহারা। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পলায়ন। আমার কাজ এবং দায়িত্ব ক্রমে বাড়ছে। এক দিকে রেডিওতে যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা, ফীচার লেখা, পি-আর-সিতে একবেলার কাজ। ক্রমে খাদ্য-বস্তুর অভাব, কয়লা দুর্লভ, ক্রমে পথে পথে অনাহারে হাজার হাজার নরনারী শিশুবৃদ্ধ যুবকের

মৃত্যু। মৃতদেহ ডিঙিয়ে পথ চলা। এ সব অতি বেদনাদায়ক কথা, পূর্বে অনেকবার বলেছি, চিন্তা করতে গেলেই সেদিনের দৃশ্য সব চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এর সঙ্গে জেনারেল প্রিন্টার্সের প্রতিষ্ঠানে একবেলার কাজ। এখানে দু' রকম কাজ। প্রকাশন বিভাগে বই মনোনয়ন ও ছেপে বার করা, তার বিজ্ঞাপন লেখা ও 'বাংলার শিক্ষক' নামক শিক্ষা সংক্রান্ত মাসিকপত্রের সম্পূর্ণ ভার নিয়ে কার্যত সম্পাদন করা। দুজন সম্পাদকের নাম ছাপা থাকত মলাটে, আবদুল হাকিম এম-এ (ক্যানটাব) ও সুরেশচন্দ্র দাস এম-এ। জেনারেল প্রিন্টার্স ও অবিনাশ প্রেসের মালিক সুরেশবাবু। আবদুল হাকিম ঢাকা রেঞ্জের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর।

একটি সংখ্যা আজও আমার কাছে আছে। সেপ্টেম্বর ১৯৪৪। এই সংখ্যাখানিতে কেবলমাত্র আমার লেখা ও আমার বন্ধু করালীকান্ত বিশ্বাস এম-এ, বি-এলএর লেখা। করালীকান্ত চিন্তাশীল প্রবন্ধকার, আগের দিনে 'পরিচয়' প্রভৃতি কাগজের লেখক। এই সংখ্যা বাংলার শিক্ষকে মুদ্রিত আমার রচনার নাম 'শিশুপাঠ্য বই', করালীর রচনার নাম 'ভারতে শিক্ষা সংস্কার।' অন্য রচনা 'সাময়িকী' ও 'সংবাদ' আমার লেখা। করালীকান্ত সার্জেণ্ট কমিটির রিপোর্ট নিয়ে অতি সুন্দর আলোচনা করেছিল তার প্রবন্ধে। আমি সম্পাদকীয় (যার নাম ছিল সাময়িকী) তাতে রেডিওর ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে প্রচারিত দুপুর বেলার একটি প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আসরে 'এইবার, একটি ভাটিয়ালী গান শোন' বলে যে গানটি শোনানো হল তার আরম্ভ: "না বুঝিয়া পীরিত করা কি জ্বালা।" এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলাম আমার সেই লেখায়।

এখানে আসবার আগে ওয়াটারলু স্ট্রীটে একটা আড্ডা ছিল আমাদের। শতাব্দী গ্রন্থমালা পর্যায়ে বই ছাপা হচ্ছিল সেখানে। উদ্বোধন করলেন কালিদাস নাগ। সেখানে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। আমরা যাঁরা সেখানে সন্ধ্যায় এসে মিলতাম সেই আমরা, অনেকেই এখানে নিজ নিজ বই প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলাম। এঁদের মধ্যে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, বিভাস রায়চৌধুরী, বিনয় চৌধুরী ও আমার বই ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন

তিনজন : ব্রতিশঙ্কর রায়, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ও সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। এ সময়ে ইউরোপে এশিয়ায় ঘোর যুদ্ধ ও এদেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ চলছে। বিকেলে কোনো দোকানে কিনে খাবার মতো কিছু ছিল না। এসপ্ল্যানেড ঈস্টের এক সরু গলির মধ্যে একটা দোকান আবিষ্কার করা গিয়েছিল। সেখানে প্রায় কাড়াকাড়ি করে কিছু খাদ্য কেনা যেত। অন্যথা কাছে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের এক মুসলমানের দোকানের শস্তা শিক-কাবাব কিনে খেতে হত। খুব লোভনীয় হলেও রোজ ভাল লাগত না। বিদ্রোহী শিল্পী ভোলানাথ চাটুজ্জে এইখানের একজন উপদেষ্টা ছিলেন। এটি বন্ধ করতে হল কিছুদিন পরেই।

জেনারেল প্রিন্টার্সের আড্ডা খুব বড় হয়ে উঠল ক্রমে। যুদ্ধের সময় হঠাৎ জনসাধারণের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ ভয়ানক রকম বেড়ে গিয়েছিল, তাই বই ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বিক্রি হয়ে যেত। আরো কারণ, কাগজ প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে এসেছিল, তাই বই ছাপাও হত অপেক্ষাকৃত কম শেষে হাতে তৈরি কাগজে ছাপতে হয়েছে অনেক বই, এবং সে কাগজ কাগজ-কীটের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল খুব ভাল রকম।

শ. চিঠি ও বঙ্গশ্রীর পরে এত বড় আড্ডা আর দেখিনি। আমার উপর ভার ছিল বই প্রকাশের। আগেই বলেছি। সেজন্য এই উপলক্ষেও অনেকে, এবং নেহাৎ সাহিত্য ও সাহিত্যিক সঙ্গ লোভে অনেকে আসতেন। পৃথক আরো একটি ঘরই রাখা হল আড্ডার জন্য। এখানে মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ত্রিদিবনাথ রায়, করালীকান্ত বিশ্বাস, কিরণকুমার রায়, কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার প্রভৃতি প্রায় নিয়মিত অতিথি। নলিনীকান্ত সরকারও আসতেন মাঝে মাঝে এখানে। বাংলার শিক্ষক সম্পাদনার বাইরে একখানি সঙ্কলনগ্রন্থ সম্পাদনা করি—এখানি দুর্ভিক্ষের গল্পের সঙ্কলন। নাম দিয়েছিলাম মহামন্বন্তর, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর স্মরণ করে। পরে আমার দেওয়া এই নামে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে ঐ দুর্ভিক্ষ। এতে যাঁদের গল্প নিয়েছিলাম তাঁদের নাম : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নবেন্দু ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত, সরোজকুমার রায়চৌধুরী। সরোজের ও আমার দুটি করে গল্প ছিল এতে। আমার একটিতে শুধু দৈনিক হিসাব হয়েছিল গল্পের উপকরণ।

গল্পগুলির মধ্যে আমার নিজের কাছে সব চেয়ে ভাল লেগেছিল মনোজ বসুর গল্পটি। আমি যেন সেই দৃশ্য চোখের সামনে জীবন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। খুব সরল গল্প, অথচ এমন বাস্তবরূপে মর্মান্তিক যে, শুধু এই গল্পটির ভিতর দিয়ে যেন সমগ্র দুর্ভিক্ষেব হীন চেহারাটা ফুটে উঠেছে। কলকাতাব সমস্ত পথে এক একটি পবিবার ধুঁকে ধুঁকে মরেছে—এমন শত শত দৃশ্য দেখেছি নিজ চোখে। তাই ঐ গল্পটার করুণতা মনকে বিষম ধাক্কা মেরেছিল।

বন্ধুবর গোপাল হালদারকে অনুরোধ করেছিলাম এই বইয়েব ভূমিকা লিখে দিতে। গোপালবাবুর সমাজ বিষয়ে চেতনা গভীর। তিনি বাংলার শিল্প সংস্কৃতিব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পবিচিত। তিনি সংস্কৃতিমান, তিনি বড সমালোচক। উপবন্তু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁব প্রতি আমাব শ্রদ্ধা অবিচলিত। কাজেই তাঁর ভূমিকা এ সঙ্কলনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে সে বিশ্বাস আমার ছিল। তিনি তাঁর ছোট্ট ভূমিকায় অতি চমৎকাব ভাবে সমকালেব প্রতি সাহিত্যিকেব দায়িত্ব বুঝিয়ে বললেন এবং দুর্ভিক্ষের পটে লেখা গল্পগুলিকে অভিনন্দন জানালেন, তিনি বললেন—

> বাংলাদেশেব মন্বন্তব তাব শিল্পীদেব মনে যে কত বড আলোড়ন তুলেছে মন্বন্তবেব মধ্যে বসেও আমবা তা সবিস্ময়ে দেখেছি, আর স্বীকাব কবেছি—বাংলাব শিল্পী ও স হিত্যিকরা তাঁদেব দ য়িত্ব বিস্মৃত হননি। শিল্পের পক্ষেও এ এক শুভ লক্ষণ যে, শিল্পীবা তাব অ.ঘাতে সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, তাঁদেব দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।. আমাদেব কর্মী ও নেতারা যা বলতে পারেননি, আমাদেব শিল্পীবাই সেই মন্বন্তবেব কথা এখন পর্যন্ত তবু বলতে পেবেছেন।...

এ সময়ের গল্পের সমর্থনে লেখকেরা যে দূরে সরে থাকেননি, এই কথাগুলিই বলবার দরকার ছিল। গোপালবাবু সার্থকভাবে তা বলেছেন।

আমার ভূমিকাটি কিছু দীর্ঘ হয়েছিল। আমাদের মনের উপর তখন দুর্ভিক্ষজনিত ব্যাপক মৃত্যুদৃশ্য দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেই কথাই আমি লিখলাম—

> ১৯৪৩ সন বাংলাদেশের বুকে যে বিপর্যয় বহন করে এনেছে তার তুলনা বাংলাদেশের ইতিহাসে আর মেলে না। আমরা এই বিপর্যয়েব ভিতর দিয়ে এখনও চলছি এবং যদি

কখনও সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে তখন এর ভয়াবহতা হয় তো আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে পারব। ...একদিকে পথে পথে ক্ষুধার্ত নরনারীর মিলিত আর্তনাদ অন্যদিকে কাগজে সভায় সমিতিতে নানা প্রতিধ্বনি। চোখের সম্মুখে রাজপথের উপর লোক মরছে, পথে পথে মৃতদেহ পড়ে আছে, মা মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে কাঁদছে, স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহের পাশে কাঁদছে—এসব সর্বদা দেখে দেখে আর আলোচনা শুনে শুনে আমাদের মনে বেদনার তীক্ষ্ণতা এলো কমে, বেদনা ব্যাপক হয়ে সমস্ত মনকে ভারী করে তুলল...মন অসাড় হয়ে এলো। অসাড় মন বাইরে প্রসারিত হয় না, নিজেরই মধ্যে ডুব মারে। এ অবস্থা গল্প লেখার অনুকূল নয়, কেন না বাস্তবকে কোনো রকমে অনুকরণ করলেই গল্পলেখক নিষ্কৃতি পান না।...মন যেখানে বিমূঢ় সেখানে কোনো কিছু গড়ে তোলা সহজ নয়।

তাছাড়া ব্যাপক নির্বিশেষ থেকে বিশেষকে বাছাই করে আনলেও লেখক কোন্ ভাষায় তাকে পৃথকভাবে দর্শনীয় করে তুলবেন? যে সর্বনাশের দৃশ্য চোখ মেললেই সকল ইন্দ্রিয়ে এসে নির্মমভাবে ঘা মারে, এমন কোন্ ভাষা আছে যার সাহায্যে সেই দৃশ্যের অনুকরণে আর একটি দৃশ্য গড়ে তোলা যাবে?

ভাষা পরাজিত, অনুভূতি অসাড়, অন্তর বিমুখ, মনে শুধু বিষের তিক্ততা। এই তিক্ততা নিয়ে লেখককে কলম ধরতে হয়েছে, এবং অনেক গল্পে এই তিক্ততাই বেশি করে ফুটে উঠেছে। (১৯৪৪)

ইতিমধ্যে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র সুধীর ভট্টাচার্য এম-এ, তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ১৯৪৩ সনে 'নূতন পত্র' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা পাকা করে আমাকে দিল সম্পাদনের ভার। সে হল সহকারী সম্পাদক। তার বন্ধুরা বিজ্ঞাপন সংগ্রহে ছিল পটু, প্রচুর বিজ্ঞাপন নিয়ে এলো, যথারীতি আইনসঙ্গতভাবে টাকা দিয়ে অনুমতিও সংগ্রহ করা হল, কিন্তু চার খণ্ড প্রকাশের পর দিল্লী থেকে হুকুম এলো শুধু কলকাতার অনুমতিতে হবে না দিল্লীর অনুমতি চাই। কিন্তু 'দিল্লী চলো'তে কেউ রাজি না হওয়াতে কাগজটি বন্ধ করতে হল। এ-কাগজ বহুদিন চলতে পারত কারণ বিজ্ঞাপন আশানুরূপ পাওয়া গিয়েছিল। আমারও খুব উৎসাহ ছিল এবং লেখাও সংগ্রহ করা হয়েছিল উচ্চ শ্রেণীর। প্রসিদ্ধ অনেকেই লেখা দিয়ে সাহায্য করছিলেন। এই মাসিকের কথা আমার স্মৃতিচিত্রণ-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের বেদনাময় পরিবেশ থেকে কিছু পরিমাণ মুক্তি পাওয়া যাচ্ছিল এই মাসিককে ঘিরে। এটি আমার অবসর সময়ের কাজ, আমার শোবার ঘরে এর অফিস।

শনিবারের চিঠির বেলাতেও তাই ছিল। ১৯৪৩ সনের আগেই কলকাতায় যে কটা বোমা পড়বার তা পড়ে গিয়েছিল, কাজেই এ সময় বোমার ভয় আর খুব ছিল না।

এই সময় আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথমত কয়েক বছর ধরেই শহরে অপ্রদীপের অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও পথ-ঘাট প্রত্যেকের পক্ষেই ছিল নিরাপদ। নিশ্চিন্ত মনে রাত্রে মেয়েরা একা পথ চলেছে, কোনো দিক থেকেই কোনো রকম বিপদের ভয় তাদের মনে জাগেনি, এমনি ছিল শহরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। আরো একটি ঘটনা—হঠাৎ পথ থেকে যাবতীয় মৃত এবং মৃতপ্রায় শত শত পরিবারকে ট্রাক ভরতি করে শহর থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পথ সম্পূর্ণ আবর্জনাশূন্য করে, প্রত্যেক পথে ও ড্রেনে ডি-ডি-টি-দ্রবণ মোটা মোটা হোস-পাইপে করে ছড়িয়ে দেওয়া হল। কলকাতা শহরের চেহারাই হঠাৎ কোনো অলৌকিক হাতের স্পর্শে সম্পূর্ণ গ্লানি মুক্ত হয়ে গেল। চোখে যে বীভৎস দৃশ্য দেখে মন প্রায় বিকারগ্রস্ত হয়েছিল, সে দৃশ্য চোখ থেকে কোথায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু মন থেকে সম্পূর্ণ দূর হল না।

আমি তো জীবনের অনেক দুঃখ-বেদনাকেই হাসির সাহায্যে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, এবং বেদনাকে চেপে রাখার জন্যই অনেক সময় কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছি, তখনও তাই করতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু শিল্পীর নিস্পৃহতা এ সময়ে খুব ছিল না। মৃতদেহের মুমূর্ষুর ফোটোগ্রাফ তোলার প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু এর কল্পনাতেও মন বিরূপ হয়ে উঠত, তাই এতবড় ট্রাজিডিকে আমার ক্যামেরার উপকরণ করতে মন চায় নি। একখানি ছবিও তুলি নি। তাই গল্প লিখতে গিয়েও ঠিক গল্প হল না। পরে লিখলাম। তা আমার 'ব্ল্যাক মার্কেট' নামক বইতে সঙ্কলিত হয়েছিল।

যাই হোক, অ্যামেরিকান সৈন্যদের উপযুক্ত ন্যূনতম ভদ্র পরিবেশ (স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে) গড়ার জন্যই যে এটা হল এতে আরাম পেয়েছিলাম। দেখা গেল, ইচ্ছা থাকলে সবই করা যায়, শহরকে সম্পূর্ণ সমাজ-বিরোধী মুক্ত করাও যে সম্ভব, তা যুদ্ধের কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম।

যখন সম্পাদক ছিলাম

১৯৪৪ বা কিছু আগে একদিন আকস্মিকভাবে আমার কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাসস্থানে সুকমলকান্তি ঘোষ এসে হাজির। পূর্বে পরিচয় ছিল না। পূজা সংখ্যায় অমৃত বাজার পত্রিকার জন্য ভাল ফোটোগ্রাফ চাই। একটা কাগজের স্বার্থে এবং তাকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করার অভিপ্রায়ে সুকমল ঘোষের এই উৎসাহ আমার বেশ ভাল লাগল। অমৃত বাজার পত্রিকায় গল্প লিখেছিলাম বোধহয় দুবার। তখন ওখানে আমার পরিচিত কেবলমাত্র ডকটর ধীরেন সেন, প্রফুল্ল মিত্র ও শচীন্দ্রলাল ঘোষ। এইবার চতুর্থ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হল।

ইতিমধ্যে 'নূতন পত্র' নামক মাসিকের প্রথম সংখ্যায় যে ভূমিকা লিখেছিলাম তা পড়ে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁর কৃষক নামক দৈনিকের সম্পাদক হতে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন, আর আমিও দৈনিকের সম্পাদনা বিষয়ে আমার যত রকম অক্ষমতা জানিয়ে এবং আমার নিজের বিরুদ্ধে নানা কৈফিয়ৎ খাড়া করে তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। এসব কথা বিস্তারিতভাবে বলেছি স্মৃতিচিত্রণে। নূতন পত্র মাসিকের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন বিধুশেখর ভট্টাচার্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, করালীকান্ত বিশ্বাস, ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী, সন্ধ্যা ভাদুড়ী, পঙ্কজকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ আমার পরিচিতের দলের। তাছাড়া আরো অনেক প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে আমার তখনও সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি। এঁদের মধ্যে বাণী রায় ও উমা রায় আছে। বাণীর সঙ্গে এই কাগজ উপলক্ষে এবং উমার সঙ্গে (আমার প্রতিবেশিনী হিসাবে) পরে পরিচয় হল।

বাণী নূতন পত্রের জন্য একটি খুব বড গল্প পাঠিয়েছিল। এই গল্পের সামান্য কিছু অসঙ্গতি নিয়ে আমাদের মধ্যে চিঠিতে আলোচনা হয়েছিল এবং বাণী শেষ পর্যন্ত আমার যুক্তি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে নূতন পত্র বন্ধ হয়ে গেছে। সে তার জুপিটার নামক কবিতার বই পাঠিয়েছিল আমাকে সমালোচনার জন্য। এই বইখানি পেয়ে আমি খুশি হয়েছিলাম তার

কবিতাগুলির নবতর স্বাদের জন্য। আমি যে সমালোচনা লিখেছিলাম, তার অংশ বিশেষ এই :

…ষোলটি কবিতার সমষ্টি কবিতাগুলি বিভিন্ন নামীয় হলেও মূল সুর এক। সবগুলো একসঙ্গে পড়লে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের সঙ্গে কবির যে সম্পর্কের কথা এককালে বলেছিলেন 'কবিরে যেথায় খুঁজিছ সেথা সে নাহিরে' সে কথার ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। এই কবিতাগুলোর মধ্যে কবি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছেন। বস্তুত ধরা দেওয়ার এই সাহসই হচ্ছে আধুনিক যুগের কবিধর্ম।…নিজেকে ধরা দিতে দিতেও একটুখানি সঙ্কোচ কোথাও রয়ে গেছে, কবি তাই প্রাচীন আর বিদেশী পৌরাণিক নামের আড়ালে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছেন। বিদেশী পৌরাণিক নাম এবং স্থান অথবা কাল কতখানি বাংলা হল, সে প্রশ্ন অন্তত এই কবিতাগুলো সম্পর্কে অবান্তর, পড়বার সময় কখনো মনে হয় না যে, বাংলা কবিতা পড়ছি না।…পরিবর্তে স্বদেশী নাম ব্যবহার করলে কবিতার উৎকর্ষ বাড়ত এমন মনে হয় না…শব্দ বা ছন্দের ঝঙ্কারে কবি তাঁর ব্যক্তিগত কথাকে নৈর্ব্যক্তিক করার চেষ্টা করেন নি বলে এর স্বাদ নতুন লাগল। কবি পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে প্রায় সম্বন্ধহীন। সমকাল থেকেও তাঁকে দূরে সরতে হয়েছে। বোধ হয় আরও এই কারণে যে, বর্তমান কাল থেকে দূরে না গেলে একান্ত নিজের কথা বলা চলে না। কিন্তু তবু সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারেন নি। (অগ্রহায়ণ, ১৩৫০)

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল।
হে ভারত, কী আমারে শিখায়েছ তুমি?
কই সে সংযম আর বৈরাগ্য আমার।

এই রকম দু' একটা মুহূর্তে কবির একান্ত 'আমি' বহুবচনে, অর্থাৎ 'আমরা'য় রূপান্তরিত হতে পারে।…

এই পত্রিকার জন্য বাণীর 'ঈর্ষা' নামক যে দু'পাতার একটি ছোট গল্প ছেপেছিলাম তার মধ্যে বাণীর অসাধারণ শক্তির প্রকাশ আমি অনুভব করেছি। গল্পটি আজও আমি ভুলিনি।

সুকমলকান্তি ঘোষের কথা বলছিলাম। তার ফোটোগ্রাফ সংগ্রহের ব্যাপারে ঐখানেই আমার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ নয়। কয়েক বছর পরে যখন যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত হই (১৯৪৫), তখন সুকমল আমাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকবার শহরের নানা স্থানে যেখানে ভাল ফোটোগ্রাফের বা পেন্টিংএর সন্ধান, সেখানেই গিয়ে দরজায় কড়া নেড়েছে। বালীগঞ্জে গোপাল ঘোষের

বাড়িও গিয়েছি, সুকমলের এই যে ভাল ফোটোগ্রাফ বা পেন্টিং সংগ্রহের আগ্রহ এটা শুধুই নিয়ম মাফিক কাগজকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যে নয়। তার মনের মধ্যে, হয়তো তার অজ্ঞাতসারেই, একটা সৌন্দর্যপ্রীতি ও সৌন্দর্যের প্রবল আকর্ষণ বাসা বেঁধে আছে। এর প্রমাণ পরে অনেক বিষয়েই পেয়েছি। আমার প্রতি তার একটা প্রীতির সম্পর্ক সম্ভবত আমার ক্যামেরা প্রীতির জন্যই গড়ে উঠেছিল, তার আরো কারণ সুকমল নিজেও বহুদিন আগে থেকেই ক্যামেরা ধরেছিল। আমাদের এই প্রীতি ঐ সমধর্মীর প্রীতি। আমি আমার 'আধুনিক আলোকচিত্রণ' (১৯৫১) নামক বড় বইখানা সুকমলের নামেই উৎসর্গ করেছিলাম, এই বিশ্বাসে যে, সে আমার ক্যামেরা-কর্মকে উভয়ের অপরিচয়ের অবস্থাতেও পছন্দ করে আমার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছিল। এ ঘটনা আমি ভুলিনি।

তারপর সে গ্রন্থম্ নামক এক প্রকাশনী আরম্ভ করে আমার স্মৃতিচিত্রণ, স্কুলের মেয়েরা ও রোল নম্বর ২০৫ প্রকাশ করেছিল।

১৯৫৭ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর হঠাৎ আমেরিকা থেকে লেখা তার এক চিঠি পেয়ে বুঝলাম টানটা তার লুপ্ত হয়নি। তার চিঠির কাগজের শিরে ছাপা ছিল "কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ইন দি সিটি অভ নিউ ইয়র্ক আমেরিকান প্রেস ইনস্টিট্যুট।" এই চিঠিতেও যাবার পথে সুইজারল্যাণ্ড ফ্রান্স ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের সৌন্দর্যের কথাই বেশি। সৌন্দর্যের বিস্ময়। সুকমলের মধ্যে যে শিল্পী বাস করছে তার প্রকাশের পথটা সে সোজাভাবে পায়নি। গৌণভাবে পেয়েছে। বর্তমানে সে যুগান্তর সম্পাদক, অতএব এখন বোধ হয় রাজনীতি চিন্তা করতে হয় বেশি। সেখানে সৃষ্টিধর্মী শিল্পমানসের স্থান খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না।

অনেকটা পথ চলে এসেছি মূল পথ ছেড়ে। আবার ফিরে যাই ১৯৪৩ সনে। নূতন পত্র উপলক্ষে আর এক কবিকে আহ্বান করা গেল। তার নাম সন্ধ্যা ভাদুড়ী। তখনও সে ডি-ফিল হয়নি, কিন্তু সে যে, কবিতা লিখত তা জানা ছিল। উমা রায়ের মতো সেও ছিল প্রায় প্রতিবেশিনী। চাইলাম নূতন পত্রের জন্য কবিতা। 'মিছিল' ছিল তার কবিতার নাম। ভারী সুন্দর একটি সুর লেগেছিল তার ছন্দে। দ্রষ্টার চোখে সমস্ত দিনের মিছিল। চলতি পথের দেখা এই মিছিল। এই মিছিলে কত কি চলেছে একের পর

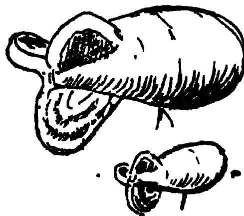
এক। এ মিছিলে দুর্ভিক্ষের ছায়াও আছে—(মাঝখান থেকে উদ্ধৃত করছি)।

ক্ষণজনতার বিরাট বাহিনী
নগরের পথপাশে
বিরামবিহীন চলিয়াছে সারি সারি,
ঝলমল সাজে কেহ চলে যায়
কেহ বা ছিন্নবাসে,
কারো হাসি-মুখ কাহারো নয়নে বারি।
কঙ্কালসার ভিখারী ছেলের
সকরুণ আবেদন
কণ্ঠ ছাড়ায়ে যায় নাকো বেশি দূর।
সপ্তবলভী প্রাসাদের গীতি
তারে ঢাকে অনুখন,
বেতার যন্ত্রে বাজে বেহাগের সুর।…

সব শেষে নিরেট অন্ধকার ভিড় করে আসে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যতের পথ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। কবিতার এই বেদনার সুর এ সময়ে আপনা থেকেই এসে গেছে কবির মনে।

॥ নয় ॥

যুদ্ধ উপলক্ষে কলকাতার চেহারাই আর এক রকম হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সমস্ত বাড়ির সামনে 'ব্যাফল ওয়াল'—সামনে বোমা পড়লে যাতে ঝাপটা না লাগে। এখনো ব্যাফল ওয়াল কিছু কিছু আছে সরকারী অফিস পাড়ায়। যেখানে সম্ভব সেখানেই স্লিট ট্রেঞ্চ। তার মানে, লম্বা গর্ত, যাতে সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে পথচারীরা সেই গর্তে গিয়ে ঢুকতে পারে। অনেক বাড়ির ছাতে বালির বস্তার আবরণ। এও ঠিক ঐ বোমার হাত থেকে কিছু পরিমাণ রক্ষা পাবার জন্য, বিশেষ করে আগুনে বোমার হাত থেকে। এর পর সমস্ত ময়দান জুড়ে অ্যানডারসন শেলটার। এস্কিমোদের ইগলু বা বরফের ঘরের মতো—শুধু তাদের মতো গোল নয়, লম্বা। সোজা কথায় একটি পিপে লম্বালম্বি দুভাগ করে চিরে দুটো অংশ উপুড় করে রাখলে যেমন হয়। তবে চার-পাঁচজন লোক যাতে তার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে আশ্রয় নিতে পারে, এই শেলটার ততটা লম্বা। আকাশের চেহারারও বদল ঘটেছিল নানা স্থানে—বিশেষ করে হাওড়া ব্রিজ অঞ্চলে। সেখানে আকাশে অনেক ব্যারাজ বেলুন শূন্যে ভেসে থাকত, নিচে থেকে অবশ্য তাদের বেঁধে রাখার ব্যবস্থা ছিল। আকাশ থেকে যেসব ভারী বোমা ফেলা হয়, সেই বোমা যদি ভীষণ মোটা আর দীর্ঘ হত তাহলে যেমন দেখতে হত,



ব্যারাজ বেলুন

এই ব্যারাজ বেলুনগুলিও ছিল তেমনি দেখতে। শত্রু বিমানের ডাইভ বমিং ঠেকিয়ে দেওয়াই ছিল এদের উদ্দেশ্য।

ময়দানের অ্যানডারসন শেলটার অথবা যত্রতত্র স্লিট ট্রেঞ্চ দেখে সব

সময়েই মনে হত আমরা বোধ হয় এখন আবার আমাদের আদিম অবস্থাতেই ফিরে যাচ্ছি, গুহা গহ্বরের আদি বাসস্থানে। সভ্যতা আমাদের এখন থেকেই গর্তে ঢুকিয়ে সেই অভ্যাস পাকা করে দিচ্ছে। কৌতুকজনক (আসলে কৌতুকজনক নয়) কল্পনাও করেছি সে সময়। ভেবেছি জগদীশ-চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় হয়তো ময়দানের মাঝখান দিয়ে মোটরে চলছেন, এমন সময় শত্রু-আক্রমণের সাইরেন বেজে উঠল! তিনজনে তখন গাড়ি থামিয়ে ছুটে গিয়ে যিনি যে শেলটারে পারলেন আশ্রয় নিলেন। আধ ঘণ্টা পরে 'অল ক্লিয়ার' বাজল। তখন সেই শেলটারের একটি থেকে রবীন্দ্রনাথের মাথা বেরিয়ে এলো। শেলটার তো উঁচু বেশি নয়। চার হাত পায়ে পশুর মতো ভঙ্গিতে ঢুকতে হয় এবং বেরুতে



জগদীশ, প্রফুল্ল তোমরা কোথা

হয়। ওদিকে জগদীশচন্দ্রও ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুচ্ছেন। প্রফুল্লচন্দ্র ক্ষীণকায়, তিনি আগেই বেরিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র বললেন, প্রফুল্ল, বল তো এ পাপ থেকে কবে বাঁচা যাবে? প্রফুল্লচন্দ্র বললেন, পশুর রাজত্ব আরম্ভ হয়েছে, আমাদেরও পশু বানাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমার কোনো অসুবিধা হয় নি। আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করে এতক্ষণ গুন গুন করে একটি রবীন্দ্রসংগীত গাইছিলাম, "দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও, আমার দিকে ও মুখ ফিরাও।" বুঝলে জগদীশ, সব অবস্থাতেই রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যায়।

এই জাতীয় কল্পনা করেছি এবং এ রকম কিছু লিখেওছি সে সময়।

এখন ভাবি, এ যুদ্ধও অনেক ভাল ছিল, পরবর্তী যুদ্ধে জলস্থল আকাশ বাতাস সমস্ত বিষে ভরে উঠবে—মানুষ বা অন্য প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। এ সবই বিজ্ঞানীদের কথা—যে বিজ্ঞানীরা নরহত্যার জন্য মারাত্মক জীবাণুর ভাণ্ডার গড়ছেন, বিষাক্ত গ্যাসের ভাণ্ডার গড়ছেন, হাইড্রোজেন বোমার ভাণ্ডার গড়ছেন, এ তাঁদেরই কথা।

জীবনে এঁদের প্রভাব কম নয়। যেমন এই জাতীয় চিন্তা মনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে, মুক্তি দেয় না আনন্দের আকাশে, তেমনি এর বিপরীত প্রভাবও যথেষ্ট আছে অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকে। ভবিষ্যৎ চিন্তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা খুব কঠিন নয়, যদি একথা বিশ্বাস করা যায় যে, অব্যবহিত বর্তমানকেও যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে জীবনকে সার্থক করতে হলে। আমার একটি সুবিধা এই যে, বহু জিনিসকে আমি উলটো করে দেখতেও শিখেছি, তাই ট্র্যাজিডিকে কমিক দৃষ্টিতে দেখা আমাব পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। এ আমার অহঙ্কার নয় মোটেই, ভিতর থেকেই এটা অনুভব করি। হাল্কা কমিক দৃষ্টিভঙ্গি আমার বেদনামযতার সঙ্গে পাশাপাশি আছে, কিন্তু আমার দৃষ্টি আরো গভীরে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন যে ব্যক্তিটি, তাঁর নাম চার্লি চ্যাপলিন। তাঁর প্রথম যুগের ছোট ছোট ছবিতে দারুণ হাল্কা কৌতুকের ভিতরে ভিতরে, ভবিষ্যতে তা কেমন চেহারা নেবে, তার আভাস মাত্র ছিল, এবং সে আভাস যে প্রচ্ছন্ন ছিল, আমি তখন তা বুঝতে পারি নি।

প্রথম যুগের চার্লি ইন ডগ'স লাইফ নামটা মনে আছে। আব একটা মনে আছে—পে ডে। আরো দু একটির টুকরো দৃশ্য কিছু কিছু মনে পড়ে কিন্তু নাম মনে পড়ে না। সবই উদ্দাম হাসির ব্যাপার। ভবঘুরে দরিদ্র মানুষটি সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে বিজয়ীর ভূমিকা নিয়ে চলেছে, এ এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। যেখানে সে আমাদের চোখে পরাজিত, সেখানেও সে সকল দুঃখকে অগ্রাহ্য করে, এবং তার প্রতি উদাসীন থেকে, বিজয়ী।

এর পর মহৎ চার্লিকে পেলাম কিড নামক ছবিতে। পরে কত ছবি দেখলাম। গোলড রাশ, সার্কাস, পিলগ্রিম, মডার্ন টাইমস, সিটি লাইটস এবং এ সবের মধ্যে যা পেয়েছি তা ভাষায় বুঝিয়ে বলা বড়ই কঠিন। চার্লি একটা নেশার মতো আমাকে বার বার তাঁর ছবির প্রতি আকর্ষণ

করেছেন। এবং যদিও গ্রেট ডিকটেটর অনিবার্য কারণে দেখা হয় নি, তবু ম'সিয়ো ভেরদু আমি ইচ্ছে করেই দেখি নি, এবং অন্যায় করেছি এখন বুঝতে পারি। মনের গোঁড়ামি। পাছে অন্য বেশে আমার মনজোড়া ট্র্যাম্পটি আর না থাকে। অন্য চেহারায় তাই চার্লিকে আমি দেখতে চাইনি। এবং পরে লাইম লাইটও দেখব না ভেবেছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম এ ছবিতে আসল চার্লিরও আভাস দেখা যাবে, তখনই দেখে নিয়েছি। গোলড রাশ ও সিটি লাইটস অনেকবার দেখেছি, এবং প্রতিবারেই ভাল লেগেছে। অনেকবার দেখার আর এক উদ্দেশ্য, চার্লি চ্যাপলিনের ছবিগঠনের কৌশল ভাল করে লক্ষ্য করা।

কোন্ মানসিক গঠনে দারিদ্র্যকে তুচ্ছ করা যায়—এই শিক্ষার জন্য আমি যাঁদের কাছে ঋণী তাঁদের মধ্যে চার্লি অন্যতম এবং নিঃসন্দেহে প্রধানতম।

সম্পাদনাকালের বহু আগে থাকতে, স্কুল জীবন থেকেই সাধারণভাবে কৌতুকের দিকে একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যে কৌতুক বুদ্ধিকে চমক লাগায়, তার প্রতি ছিল অদম্য আকর্ষণ। ১৯১৫-১৬ সনে যখন ইণ্টার-মীডিয়েট পড়ি, সে সময় পাবনা শহরে প্রথম দেখি যাদুকর গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিকের খেলা। বুদ্ধিকে চমক লাগিয়ে ধাক্কা মেরে এই কৌতুকের আবির্ভাব ঘটেছিল। অন্যের মনে এ ম্যাজিকের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল জানি না, কিন্তু আমার কাছে তখন এই ম্যাজিক মস্ত বড় একটা বুদ্ধি-ভিত্তিক কৌতুক রূপেই দেখা দিয়েছিল, বিস্ময় রূপে তো বটেই। চোখের সামনে সত্য হঠাৎ মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে, মিথ্যা আচম্বিতে সত্য হয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে বড কৌতুক আর কি আছে? আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম সেই প্রায় বালক বয়সে। পল্লীজীবনে অভ্যস্ত পল্লীর অল্প অভিজ্ঞতার চোখে এবং বেদেনীদের ভানুমতীর খেলা দেখার চোখে গণপতির ম্যাজিক অবশ্যই এক স্মরণীয় ঘটনা। তাছাড়া গণপতি ছিলেন কথার কৌতুক সৃষ্টিতেও ওস্তাদ। এই ম্যাজিকের প্রভাব আমার জীবনে কম ছিল না। সহসা বুদ্ধিবৃত্তিকে ধাক্কা মেরে কাত করে ফেলাই হচ্ছে কৌতুকের কাজ। ট্র্যাজিডিতেও তাই হয়, এবং এ দুয়ের অবস্থান অতি ঘনিষ্ঠ, মাঝখানে একটি মাত্র পার্চমেণ্টের পারটিশন। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে অসমোসিস

(osmosis) বলে, দুদিকের দুই আপাত বিপরীত ট্র্যাজিডি-কমেডি সব সময় ঠিক সেই অসমোসিসের পদ্ধতিতে পরস্পর ভার সাম্য স্থাপন করছে ঐ পারটিশনের ভিতর দিয়ে।

আমার জীবনের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক আছে, যেমন আছে আমার সাধারণ লেখক জীবনের সঙ্গে। অতএব এ প্রসঙ্গে আরো ভূমিকা দরকার। কারণ এর পরেই আমি নাম করব লিখিলচন্দ্র দাসের। এঁর কথা আগে কয়েকবার বলেছি। আমার সম্পাদনাজীবন আরম্ভ হয় (শনিবারের চিঠি থেকে) ১৯৩২ সনে। তখন ৫সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে ছিল আমার বাসস্থান ও অফিস। নভেম্বর মাসে সেখানে গিয়ে যোগ দিই। প্রায় তখন থেকেই নিখিল বাবুর সঙ্গে আমার জীবন ও আমার সম্পাদনা জীবন পাশাপাশি চলছে, অবসর গ্রহণের (১৯৬৪) পরেও চলছে। আমার চেয়ে তিনি সাত আট বছরের বড। তাঁর মধ্যে খুব নিকট দৃষ্টিতে আবিষ্কার করি কি কৌশলে অতি-গভীর ভাবের সঙ্গে অতি-কৌতুকপ্রিয়তা হাত ধরাধরি করে বাস করতে পারে।

আবিষ্কার করি, কিন্তু বিস্ময় কাটে না। বিশ্ব বিষয়ে, জাগতিক কার্য কারণ বিষয়ে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিষয়ে, বিশ্বের আবির্ভাব বিষয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে, শেক্সপীয়র বা কারলাইল বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে যে কোনো লোক মুগ্ধ হবেন, আবার সেই মুহূর্তে নলিনীকান্ত সরকার অথবা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবির্ভাব ঘটামাত্র তাঁদের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পডবেন। সে মুহূর্তে নিখিলবাবুর আর এক পরিচয়। এবং নিখিলবাবু কৌতুকে যেমন জ্ঞানহারা হয়ে যান, যে রকম জ্ঞানহারা হয় লোকে যে-কোনো পরম আনন্দের মুহূর্তে, অতীন্দ্রিয় ধ্যানে, যাকে বলে ট্রানসেনডেণ্টাল মেডিটেশন, তাইতে। যেমন লোকের বাহ্য জ্ঞান লোপ পায় যে-কোনো একস্টাটিক অনুভূতিতে, আবেগের হঠাৎ বিস্ফোরণে, এবং এমন অবস্থাতে সমস্ত দেহে (এবং মনেও) একটা spasm ঘটে। নিখিলবাবু সম্পর্কে এটি এমন আশ্চর্য সত্য যে, আমি আর কোনো মানুষের মধ্যে এমন পুনঃপুনঃ দীর্ঘ জীবনব্যাপী আবেগ-বিস্ফোরণ ঘটতে দেখিনি। সেজন্য তিনি আমার কাছে এমন চিত্ত-আকর্ষণকারী।

হঠাৎ-আবেগে এ রকম সবারই হতে পারে, এবং কোনো না কোনো

চরম রভস-মুহূর্ত প্রত্যেক মানুষেরই এটি সাধারণ অভিজ্ঞতা। রভস কথাটির নানা অর্থের সূক্ষ্ম ভেদ আছে, কিন্তু আমি বিশেষ একটি অর্থে ব্যবহার করছি। অভিধানে পাওয়া যাবে: "এত শীঘ্রতা যে, পূর্বাপর বা হিতাহিত বিচারের অপেক্ষা না রাখার ভাবদ্যোতক" (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)।

কিন্তু এক আশ্চর্য ব্যাপার, নিখিলবাবুর মধ্যে কৌতুকের প্রতিক্রিয়া অতি শান্তভাবে প্রকাশ হতেও দেখেছি, তবে মাত্র একবার। সেই ঘটনাটা আগে বলি। একদিন নিখিলবাবুর বেবি অস্টিনে চলছিলাম এসপ্ল্যানেড থেকে বাগবাজারের দিকে, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউএর পথে। স্টিয়ারিংধারী নিখিলবাবুর বাঁদিকে সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। আমি পিছনে বসে কি একটা হাসির কথা বলেছি। সুধাংশুর অবস্থা তখন শোচনীয়। সে বুঝতে পারছে এবারে তার পিঠে বা পাঁজরায় নিখিলবাবুর গুঁতো এসে লাগবে। এদিকে নিখিলবাবু বুঝতে পারছেন এই শত শত মোটরের ভিড়ের মধ্যে সুধাংশুর পিঠের দিকে নজর দিতে গেলে দুর্ঘটনা অনিবার্য। নিখিলবাবুর মনে কিছু সুবুদ্ধির উদয় হল। তিনি ঠিক করলেন গাড়ি ফুটপাথের ধারে থামিয়ে সুধাংশুর দেহের সুবিধাজনক কোনো স্থানে ঘুঁসি মেরে আবার গাড়ি চালালেই হবে। সেই উদ্দেশ্যে গাড়ি থামানো হল, সুধাংশুও বিপদ বুঝতে পেরে দরজা খুলে নেমেই পালাতে লাগল। নিখিলবাবু পিছনে ছুটলেন। তারপর সুধাংশুকে ধরে ফেলে, ঘুঁসি মেরে, দুজনেই নীরবে গাড়িতে ফিরে এলেন। এ রকম ধীব মস্তিষ্কের এবং ধীর গতির আবেগ-বিস্ফোরণ আপাতদৃষ্টিতে পবস্পর-বিরোধী অবশ্যই, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল নিখিলবাবুর মনে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা ঠিক বোমার বিস্ফোরণ নয়, তুবড়ি বাজির মতো আবেগ এবং তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে মন থেকে ছরছর ছরছর করে বেরিয়ে আসছিল। তাঁর মনের মধ্যে সম্ভবত এর জন্য নানা রকম ব্যবস্থা আছে। আবেগকে মুহূর্তে মুক্ত করা যেমন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, তেমনি আবেগকে অনেকখানি-কালের মধ্যে বিস্তার করেও দিতে পারেন তিনি—যেমন তিনি করেছেন শেষোক্ত ঐ ঘটনায়।

নিখিলবাবুর আবেগের গতিপথ সব সময় সরল রেখায় নয়। তার রিফ্র্যাকশন ঘটে অবস্থা বুঝে, পথ বেঁকে যায়। যেমন ঘুঁসি উদ্যত করে কাউকে গুঁতো মারতে গিয়ে যদি দেখেন তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবে তা

পাশের পরিচিত ব্যক্তির পিঠে বেঁকে গিয়ে মুক্তি লাভ করে। এইভাবে আলোর রশ্মি যেমন এক মাধ্যম থেকে ভিন্ন ঘনত্বের মাধ্যমে অসমকোণে যেতে কিছু বেঁকে যায়, নিখিলবাবুর আবেগ-রশ্মিও তেমনি আচরণ করে। আবেগের তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণটা বেশি ভয়ের। একবার তাঁর গাড়িতে তাঁর পাশে বসেছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, আমি যথারীতি পিছনে। সার্কুলার রোডের ঘটনা। আমি হাসিয়ে দিয়েছিলাম, নিখিলবাবু চলতি গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে নৃপেনের ডান হাত নিজের দু হাতে ধরে কামড়াতে লাগলেন। গাড়ি ফুটপাথে উঠে সাহিত্য পরিষৎ ভবনের গায়ে ধাক্কা মারার পূর্ব মুহূর্তে গাড়িটি না থামালে কি হত বলা যায় না। রিফ্র্যাকশনের কথা আগে বলেছি, খাঁটি রিফ্লেকশনের কথা বলি এবারে। পালিশ করা ধাতু বা কাঁচের বুকে আলোকরশ্মি সমকোণ রচনা করে গিয়ে পৌঁছলে তা কিছুমাত্র বেঁকে না গিয়ে সোজা আলোর উৎসেই ফিরে আসে। এমন ঘটনাও দেখেছি নিখিলবাবুর ক্ষেত্রে। মাত্র দুবার দেখেছি। সে রকম হলে অন্যকে না মেরে তখন নিজেকে মারেন।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে শনিবারের চিঠির অফিস। আমার সঙ্গে তখনও তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়নি। সে পরিচয় তখনও শুধু টমাস কারলাইলের সূত্রে আবদ্ধ আছে। এমন সময় একদিন তাঁকে বনফুলের 'জনার্দন জোয়ারদার' পড়ে শোনাতে গেলাম, কিন্তু ফলে তাঁর মধ্যে হঠাৎ কারলাইলের বিসর্জন বাজনা বেজে উঠল। আমি অল্প পরিচিত, তাই তিনি (পুরো সাহেবি পোশাক সত্ত্বেও।) হেসে মেঝেয় গড়াতে লাগলেন। এর পরদিন আবার এসে প্রস্তাব করলেন, আবার পড়ুন। আমিও এ জিনিস নতুন আবিষ্কার করে পরম উৎসাহের সঙ্গে আবার পড়লাম। দেখলাম ইতিমধ্যে বিসর্জনপ্রাপ্ত কারলাইলের নিমজ্জিত দেহ থেকে বুদবুদ উঠছে। শেষ নিশ্বাস ত্যাগের লক্ষণ। এটি ১৯৩২ সনের কথা।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটেছিল ওয়েলিংটন স্কয়ারে। নলিনীকান্ত সরকার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এসপ্ল্যানেডগামী ট্রামের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। নিখিলবাবু তাঁর বেবি অস্টিনে ঐ পথে যেতে দুজনকে দেখে এগিয়ে এসে গাড়ি থামালেন। তাঁরা গম্ভীরভাবের কথা বলছেন আর ঘন ঘন ট্রামের আগমন লক্ষ্য করছেন পিছনে তাকিয়ে। ট্রাম এসে থামল। যাত্রী নামা ওঠা

করল। ঘণ্টা বাজল, ট্রাম ছেড়ে দিল, ঠিক সেই মুহূর্তে নলিনীকান্ত সাংঘাতিক রকমের কোনো হাসির কথা বলেই দুজনে মিলে চলতি ট্রামে লাফিয়ে উঠে পড়লেন। নিখিলবাবুর মনে তাৎক্ষণিক আবেগ-বিস্ফোরণ ঘটে গেছে অথচ ঘুঁসি মারার মতো লোকের অভাব। অগত্যা তিনি এ কাজ করতে লাগলেন লোহার রেলিংএর উপর। নিজের মুঠোর চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।—সমকোণে বা রাইট-অ্যাংগলে প্রেরিত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে সোজা তাঁকেই এসে আঘাত করল। সমস্ত ঘটনাটা দুজনে চলন্ত ট্রাম থেকে সকৌতুক লক্ষ্য করতে লাগলেন। ১৯২৬ সনের ঘটনা। আমি নলিনীকান্তের মুখে শুনেছি এটি।

নিখিলচন্দ্র দাস এভাবে নিজের সমস্ত আনন্দ আবেগ বাইরে অবস্থিত মানুষ বা আসবাবপত্রের উপর ছুঁড়ে মেরে নিজেকে হাল্কা করে ফেলেন। বহু দুঃখ বেদনাও নিশ্চয় ঐ সঙ্গে মন থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, নিজে তখন একটা প্রচণ্ড মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে থাকেন। এবং তা শুধু তাঁর একার আনন্দ নয়, আমরাও তাঁর সঙ্গে উল্লসিত বোধ করে এক জাতীয় মুক্তির আনন্দ উপভোগ করি। আমি তাঁর বিষয়ে এ জাতীয় ঘটনা অন্তত শতাধিক জানি।

কিছুদিন আগে ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত টেলিফোনে আমাকে বলেছিলেন তিনি মাসিক বসুমতীতে আমার কনফেশনস পড়ছেন। ভেবে দেখলাম ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে। উৎসাহিত বোধ করে এই অধ্যায়টা পুরোপুরিই কনফেশনে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি। আমার পরবর্তী লেখক জীবনে যাঁদের প্রভাব আমার মনে প্রবলভাবে অনুভব করেছি, তাঁদের অনেকের কথাই ইতিমধ্যে বলা হয়ে গেছে, এবং এ অধ্যায়ে চার্লি চ্যাপলিনকে নতুন করে এবং নিখিলচন্দ্র দাসের কথা অনেকটা বিস্তারিতভাবে বলা হল। আরো যেসব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বারনার্ড শ, স্টিফেন লীকক, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, বনফুল, শিবদাস বসুমল্লিক, অসকার ওয়াইলড, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, নলিনীকান্ত সরকার ও একটি হনুমানের কথা প্রথমেই মনে পড়ছে।

আমি চার্লি চ্যাপলিন থেকে আরম্ভ করে পরে যাঁদের নাম করলাম তাঁরা সবাই আমার কল্পনার এক একটা সীমা একের পর এক ভেঙে দিয়ে

বেপরোয়াভাবে কল্পনাকে প্রচলিত আইন অমান্যের দিকে ঠেলে দিয়ে গেছেন। বাল্যকালের নানা প্রভাবের কথা এখানে অনুক্ত রইল।

স্টিফেন লীকক বললেন, বহু কষ্টের অর্জিত কলেজে-পড়া বিদ্যা শেষ পর্যন্ত আমাদের যা মনে থাকে তা দশখানা ফুলসক্যাপ শীটে ধরে। বললেন, Every man has somewhere in the back of his head the wreck of a thing which he calls his education. এবং তিনি যে, ম্যানুয়েল অভ এডুকেশন নামে (ছয় বৎসরের শিক্ষার পরিণাম কি, সে বিষয়ে) ছোট বই একখানা তৈরির কল্পনা করছেন, তার নমুনা দিয়েছেন এইভাবে—যেমন জুলিয়াস সীজার সম্বন্ধে: A famous Roman general, the last who ever landed in Britain without being stopped at the custom house.

এইভাবে তাঁর ম্যানুয়েল অভ এডুকেশনের নমুনা চলল সব বিষয়ে। অঙ্কের এ-বি-সিকে তিনটি শ্রমিক কল্পনা করে তিনটি চরিত্রকে এমন সুন্দর-ভাবে ফুটিয়েছেন, যা পড়লে মনে চমক লাগে। সি সবচেয়ে দুর্বল, তাই তার প্রতি লেখকের কত করুণা। তারপর শিক্ষাকে মুখরোচক করার যে পরিকল্পনা তিনি করেছেন তার তুলনা কোথায়? তিনি আনন্দের ভিতর দিয়ে—সোজা কথায় কাব্যের ভিতর দিয়ে, ট্রিগনোমেট্রি শেখাবার যা কৌশল করেছেন তার মৌলিকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুক আমাকে অভিভূত করেছিল। এটি লর্ড আলিন'স ডটার নামক কবিতার প্রসঙ্গে। নমুনা—

[Introduction: A party of three persons, a Scotch nobleman, a young lady and an elderly boatman, stand on the banks of a river (R), which, for private reasons they desire to cross. Their only means of transport is a boat, of which the boatman, if squared, is able to row at a rate proportional to the square of the distance. The boat however has a leak (S), through which a quantity of water passes sufficient to sink it after traversing an indeterminate distance (D), Given the square of the boatman and

the mean situation of all concerned, to find whether the boat will pass the river safely or sink.]

লীকক বলছেন, কাব্যের সঙ্গে অঙ্কের এই মিশ্রণে কাব্যও নষ্ট হল না, অঙ্কেরও রোমান্স বজায় রইল। যেমন—

A chieftain to the Highlands bound
Cried, "Boatman, do not tarry.
And I will give you a silver pound
To row me o'er the ferry."
Before them raged the angry tide
$X^2 + Y$ from side to side.

—ইত্যাদি

মূল কবিতাটি আগে পড়া থাকলে যে আনন্দ পাওয়া যাবে, পড়া না থাকলেও তার অপেক্ষা কিছু কম আনন্দ পাওয়া যাবে না।

জ্যামিতিকে ছাত্রজনপ্রিয় করার পরিকল্পনাটিও চমৎকার। লীকক বলছেন।

A perpendicular is let fall on a line BC so as to bisect it at the point C, etc. etc.

যেন পৃথিবীতে এটা একটা অতি সাধারণ ঘটনা। খবরের কাগজের প্রত্যেকটি কর্মী এটি দেখামাত্র বলবেন ওভাবে বলা ঠিক হয় নি। বলা উচিত ছিল এইভাবে—

AWFUL CATASTROPHE
Perpendicular Falls Headlong
on a Given Point
The Line at C said to be
completely bisected
President of the Line makes Statement etc., etc.

খবরের কাগজের উত্তেজনার যুগে জ্যামিতিকেও উত্তেজনাপূর্ণ এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনারূপে প্রচার করলে তবে তো সবাই এদিকে আকৃষ্ট হবে। লীককের বৈশিষ্ট্য, যে-কোনো বিষয় নিয়ে মারাত্মক কৌতুক

সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা। এ বিষয়ে তাঁর জুড়ি নেই। সবই অবশ্য বিশুদ্ধ কৌতুক নয়, অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ ও কৌতুক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁর "If Gandhi Habit Spreads" নামক কৌতুক রচনা অবিস্মরণীয়। রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গান্ধী এসেছেন কৌপিন পরিধান করে। এর ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক হতে পারে অবশ্যই। What if the other politicians of the world follow suit—follow Gandhi's suit? Suit কথাটি এখানে দুটি অর্থেই ব্যবহৃত—এর বাংলা হয় না। লীকক বলছেন: কনফারেন্সে একজন রক্ষণশীল দলের পীয়ার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্রিটিশ খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তি প্রকাশ করে বললেন—"এঁর বিরোধিতা করা আমাদের সাধ্য নয়। এঁকে আমরা কি শেখাব, ইনিই আমাদের শেখাতে পারেন, এবং তা তিনি জানেন।" বলা হয়েছে, গান্ধী এখন তাঁর নিজের শর্তেই আমাদের উপর চাপাতে পারেন, অন্যথা তিনি কনফারেন্স হলে তাঁর ছাগলের দুধ ঢেলে ফেলবেন। তা যদি হয় তাহলে আমরা ভারত ছাড়তে বাধ্য।

এর পরেই যে সংবাদটি দেওয়া হয়েছে, তার মূল ইংরেজি কথাগুলিই উদ্ধৃত করছি: এর শিরোনাম 'স্নোডেন গোজ ওয়ান বেটার'—অর্থাৎ স্নোডেন এক কাঠি উপরে গেছেন। অর্থাৎ গান্ধী-আচরণ ইতিমধ্যেই বিলেতে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছে এটি তারই কল্পিত দৃষ্টান্ত।—

England has been saved from the sudden and overwhelming crisis into which the country was plunged by Mahatma Gandhi. To the wild delight of the supporters of the National Government, the Chancellor, Philip Snowden, appeared on the second morning of the India Conference wearing nothing except spectacles, sandals and a Lancashire bath towel. Snowden, it was seen at once, has a daintier figure than Gandhi, with better arms and a cute little neck and shoulders. His skin is exeellent and excited every poultry-fancier. Snowden carried a beautiful Hampshire cabbage which is all that he proposes to eat during

the deliberations. "He has entirely thrown Gandhi's spinning wheel into the shade...

সব মিলিয়ে লীককের বেশ খানিকটা পরিচয় দিলাম, কারণ এই লেখক আমাদের দেশের পাঠকদের কাছে খুব ব্যাপক ভাবে পরিচিত নন। এঁর গল্পের প্লটও এমন অভিনব, এমন কৌতুকপূর্ণ এবং অনেক স্থলে ব্যঙ্গপূর্ণ যে, তা যে-কোনো ইনটেলেকচুয়াল পাঠককে আকৃষ্ট না করে পারে না। লীকক প্রচুর লিখেছেন, এবং তিনি ছিলেন পলিটিক্যাল ফিলসফির নামকরা অধ্যাপক। এঁর রচনায় আমি অভিভূত একথা স্বীকার করছি।

আমার কনফেশন এদিক থেকে আরো কিছু পূর্ণাঙ্গ করতে হলে অন্য যাঁদের নাম করেছি, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথাও বলা দরকার। প্রথমেই মনে আসছে ডাক্তার বনবিহারী মুখুজ্জের কথা। সমাজের বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইনি তাঁর উপন্যাসে, গল্পে, কবিতায় ও কারটুন ছবিতে বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়েছেন। তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা, প্রকাশের আন্তরিকতা ও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা সব ক্ষেত্রেই সমান। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, তাঁর আদর্শ ও আচরণের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। তাঁর মধ্যে ভণ্ডামি ছিল না, কোনো দিকে লোলুপতা বা লোভ ছিল না, এবং যতদূর সম্ভব তিনি মধ্য বয়স থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে গেছেন। এবং শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন আত্মনির্ভর। মনে যেমন ছিল তাঁর শক্তি, আচরণে তেমনি ছিল এক অনমনীয় কঠোরতা। আমার প্রতি তাঁর ব্যবহারে আমি অভিভূত হয়েছিলাম যেমন হয়েছিলাম তাঁর গল্প উপন্যাস কবিতা ও ব্যঙ্গচিত্রে। এঁর কথা আমি আমার পূর্বের চারখানা স্মৃতিকথাতেই বলেছি, এবং 'আমি যাঁদের দেখেছি' নামক আমার তৃতীয় স্মৃতিগ্রন্থে বড় একটি অধ্যায় লিখেছি। তাঁর লেখা পড়ে আমি অনেক সময় নির্ভীকভাবে নিজের মত প্রকাশে প্রেরণা পেয়েছি।

চার্লি চ্যাপলিনের কথা আগে বলেছি। তিনি চার্লিরূপে দুনিয়ার যত দুঃখ অভাব বেদনা সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে, কখনো বা ব্যঙ্গ করে, এবং যাবতীয় বিপদকে বিপদ জ্ঞান না করে, নির্ভীকভাবে এগিয়ে গেছেন। চার্লি বাল্যকালে চরম দারিদ্র্য ভোগ করেছেন, এবং পরজীবনে প্রচুর ধন উপার্জন করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রায় সকল অভিনয়েই তিনি চির দরিদ্রের

ভূমিকাই নিয়েছেন, এবং পৃথিবীর যাবতীয় অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবং যেখানে তিনি ধনীর ভূমিকায় নেমেছেন সেখানে তিনি



'ঈজি স্ট্রীট' ফিলমে চার্লির একটি ভঙ্গি

ধনীকে ব্যঙ্গ করেছেন। এই জিনিসের প্রতিচ্ছবি দেখেছি আমি শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের জীবনে। ইনি অভিনয় করেননি, কিন্তু এক আশ্চর্য মনোবল, অনমনীয় ঋজুতা এবং দারিদ্র্যের প্রতি কঠিন উদাসীনতার দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন। সমস্ত জীবন দুঃখ বেদনা অভাবকে সরল হাসির আঘাতে চূর্ণ করেছেন। ধনীর অনুগ্রহকে তুচ্ছ করে ধনীর মাথা তাঁর পায়ে নত করিয়েছেন। নিজে তাঁর সঙ্গ পেয়ে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেছি, তাঁর চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছি, তবু কোথায় যেন তিনি অতি অন্তরঙ্গ হয়েও অতি উর্ধ্বে থেকে গেছেন, সেখানে বিশ্লেষণী শক্তি পৌঁছয় না। 'আমি যাঁদের দেখেছি' পুস্তকে এঁর বিষয়ে বড় একটি অধ্যায়ে অনেক কথা বলেছি। শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের যে জীবনদর্শন, চার্লি চ্যাপলিন ট্র্যাম্প রূপে প্রায় সেই একই জীবনদর্শন অতি বিরাট ব্যাপক ও মহৎ রূপে আমাদের সামনে ধরেছেন।

যখন সম্পাদক ছিলাম

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের সঙ্গে নাম করব আমি নলিনীকান্ত সরকারের। নলিনীকান্তই শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের কথা প্রথম জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন। তাঁর বইয়ের নাম দাদাঠাকুর। আমি তাঁর 'হাসির অন্তরালে' নামক বইখানিকে বিশেষ মূল্যবান মনে করি। এ বইতে নলিনীকান্তের জীবনের অনেক সাধারণ দুঃখ ও নানা-ঘটনা-চক্রে-বিপন্ন হওয়ার সংবাদগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যা পড়লে বড়ই কৌতুককর বোধ হবে। এ তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সম্ভব হয়েছে। কৌতুকপ্রিয়তা ও শব্দ নিয়ে খেলা এ দুটি বিষয়েই শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ও নলিনীকান্ত সমধর্মী। কিন্তু হাসির অন্তরালের ঘটনাগুলি কথার খেলা নয়, জীবনের সব দুরবস্থার ঘটনা নিয়ে খেলা। এই যে নিজেকে বাড়িয়ে না দেখে, বা না দেখিয়ে, নিজের দুঃখ দুর্দশাকে হাস্য-কৌতুকের উপকরণ করা, এ একটি বিশেষ মানস ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। চার্লি চ্যাপলিন, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ও নলিনীকান্ত সরকার পরস্পর দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা বলা চলে। এঁদের বাইরের প্রকাশ যতই পৃথক হোক, তার পরিধি যতই ছোটয় বড়য় ভিন্ন রকম হোক, এঁদের চরিত্রের যে দিকটা ক্লাউনের, সে দিকে তিনজনের আত্মীয়তা আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

নলিনীকান্তকে একবার এক আসরে ঘড়াঞ্চের (স্টেপ-ল্যাডার) অল্প পরিসর স্থানে উঠে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে হয়েছিল। যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পায় এই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। আসরে প্রচুর আসন অথচ কেউ নেই, সেই অবস্থায় একা স্টেপ-ল্যাডারের উচ্চতায় বসে গান গাওয়া, কি করুণ! উদ্যোক্তারা বলেছিলেন গান না গাইলে কেউ আসবে না। কথাটা সত্যি। ঐ অবস্থায় গান গাইতে গাইতে তবে আসর পূর্ণ হয়েছিল। শ্মশানে একা বসে সাধকদের গান গাওয়ার কথা শুনেছি, কিন্তু শূন্যতার শ্মশানে স্টেপ-ল্যাডারে বসে গান-গাওয়া এই প্রথম। আর একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল রামপুরহাটে। সেখানে তিনি ছাত্রদের নিমন্ত্রণে এক আসরে গান শোনাতে গিয়েছিলেন। আসরে একজন প্রবীণ লোকও ছিলেন। তারপর কি হল, নলিনীকান্তের ভাষাতেই বলি। বয়স্কদের একজন গানের আগে প্রশ্ন করলেন:

আপনি কি গান গাইবেন?

সাধারণ বাংলা গান।

কীর্তন জানেন, পদাবলী?

জানি দুচারখানা।

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নীলকণ্ঠ?

কিছু জানি।

ভদ্রলোকের মনোগত ভাব বুঝতে পারলাম। তিনি ভক্তিমূলক গান শুনতে চান। তাঁকে বললাম রজনী সেনের গান শুনবেন? অনেক গান জানি তাঁর।

শোনামাত্র তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আহা, রজনী সেনের গান—সত্যিকার ভক্তের গান। 'কেন বঞ্চিত হব চরণে'—এ গানের জোড়া আছে?—বলেই ভদ্রলোক ঘরের ভিতরকার (দক্ষিণের) দেওয়ালের দিকে তর্জনী সঙ্কেত করে বললেন, আপনি এঁর গান জানেন না?

দেওয়ালের ঠিক সেইখানে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। আমার মনে হল ভদ্রলোক বোধহয় তাঁরই গানের কথা বলছেন। চিন্তিত হয়ে পড়লাম—কে এই কবিটি যাঁর গান আমার জানা উচিত ছিল?—বললাম, আপনি কার কথা বলছেন?

বুঝতে পারেননি? আরে মশায়, আমাদের ঐ শান্তিনিকেতনের তাঁর কথা?

তাঁকে বললাম, রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বলছেন আপনি? শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত?

না মশায়, ও থাক। ও তো গান নয়, ও হচ্ছে পোঁযাব কুণ্ডলী। আপনি রজনী সেনের গানই করুন।

আমার মাথায় দুষ্ট সরস্বতী জাগ্রত হলেন। প্রথমেই আরম্ভ করলাম 'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু' গানটি। দেখতে পাচ্ছিলাম, চক্ষু দুটি মুদ্রিত করে ভদ্রলোক যেন গানের দেবতাকে ধ্যান করছেন। গাওয়া শেষ হতেই তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। তিনি উচ্ছ্বাস ভরে বললেন, আহা, রজনী সেন কি জিনিষই দিয়ে গেছেন।

প্রথম ডোজের সাফল্য দেখে আর একটি ডোজ প্রয়োগের ইচ্ছা হল। দ্বিতীয় গান ধরলাম 'ওহে জীবন বল্লভ সাধন দুর্লভ' কীর্তনটি। এবারেও তিনি ধ্যানস্থ হয়ে গানটি শুনছেন। গানটির একটি কলি গাইবার সময় দেখি, তাঁর মুদ্রিত দুটি চক্ষুর কোণ থেকে অশ্রুধারা নির্গলিত হচ্ছে। গানটি শেষ হলে তিনি বললেন, আহা, এ গানের কি তুলনা আছে?

এবারে আমাকে কপটতা পরিহার করতেই হল। তাঁকে বললাম, কিন্তু একটু অন্যায় করে ফেলেছি যে।

—পরপর যে দুটি গান গাইলাম, দুটিই রবীন্দ্রনাথের।

ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বলেন কি, এ গান রবিবাবুর? তাঁর এ রকম গান আর জানেন আপনি? গান তো?

রবীন্দ্রনাথের যে কটি ভক্তিমূলক গান আমার জানা ছিল, একে একে গাইলাম। রবীন্দ্রনাথের গানেই আসর ভাঙল।

'হাসির অন্তরালে' বইতে এ রকম ঘটনা অনেক আছে, কিন্তু দুর্ভোগের গল্পই বেশি. যদিও সবই প্রায় কৌতুকের আবরণে ঢাকা।

কিন্তু কৌতুক নেই শেষ অধ্যায়ে। সেখানে তাঁর আসল বেদনাময় জীবনের একটি অধ্যায় সরল ভাবেই বলেছেন, এবং সেখানে কোনো অন্তরাল নেই। এমন একটি সময় তাঁর জীবনে এসেছে যখন তিনি তিন দিন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটিয়েও হাসির গান গেয়ে শ্রোতাকুলকে আনন্দ দিয়েছেন। হঠাৎ মনে পড়ে যায় লাইম লাইটের চার্লি চ্যাপলিনের কথা। মনে আছে তিনি তাঁর চিরন্তন ট্র্যাম্প চরিত্রধর্ম ফুটিয়ে বসন্তের আনন্দের গানে শ্রোতাদের মুগ্ধ করছেন, এবং গাইবার সময় সেই বসন্তকালেরই একটি ফুল, গাছের গোড়া থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে রক্ষিত একটি পাত্র থেকে তার উপর নুন ছিটিয়ে নিয়ে মুখে পুরছেন ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে।

তাই সব সময়েই মনে হয়েছে চার্লি চ্যাপলিন, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ও নলিনীকান্ত সরকারের মধ্যে একটা 'সপিণ্ড সম্পর্ক' আছে, হয়তো তা সাত পুরুষ দূরে, তবু আছে।

বনফুল, শিবদাস বসুমল্লিক—এ দুজনের প্রভাবও আমার জীবনে অনেকখানি। বহু বিস্তৃতভাবে আমার নানা স্মৃতিকথায় বনফুলকে উদ্‌ঘাটিত করেছি এবং প্রথম স্মৃতিকথায় (স্মৃতিচিত্রণে) শিবদাস বসুমল্লিকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছি। শিবদাস ছাত্রজীবনে চরম দারিদ্র্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, সরল হাসি হেসে এবং অদ্ভুত কৌতুকপূর্ণ এক অবিস্মরণীয় আচরণে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে বিস্ময়কর আনন্দে স্তম্ভিত করতে করতে গৌরবের ক্ষেত্রে এসে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তার হাসির অন্তরালে কঠিন বেদনা ছিল, তা আমি দেখেছি।

হনুমানের উল্লেখ করেছি। আমার অনেক হাসির অন্তরালে আছে এই বিশেষ হনুমানটির চমকপ্রদ এক পতন কাহিনী। আমার 'দ্বিতীয় স্মৃতি' বইতে আছে সে কথা। সেদিন বেলা তিনটেয় কালো মেঘে আকাশের সকল আলো লুপ্ত। সে এমন অন্ধকার যে, বাইরেও বই পড়া যায় না। দেখতে দেখতে সকল আকাশ আকুল করে, ঘন মেঘের আড়াল ধরে কোনো

গভীর বাণী এসেছিল কিনা মনে পড়ে না, কিন্তু অতি প্রবল বৃষ্টিতে পৃথিবী রসাতলে যাবে এমন মনে হল। আমি একা ঘরে বসে। ডাকে আসা কয়েকটি লেখা তখন পাশে ঠেলে রেখে সেই ভাষাহীন আলোহীন পরিবেশে ঘন বর্ষণে যুগান্তরের বেদনা অনুভব করছিলাম যুগান্তরের ম্যাগাজিন সেকশনের চেয়ারে বসে। ১৯৪৫ সনের আষাঢ় মাস। এমন প্রবল বর্ষণে মন সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অকারণ একটা বেদনায় মন আচ্ছন্ন হয়। সমস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। নিজেকে পরিচয়ের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত মনে হয়। এমনি তখন আমার মনের অবস্থা। ঠিক এমনি সময় আমার টেবিলে প্রকাণ্ড এক হনুমান শূন্য থেকে ঝপাং করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে এক মুহূর্তের জন্য মুখোমুখি। এর পর কি হল আর বলব না। তবে সেই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবজনিত আতঙ্ক, বিহ্বলতা, বিমূঢ়তা, হঠাৎ-চিন্তাশূন্যতা—পরে আমার মনে একটু একটু করে কৌতুকের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে চলেছে। ঠিক এমনি হয়েছিল আমার স্কুল জীবনে একবার, হয়েছিল বিপিন চৌকিদারের হাতে। সে কথাও আগে অন্য বইতে বলেছি।

১৯৪০ থেকে ম্যাট্রিকুলেশনের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষক নিযুক্ত হই। পরীক্ষক হওয়ার একটা বিদ্যা আছে, তা না জানলে অসুবিধা হয়। প্রমথনাথ বিশীও ঐ একই পত্রের পরীক্ষক। আমাকে মন্ত্র দিল—কোনো একই প্রশ্নের উত্তর দুবার দিয়েছে কিনা তা ধরতে হবে, কোনো উত্তরে মার্ক দেওয়া বাদ না যায় এবং অ্যাগ্রিগেট যেন ঠিক হয়। একদিন ট্রামে মনোজ বসুর সঙ্গে দেখা। সেও ঐ পত্রের পরীক্ষক। সে স্ক্রুটিনিও করে। আমাকে ট্রামের মধ্যে অভয় দিয়ে বলল, কোনো ভয় নেই, আমরা আছি। তখন যাচ্ছিলাম খাতা নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রধান পরীক্ষকের বাড়ি। সুনীতিবাবু আমার পরিচিত ছিলেন আমার সম্পাদক জীবনের গোড়া থেকেই। ওখানে দেখি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অজয় ভট্টাচার্য, কুলদারঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, মদনমোহন কুমার, সুধীর গুপ্ত, মহাদেব রায় প্রভৃতিতে আসর জমাট। অধিকাংশই শিক্ষক, কিন্তু অনেকে আবার লেখকরূপেই দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষক হবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। ১৯৬০ সনে ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স বাংলার পরীক্ষক হয়েছি

শেষ বারের মতো। বহু হেড এগজামিনার পার হয়েছি ইতিমধ্যে। সুরেশ চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, উমা রায়, এস, কে, দাসগুপ্ত ও জনার্দন চক্রবর্তী।

পরীক্ষার খাতা দেখা খুব সহজ কাজ নয়। তবে আমি বছর তিনেকের মধ্যে একটা কৌশল আবিষ্কার করেছিলাম, যাতে ডাবল মারকিং এবং মারকিং বাদ পড়া আর সম্ভব ছিল না।

নকল-পদ্ধতি তখন বিশেষ ছিল না। মাত্র দু-একটি ক্ষেত্রে সন্দেহ হত। এবং নকল চলত না বলেই যারা কিছু না পড়ে পরীক্ষা দিত তাদের খাতায় উদ্দাম কল্পনাশক্তি বেশ আমোদজনক মনে হত। তা ছাড়া স্বাধীন চিন্তা যাদের একেবারে অভ্যাস নেই, তারা যখন স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় নেয়, তখন তার কি চেহারা হয়, সেও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তবে ভাল ও মন্দ তখন মোটামুটি ৫০ : ৫০ ছিল। পরীক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা দিয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জগতে প্রবেশ আমার পক্ষে একটি নতুন জগতে প্রবেশের পাসপোর্ট দিয়েছিল। এ না হলে অভিজ্ঞতায় বড় একটা ফাঁক থেকে যেত। অনেক বিষয়েই মনে একটা বিশ্লেষণী কৌতূহল অনুভব করি, সেজন্যও এ অভিজ্ঞতা আমার দরকার ছিল। আমি বহুদিন আগে থেকেই ইংরেজি স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষার খাতায় যে সব অদ্ভুত ভুল হয় তার সঙ্কলন বই পড়ে আসছিলাম। কিন্তু আমাদের দেশের ছাত্ররাও এ রকম অসম্ভব রকমের সব উত্তর খাতায় লেখে, তা নিজে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত। অর্থাৎ উদ্ভাবনের মৌলিকতায় কেবল ইংরেজ ছাত্ররাই আর সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে কেন? বাঙালী ছাত্ররা এ বিষয়ে তাদের অপেক্ষা কিছুমাত্র নিম্নমানের নয়।

॥ দশ ॥

পূর্ব অধ্যায়ে কিছু কিছু কৌতুককর ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছিলাম। কিন্তু এই অধ্যায় লিখতে বসেছি অন্য সুরে। আমার সম্মুখ দিয়ে আমার বহুদিনের সব বন্ধু একে একে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন, আমি বসে বসে দেখছি। আমার জীবিত ও মৃত তালিকা দুটিতে জীবিতের তালিকা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, মৃতের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। সবাই জীবিত থাকলে সবার সঙ্গে যে সবসময় দেখা হত তা নয়। কারো সঙ্গে পাঁচ-ছ বছরও দেখা হয়নি। সবাই বেঁচে আছি এই চেতনা মনের মধ্যে সুপ্ত থাকা সত্ত্বেও সবার অস্তিত্ব-বোধটা মন থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকে না। সেই বোধটাই অদর্শনের অভাব ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু মৃত্যু হঠাৎ একটা শূন্যতা সৃষ্টি করে মনকে ভারী করে তোলে। তখন বোঝা যায় শত চেষ্টাতেও যে চলে গেল তাকে আর দেখা যাবে না, তার সঙ্গে আর কথা বলা যাবে না। এই বোধটা পীড়াদায়ক। এই সব ভাবছি আর আমার এই রচনায় একের পর এক বন্ধুর মৃত্যু বর্ণনা করে চলেছি।

ইতিমধ্যে আরো দুটি মৃত্যু আমাকে মনের দিক থেকে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে গেল। শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার ছিল মহৎ শিল্পী এবং মহৎ মানুষ। সকলজাতীয় লোভ থেকে মুক্ত হয়ে একটা মানুষ কি করে চরম দুঃখের মধ্যেও হাসিমুখে বিনা অভিযোগে জীবন কাটিয়ে যেতে পারে তা দেখলাম তার মধ্যে। আমার সঙ্গে, বিশেষভাবে আমার সম্পাদকীয় জীবনের সঙ্গে, সে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। আমাকে সে বুঝতে পারত আমি তাকে বুঝতে পারতাম। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর শিল্পরুচি ও শিল্পআত্মার সঙ্গে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সেসব কথা আমি আমার প্রথম ও চতুর্থ স্মৃতিগ্রন্থে লিখেছি এবং গত ৮ই অক্টোবর ১৯৭২ তারিখের যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে লিখেছি তার মৃত্যুর ১১দিন পরে। যা লিখেছিলাম, তা থেকে কয়েক লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি :

> কালীকিঙ্কর মানুষটিকে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী আমাকে লিখেছিলেন, জনসমাজে চিনিয়ে দিতে। তাঁর আদেশ আমি পালন করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে মানুষটি যে তার আকাশচুম্বী উদাসীনতায় পার্থিব সব কিছুকে তুচ্ছ করে জীবন শেষ করে গেল।

যখন সম্পাদক ছিলাম

আমার রচনাটির শেষ কয়েকটি লাইন এগুলি।

নির্মলকুমার বসুর মৃত্যু ঘটল গত ১৫ই অক্টোবর (১৯৭২) তারিখে। ১৯৩৩এর পর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে সময় তিনি আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময়ের পূর্ব থেকে কয়েক বছর আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তাঁর শেষ চিঠি পেয়েছিলাম যখন তিনি আমেরিকায় ছিলেন, ১৯৬৭তে। এবং তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছে (টেলিফোনে) ১৯৭১, ১১ই জানুয়ারি, সোমবার। এসব কথা পরে বলছি।

নির্মলবাবু কর্মীরূপে ছিলেন নিষ্ঠাবান এবং কঠোর। মানুষটিকে দেখলে বোঝা যেত না। নিজ কর্মক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলতেন। চরিত্র বিশ্লেষণেও তিনি ছিলেন বিজ্ঞানপদ্ধতির অনুরাগী। তাঁর বড় বই My Days With Gandhi-তে সত্যকথা সহজ ভাবে বলেছেন। এটি স্বয়ং গান্ধীর প্রভাব। আবার যেখানে তিনি হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে তিনি কবির স্তরে উন্নীত। তিনি পরিব্রাজক ছিলেন নিজের কাজের তাগিদেই। আদিবাসী অথবা অস্পৃশ্যদের সঙ্গে তিনি আত্মীয় রূপে মিশে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বোলপুরে তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য একটি শিক্ষায়তন পরিচালনা করেছেন।

নির্মলবাবুর সঙ্গে আমি শনিবারের চিঠির সম্পাদক থাকা কালে, মাঝে মাঝে, হ্রস্ব বা দীর্ঘকালীন অদর্শন সত্ত্বেও একটা নৈকট্য অনুভব করেছি, কারণ তিনি যেখানেই থাকুন, আমার একটি বিশেষ অনুরোধ তিনি বন্ধুরূপে পালন করেছিলেন। অর্থাৎ আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আমাকে লেখা দিয়ে সাহায্য করতে হবে। এটি ১৯৩৬ সনের ঘটনা। সে লেখার পরিচয় দেবার আগে তাঁর বিষয়ে আগে আমি যা লিখেছি তা থেকে সামান্য কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি—

নির্মলবাবুর চরিত্রে বেশ একটি উদার মাধুর্য। সামান্য একটি ঘটনা বলি। একদিন তাঁর হাতে বড় একটা চামড়ার ব্যাগ দেখি। ব্যাগটি নতুন নয়, কিন্তু নির্মলবাবুর হাতে নতুন। উৎকৃষ্ট চামড়া, ওজনে বেশ ভারী এবং তার ভিতর অনেকগুলি ঘর। শুনে চমকে উঠলাম—নির্মলবাবু ঐ ব্যাগ বউবাজারের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড দোকান থেকে মাত্র আড়াই টাকায় কিনেছেন। তখনই ওর দাম পঁচিশ টাকা বললেও বিশ্বাস করতাম। ব্যাগটিকে এবং তার ক্রেতাকে একই ভাষায় প্রশংসা করলাম। তিনি যদি বলতেন ওটি বিনামূল্যে

পেয়েছেন, তা হলে বলবার কিছুই ছিল না, কিন্তু আড়াই টাকায় ওরকম একটি ব্যাগ পাওয়া এবং সেকথা প্রচার করার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা আছে। শুনে মনে আঘাত লাগে না কি?

পরদিন ঐ ব্যাগ নিয়ে আবার এলেন নির্মলবাবু এবং এসেই আমাকে কিছু বলতে না দিয়ে বললেন, ব্যাগটি আপনাকে দিলাম। কিছু বলতে দিলেন না, তবে আমি এর পর থেকে সাবধান হয়েছি, নির্মলবাবুর কোনো শখের জিনিসের আর কখনো প্রশংসা করিনি।

(স্মৃতিচিত্রণ, ১৯৫৮)

আর এক পৃষ্ঠায় লিখেছি—

নির্মলবাবু প্রকৃত রসিক ব্যক্তি.. একদিন এক ক্যামেরা উপলক্ষে বেশ একটা নাটক রচনা করলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল যুগান্তর অফিসে আমার টেবিলে। কম্পাস নামক এক আশ্চর্য ক্যামেরা যার বিজ্ঞাপন দেখেছি অনেক দিন, চোখে দেখিনি। এত ছোট যে প্রায় হাতের মুঠোয় ধরে। চতুষ্কোণ ক্যামেরা, কিন্তু তার মধ্যে এমন জটিল সব ব্যবস্থা যে আশ্চর্য হবারই কথা। তিন রকম ফিলটার—সব ভিতরে। ঐ ক্যামেরার মধ্যে প্লেট ও রোল ফিলমের ব্যবস্থা, এবং আরো পঞ্চাশ রকম কৌশল। নির্মলবাবু আমার সামনে এই ক্যামেরা ধরে, এবং কোনো ভূমিকা না করে, ক্রমাগত এক একটি কৌশল দেখাচ্ছেন আর গম্ভীর ভাবে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন।

'নানা রঙের দিনগুলি' নামক রচনায় বঙ্গশ্রী অফিসের বর্ণনায়, বন্ধুদের একের পর এক ছবি এঁকেছিলাম অল্প কথায়। তার মধ্যে নির্মলবাবুর বিষয়ে লিখেছিলাম—

প্রকাণ্ড ব্যাগে গান্ধীজি, উড়িষ্যার মন্দির এবং অসহযোগ আন্দোলনকে পুরে নির্মলকুমার বসু আসতেন প্রসন্ন হাসিমুখে। (সপ্তপঞ্চ ১৯৫৭)

তাঁর My Days With Gandhi (১৯৫৩) নামক বইখানার একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলাম যুগান্তরে, তাঁরই তোলা গান্ধীজির একখানা ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি সমেত। সমালোচনাটির কপি আমার হারিয়ে গেছে। বইখানার নাম-পৃষ্ঠায় শুধু তাঁর হাতের বাংলা লেখা "শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, বন্ধুবরেষু, ২৭ এপ্রিল ১৯৫৩, নির্মলকুমার বসু" কথাগুলির দিকে তাকিয়ে সমস্ত স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠছে। তবে সান্ত্বনা মাত্র এই যে, তাঁর সম্পর্কিত আমার সমস্ত লেখাই তিনি পড়েছিলেন, এবং এতে সম্পর্ক মধুরতর হয়েছিল।

শনিবারের চিঠির জন্য আমাকে পরিব্রাজক পর্যায়ের প্রথম যে লেখাটি দেন, তার নাম ছিল কবি। বেরিয়েছিল মার্চ ১৯৩৫, ফাল্গুন ১৩৪১এর

সংখ্যায়। পরবর্তী কিস্তিতে পেলাম একসঙ্গে দুটি রচনা, নাম সাধু ও শিল্পী। এই দুটি রচনাই একত্র প্রকাশিত হল পরের মাসে। তারপরে আরো কয়েকটি ছোট ছোট রচনা, কিন্তু অখ্যাত গ্রাম্য মানুষদের নিয়ে নির্মলবাবু যে সব ছবি এঁকেছেন এই সব রচনায়, তার সঙ্গে তুলনা করি এমন কোনো রচনা বাংলা ভাষায় আর মনে পড়ছে না।

তার পরের কিস্তিতেও দুটি রচনা প্রকাশিত হল বৈশাখ ১৩৩২এর সংখ্যায়। এ দুটি লেখার নাম দেশসেবক ও অধ্যাপক। যেদিন এই লেখা নিয়ে নির্মলবাবু আমার কাছে এলেন, সেদিন প্রস্তাব করলাম সবগুলি রচনাই যখন একজাতের এবং একসুরের, তখন এর একটা সাধারণ নাম দিতে চাই—পরিব্রাজকের ডায়ারি। নির্মলবাবু বললেন, যা ভাল মনে করেন করুন। এবং সেই সংখ্যাতেই ফুটনোটে বলে দেওয়া হল সেকথা। নির্মলবাবুর বিজ্ঞানসাধনার জন্য তাঁর স্বেচ্ছারত পরিব্রাজকের জীবনের একটি বিশিষ্টতা আছে। তিনি তাঁর এই কর্তব্যবোধের সঙ্গে হৃদয়ের এমন একটা যোগসাধন ঘটিয়েছিলেন যাকে অভূতপূর্ব বলা চলে আমাদের সমাজে। একদিকে নৃতত্ত্বের উপকরণ সংগ্রহ এবং যার জন্য অশেষ দুঃখবরণ, অন্যদিকে দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি ঐকান্তিক মমত্ববোধ, যার জন্যও নিজেকে বহু দিক থেকে বঞ্চিত রাখা, এই দুইয়ের সংযোগে নির্মলবাবুর চরিত্র গঠিত হয়েছিল। দরিদ্র অসহায়ের সেবা, তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নিজের দিক থেকে যথাসাধ্য ত্যাগস্বীকার তাঁর চরিত্রকে মহৎ করেছিল। এবং বৃহত্তর কর্তব্যবোধের খাতিরে নিজেকে প্রেম-ভালবাসা থেকে কতখানি বঞ্চিত রেখেছিলেন, তারও সন্ধান হঠাৎ কখনো মিলবে তাঁর ঐ ডায়ারি থেকে। দেশসেবা তাঁর জীবনের বড় আদর্শ ছিল বলেই তিনি গান্ধী মহারাজের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর তাঁর এই আকর্ষণ যে কতখানি ভাবালুতাবর্জিত এবং আন্তরিক ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়—গান্ধীজিও তাঁকে অকপটে বিশ্বাস করতেন, এবং অনেক বিষয়ে তাঁর উপরে নির্ভর করতেন, তা থেকে।

নির্মলবাবুর চরিত্র কঠোরেকোমলে গড়া, তিনি প্রকৃতির প্রভাব নিজের মধ্যে গভীর ভাবে অনুভব করেছেন, এবং ক্রমে তা মানুষের মধ্যে এনে বিস্তার করে দিয়েছেন। মানুষের প্রভাব তাই অন্য প্রভাবকে অতিক্রম

করেছে অধিকাংশ সময়েই। নির্মলবাবু অন্তরে অন্তরে ছিলেন প্রেমিক, ছিলেন কবি। এই ছিল তাঁর হৃদয়ের দিক। আমি একে একে তাঁর মনের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁর কর্মক্ষেত্রকে তিনি বিজড়িত করেছিলেন তাঁর সাধারণ সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য। এবং তাঁর গভীর সহানুভূতিশীল মনে তিনি তাঁদের ভালবেসেছিলেন বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য। এই ভালবাসা তাঁর অত্যাবশ্যক ছিল না। এ ভালবাসা তাঁর ছিল স্বভাবের মধ্যে। অন্যদিকে যাঁর সঙ্গে হৃদয়ের নিবিড় যোগ ছিল, তাঁকেও তিনি কাজের মধ্যেও স্মরণ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে যেটুকু লিখেছেন তাই আমি শুধু বলতে পারি।

একটা ঘটনার কথা পরিব্রাজকের ডায়ারিতে আছে। সাঁওতালদের একটি উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সুরাপানে উন্মত্ত নবনারীকে দেখে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি লিখছেন—

বর্ষার নদীর জল ঘোলা হইয়া উঠে। ইহাদেরও আনন্দের স্রোত ঘোলা হইয়া উঠিয়াছিল। মনের তলদেশে যত লুপ্ত তামসিকতা সঞ্চিত ছিল, সেগুলি স্রোতের তাড়নায় আজ যেন ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই তমসার আঘাতে আমার অন্তঃকরণ পীড়িত হইয়া উঠিল। আমি উৎসবের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া গহন অন্ধকারের মধ্যে শালের বনপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ব্যাপিয়া পদচারণ করিতে লাগিলাম।

মনের ছায়ায় আমার মানসী প্রিয়ার মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। আমি যেন উৎসবের প্রাঙ্গণে ধীর পদবিক্ষেপে আনন্দের বহুবিধ মূর্তি দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি

আমার গায়ের পাশে একজনের নিবিড় অস্তিত্বের অনুভূতি লাভ করিলাম। দেখিলাম আমার সঙ্গে আমার মানসী প্রিয়াও এই সকল দৃশ্য নিবিষ্ট মনে দেখিতেছেন। তাঁহার হাত আমার হাতের মধ্যে আবদ্ধ। আমি নীচু হইয়া পথ হইতে এক মুঠা ধুলা কুড়াইয়া তাঁহার কপালে…মাখাইয়া দিলাম। হঠাৎ নিবিড় উজ্জ্বল আনন্দে প্রিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথার কালো চুলের আবেষ্টনের মধ্যে শুধু দুটি চোখের উজ্জ্বলতা দেখিতে পাইলাম…

ডায়ারির এই অংশে নির্মলবাবু নিজের মনকে অকপটে প্রকাশ করেছেন। আশ্চর্য প্রকাশ। সাঁওতালদের উন্মত্ততার কুৎসিত দৃশ্যে মন পীড়িত হয়েছিল, কিন্তু 'মানসী'কে স্মরণমাত্র সে সমস্ত দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠল, সব ভাল লাগল তখন।

হৃদয়ের যোগে প্রকাশের এই যে কাব্যময়তা, এর পাশাপাশি আমি তাঁর আর একটি রচনাংশ উদ্ধৃত করছি :

যখন সম্পাদক ছিলাম

অন্ধতমিস্র রজনীর আকাশতলে লেনিন কর্মকারের বেশে লৌহের উপরে প্রদীপ্ত লৌহখণ্ড রাখিয়া প্রচণ্ড বেগে তাহাতে আঘাতের পর আঘাত করিয়া যাইতেছেন। সম্মুখে প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু উপরে রাত্রির যে অন্ধকার ঘিরিয়া আছে, তাহা তিনি দেখিতেছেন না। তাঁহার অন্তরের বিক্ষুব্ধ আশা, বাহুর বিপুল শক্তি, কর্মের প্রচণ্ড উন্মাদনা সবই নক্ষত্রের নিশ্চল কঠোর আলোর স্পর্শে পরাহত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের কাছে মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে যেমন প্রভেদ নাই, মানুষের এই ক্ষুদ্র সুখদুঃখ লীলারও তেমনি কোন অর্থ নাই। আর অপর পক্ষে গান্ধী নিগুঢ় নীরব রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া সুদূর নক্ষত্রালোকের দিকে চিরদিনের যাত্রীর মত বহিয়া চলিয়াছেন। সে যাত্রার কোন দিনই শেষ হইবে না জানিয়াই তিনি তাঁহার সকল শক্তি সকল দৃষ্টি শুধু পায়ের তালের উপরেই নিবদ্ধ করিয়াছেন, পথে চলার ভুল হইলে একবার আকাশের দিকে চাহিয়া নিজের নিশানা ঠিক করিয়া লইতেছেন। বিগত কাল এবং অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে বর্তমানের যে মহামুহূর্ত বিরাজ করিতেছে, তাহারই উপরে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি, সকল প্রাণকে ঢালিয়া দিয়াছেন। ইহাই হইল তাঁহার বিশেষত্ব...

(বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪১, 'কমিউনিজম ও গান্ধীবাদ')

পূর্বের উদ্ধৃতি ও এই উদ্ধৃতিটি ভিন্নজাতের হলেও উভয়ের মধ্যে কাব্য-ধর্মিতার দিক থেকে মিল আছে। এবং কোনো ব্যক্তির জীবন আদর্শের বিশ্লেষণ কাব্যের ভাষায় করতে গেলে যে ত্রুটি ঘটে, এখানেও তা অবশ্যই ঘটেছে। কিন্তু নির্মলবাবু প্রায় সমস্ত কাজে হৃদয়াবেগ-যুক্ত, একমাত্র নৃতত্ত্ব বা প্রাচীন শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্র ছাড়া। সেখানে তিনি বিশুদ্ধ জরিপের কাজ করেছেন। গান্ধীকে নোয়াখালির পটে বিশ্লেষণেও তাই করেছেন। অন্যত্র যেমন দেখা যাবে তাঁর 'কণারকের বিবরণ' অথবা 'হিন্দুসমাজের গড়ন' অথবা 'Cultural Anthropology' নামক বইগুলিতে। সত্যসন্ধানী, আবেগ বর্জিত হবেন যথাসম্ভব। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব এবং সে চেষ্টা নির্মলবাবু করেছেন নিঃসন্দেহে। শেষ দিকে গান্ধীর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নোয়াখালি ভ্রমণের সঙ্গীরূপে এবং পূর্বে বহুবার তাঁর একান্ত বন্ধুরূপে তাঁর সঙ্গে বাস করে তিনি গান্ধীকে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন, এবং My Days with Gandhi নামক নির্মল-বাবুর সর্ববৃহৎ বইতে যথাসম্ভব আবেগ বর্জন করেছেন। অতএব এই বই ছাপা নিয়ে নির্মলবাবুকে বড়ই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের টাকায় ছেপেছিলেন। আমাদের এই বঙ্গদেশের হিন্দুদের

একটি বিশেষ চরিত্রবৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ আমরা কার্যত যে সব মনীষীর পথ অনুসরণ করতে অসুবিধা বোধ করি, এবং যা আমাদের দ্বারা প্রায় অসম্ভব, সেই সব মনীষীকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখে আমাদের নিজ নিজ অভ্যাসের পথে নিশ্চিন্ত মনে চলি। সেজন্য সেই সব মনীষীর প্রতি আমাদের শেষ পর্যন্ত একমাত্র কর্তব্য হয় তাঁদের স্মৃতিপূজা করা, এবং তাঁদের জীবন-ইতিহাস থেকে মানুষের স্বাভাবিক যাবতীয় গুণকে অস্বীকার করে তার স্থলে কল্পিত অনেক গুণ আরোপ করা। এবং নিয়মিত 'দিবস পালন' করা। অবশ্য যাঁদের সহজে দেবতা বা'নো যায় তাঁদের সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য।

নির্মলবাবুর গান্ধীচরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর চরিত্রের দুর্বলতার দিকও তিনি নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করেছেন, তাই তাঁর এ বই গান্ধীজির দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তগণ (যাঁরা গান্ধীজির আদর্শ খুব যে মানেন তা নয়) এ বই প্রকাশ করতে বাধা দিয়েছেন। সে সব কথা ভূমিকায় নির্মলবাবু অকপটে লিখে গেছেন। তাঁর নিজের কাছে এ সব কাহিনী অনেক শুনেছি। এক প্রান্তে অরাজকতার দিকে, আর এক প্রান্তে অসভ্যতার দিকে, সহজে ঝুঁকে পড়া আমাদের স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য।

নির্মলবাবুর হতাশার সঙ্গে আমার হতাশা একই পথের যাত্রী। সূক্ষ্ম-শিল্পবোধ, কৌতুকপ্রিয়তা এবং নিজকর্মে নিষ্ঠা এই সব গুণ নির্মলবাবুকে নীচতার ঊর্ধ্বে ধরে রেখেছিল।

আমার একখানি ভ্রমণ কাহিনী (বেঙ্গল পাবলিশার্স)—নাম 'পথে পথে' —নির্মলবাবু সমালোচনা করেছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৮-৯-৫৫ তারিখে। তাঁর শিল্পরুচিকে আমি খুশি করতে পেরেছিলাম, সেজন্য আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। তিনি যা লিখেছিলেন তার একটি অংশ এই—

...His range of movement has been small, and he has never ventured to pursue the extraordinary under any circumstances. What is most delightful in his travel-diary is its simplicity and keen sensitiveness to beauty, whether in nature or in man, in which he invites his readers to participate. A refined sense of humour also pervades his accounts...

Nirmal Kumar Bose.

একটি সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় দিচ্ছি আমাকে লেখা এক চিঠি থেকে। নির্মলবাবু এ সময়ে (১৯৫৭) ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র ভিজিটিং প্রোফেসর। তাঁর চিঠিখানি এই—

C/o, Indian Press Digest
156 Library Annex
University of California
Berkeley 4, California, U.S.A
13-10-57

পরম প্রীতিভাজনেষু, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে হিমানীশের বন্ধু এবং ভূতত্ত্বের ছাত্র শ্রীমান শিশির সেনের নিকটে সংবাদ পেলাম হিমানীশের মায়ের পরলোকগমন ঘটেছে। আপনার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হচ্ছে যে, ক্ষতি ও বেদনা আপনার যতই হোক তিনি যন্ত্রণার থেকে যে মুক্তি পেয়েছেন তাই আপনার কাছে খানিক সান্ত্বনা বহন করে আনবে।

আপনার নিজের শরীর কেমন আছে জানাবেন।

আমি এখানকার কাজকর্মের মধ্যে এখনও স্থির হয়ে প্রবেশ করিনি। তবে শিকাগো ও নর্থ-ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে কয়েকটি ক্লাস নিতে হয়েছে। ক্যালিফোরনিয়াতে পাঁচ ছ' মাস থাকবো ও বর্তমান ভারত ও গান্ধীজির রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনাও করতে হবে। ক্রমে এদিককার সংবাদ কিছু কিছু দেবো।...উত্তর না পেলেও জানবো আপনি ভাল আছেন। কালীকিঙ্করবাবু, ভূষণ প্রভৃতিকে সস্নেহ নমস্কার জানাচ্ছি। ইতি

নির্মলকুমার বসু

এই প্রসঙ্গে, এই চিঠিতে কালীকিঙ্করের নামের উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে নির্মলবাবুর সম্পর্কের কথাটাও বলে রাখি। এ অধ্যায়ের আরম্ভেই আমি কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের বিষয়ে কিছু বলেছি। কালীকিঙ্করের ছবি ও চরিত্র নির্মলবাবুকে মুগ্ধ করেছিল। কালী ও আমি একাধিকবার নির্মলবাবুর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে গিয়েছি। তারপর ১৯৪৯ সনে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত নির্মলবাবুর 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' পর্যায়ে 'হিন্দু সমাজের গড়ন' নামক একখানা অতি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়, সেই পুস্তকে উড়িষ্যার এক অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে তেল নিষ্কাশনের জন্য যে রকম সব ঘানি ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে সাত খানা ছবি কালীকিঙ্করকে দিয়ে আঁকানো হয়েছিল। এ কাজে লেখক নির্মলবাবু যেমন তৃপ্ত

হয়েছিলেন, বিশ্বভারতীর পক্ষের পুলিনবিহারী সেন তেমনি বিব্রত হয়েছিলেন। অসুবিধা সৃষ্টি করল কালীকিঙ্কর নিজে। কালীকিঙ্করের চরিত্রবৈশিষ্ট্য আমি অন্যত্র নানা উপলক্ষে এবং বিশেষ করে আমার 'পত্রস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছি। তার স্বভাব হল কাজ করে টাকা নেওয়া বিষয়ে উদাসীনতা। আসল কথা, বিল করে টাকা নিতে সে পারত না। এবং যেখানে বিনা পয়সার কাজ সেখানে তার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। কাজেই বিশ্বভারতী টাকা দিতে চায়, কিন্তু দেবে কাকে? শিল্পীর দেখা নেই। ভার পড়ল শেষে আমার উপর! পুলিনবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই বলেন শিল্পী কোথায়? আমি কালীকিঙ্করকে বলি, যাও একবার দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে। এভাবে অনেক দিনের চেষ্টাতে দু'পক্ষের যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হয়েছিল।

নির্মলবাবুর মনোজীবনের আরো একটা দিক আছে, এবং তা পরিব্রাজকের ডায়ারিতেই শেষ নয়। তাঁর ১৯৩০এ লেখা 'নবীন ও প্রাচীন' নামক ছোট্ট একখানি বইতে তিনি সমাজ ধর্ম রাজনীতি প্রভৃতি নানা দিকের মননশীল চিন্তার এক আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তখন সম্ভবত ২৬ বা ২৭ বছরের যুবক। কিন্তু বইখানা পড়লে প্রবীণ কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির লেখা মনে হবে। প্রথম বয়স থেকেই স্বাধীন চিন্তা ছিল তাঁর মজ্জাগত। কোনো মতবাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ থাকলেও সেখানে তিনি প্রতিপক্ষকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নবীন ও প্রাচীন ৭২ পৃষ্ঠার পকেট বই, চার আনা দামের। কিন্তু এই অল্প পরিসরের মধ্যেও আদর্শ ও অনুভূতি, সত্যাগ্রহ, বাংলার ভাব কার্পণ্য, সংগ্রাম, সংরক্ষণ ও স্বাধীনতা, প্রাচীন হিন্দু সমাজের আদর্শ, কোণার্কের মন্দির, কোণার্ক ও খাজুরাহোর মন্দির, তিব্বতী বাবার শিক্ষা, ভারত ইতিহাসের এক অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, ও মহাত্মা গান্ধীর সত্য সাধনা,—এই বারোটি ছোট ছোট রচনায় তিনি যে বিশ্লেষণী শক্তি ও মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা খুব সুলভ নয়।

নির্মলবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে আমার কথা হয়েছে, আগেই বলেছি, ১১ই জানুয়ারি ১৯৭১, সোমবার। এর আগে অনেকদিন দেখা ছিল না। গান্ধীজির মৃত্যুর পরে তিনি কর্মক্ষেত্রের কিছু বদল ঘটিয়েছিলেন। ততদিনে নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার কাজ তাঁর শেষ হয়ে এসেছে। শেষ দিকে

দিল্লীতেই প্রায় থাকতেন। আমিও প্রায় গৃহবন্দী। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলসফির রীডার ডক্টর মিসেস মার্গারেট চ্যাটার্জি নির্মলবাবুর বিশেষ পরিচিত। আমারও। নির্মলবাবুর মৃত্যুর (১৫ অক্টোবর) পাঁচ দিন পর ২০ অক্টোবর মার্গারেট এলো আমার কাছে। সে নার্সিং হোমে নির্মলবাবুর রোগশয্যার পাশে উপস্থিত ছিল। বলল, শেষে আর কাউকে চিনতে পারতেন না। আগে মৃত্যুর কারণ আমি ভুল শুনেছিলাম সম্ভবত। কাগজে দেখেছিলাম লিউকীমিয়া। তার অর্থ ব্লাড ক্যানসার। কিন্তু মার্গারেট বলল, প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ হয় ক্যানসার, শেষে সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়ে। আমাকে মার্গারেট কয়েক মাস আগে লিখেছিল, নির্মলবাবু is suffering from a mysterious illness। তারপর নির্মলবাবুর কলকাতা আসার খবর জেনে ভেবেছিলাম ভাল আছেন। তাঁকে ফোন করে বললাম, অনেক দিন দেখা হয় না, আসুন এবারে। তিনি যে অসুস্থ এ কথা আমাকে একবারও বললেন না। বললেন, নিশ্চয় যাব—কয়েক-দিনের মধ্যেই। জিজ্ঞাসা করলাম, সাইকেলখানা কি এখনো ব্যবহার করেন? বললেন, না। তারপর আমার এখানে আসার পথ নির্দেশ চাইলেন। অথচ তারপর বছর কেটে যায় অথচ আসেন না। আমি তাঁর অসুখ বৃদ্ধির কথা একেবারে জানতাম না; তিনি এ বিষয়ে প্রচার হয়তো পছন্দ করতেন না।

আমি নির্মলবাবুর ক্যালিফোরনিয়া থেকে লেখা চিঠি উদ্ধৃত করেছি। তাতে আমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি লিখেছিলেন, 'ক্ষতি ও বেদনা আপনার যতই হোক, তিনি যন্ত্রণার থেকে যে মুক্তি পেয়েছেন, তাই আপনার কাছে খানিক সান্ত্বনা বহন করে আনবে।'

আমার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছিল ক্যানসারে। নির্মলবাবু সেই অসুখ দেখেছিলেন, তাই ক্যানসারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, রোগীর দিক থেকে যে বড় মুক্তি. এ কথা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সেই ক্যানসার রোগে এতদিন পরে তাঁর নিজের মৃত্যু ঘটল, তিনি কি-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেলেন, তা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি, ঐটুকুই যা সান্ত্বনা।

আমার এই রচনার চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের (১৯৩২-৩৬ সনের) সাহিত্যিক আড্ডার বন্ধুদের জীবিত ও মৃত দু'টি তালিকা দিয়েছিলাম।

তারপর থেকে একে একে মৃতের সংখ্যা এই অধ্যায় লেখা পর্যন্ত, (সেই দুই তালিকা মিলিয়ে যে ৫২ জনের নাম উল্লেখ করেছিলাম) হিসাব মিলিয়ে দেখছি মোট ২৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে, জীবিত আছেন ২১ জন। আমার নাম কোনো তালিকাতে নেই। অর্ধমৃত নামক তৃতীয় তালিকা থাকলে সেখানে দেওয়া যেত।

সেই সেদিনের যাঁরা ছিলেন প্রায় যৌথ পরিবারভুক্ত, তাঁদের অনেকেই এখন আর খুব সচল নেই। প্রত্যেকেরই বয়স এখন এমন যে, দেহটা কেমন আছে এখন আর তা জিজ্ঞাসা করা চলে না। এখন চোখ কেমন আছে, বা রক্তের চাপ কেমন, বা হার্টের প্যালপিটেশনটা কমেছে কি না, বা হাতের আঙুল কাঁপে কিনা, হাঁটুর ব্যথাটা কেমন আছে, নাকের ডগাটা কি এখনো লাল আছে ? এই জাতীয় সব অঙ্গগত প্রশ্ন করা চলে, 'সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন কি ?' কারো বলবার উপায় নেই, কারণ তার উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

তবু যদিও সেই ১৯৩২-৩৪কে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, তখনকার বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আবার মিলতে ইচ্ছা জাগে খুব প্রবলভাবে। ইচ্ছাপূরণ মাঝে মাঝে হয়েছে, এখনো হয়। গোপাল হালদার গত তিন চার মাসে তিনবার এসেছেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ডিসেম্বরের ৬ তারিখে, ও জানুয়ারি ১০ (১৯৭৩) তারিখে এসেছেন এবং শেষ বারে এসেছেন গোপাল হালদারের সঙ্গে। আমি বন্দী, তাঁরা মুক্ত, তাই এই পূর্ব প্রীতির টান আমার কাছে বড়ই মূল্যবান বোধ হয়। এবং এই সঙ্গে শনিবারের চিঠির প্রথম সম্পাদক যোগানন্দ দাস গত কয়েকমাসে তিনবার এসেছেন। তাঁর সঙ্গও আমার কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ। কিন্তু এসব কথা ভবিষ্যতে আর কখন বলব ? তাই এই প্রসঙ্গে বলে রাখছি। আরো একটি আশ্চর্য সংবাদ এই যে, সুনীতিবাবুর বয়স ৮৩ (১৯৭৩) তিনি এখনো যুবক। এবং আর এক ৮০ বছরের যুবক যাঁর কথা পূর্ব অধ্যায়ে একটু বেশি বলেছি, তিনি নিখিলচন্দ্র দাস। এখনো মাসে দুবার আসেন। সেদিনের বন্ধুদের মধ্যে এঁরা এখনো সচল।

এরপর ফিরে যাব ১৯৪১ সনে।

(এই কিস্তি মাসিক বসুমতীতে মুদ্রিত কিন্তু পত্রিকাখানির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে মাঝপথে।)

॥ এগারো ॥

১৯৪৫—১লা মার্চ, যুগান্তরের ম্যাগাজিন সেকশন, যার নাম যুগান্তর সাময়িকী, তার সম্পাদক রূপে যোগ দিলাম। যোগ ঘটাল প্রিয় বন্ধু প্রমথনাথ বিশী। সে তখন সম্পাদকীয় বিভাগের সহকারী। আনন্দ চাটুজ্জে লেনের পুরানো এক বাড়িতে সব কিছু। আবার নতুন করে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদনা জীবন শুরু। এবার দীর্ঘ মেয়াদি। হিসাবে ১৯ বছর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জার্মানির সঙ্গে শেষ হতে মাস তিনেক বাকি। কিন্তু তখন থেকেই নিশ্চিত বোঝা গিয়েছিল পরিণামে কি হবে। কলকাতার উপর বোমা পড়ার ভয় তখন একেবারেই ছিল না। সে তো ১৯৪২ সনেই শেষ হয়ে গেছে। ঐ সময় গোটাকত জাপানি বোমা কলকাতায় না পড়লে শহরের দুর্দশা এতটা বাড়ত না। দুর্দশা লোক পালানো এবং ফিরে আসায়। শুধু এই কাজে যে কত লোকের নিদারুণ ক্ষতি হল তার হিসাব হয়নি অদ্যাবধি। বহু পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে পালাতে গিয়ে। অনেকে দামী জিনিস ফেলে পালিয়েছে, অনেকে সম্পত্তি জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে। আসবাবপত্রও তাই। তারপর রেল স্টেশনে অসম্ভব রকম ঘুস দিয়ে কামরার ভিতরে যেতে পেরেছে। দেশে গিয়েছে প্রায় শূন্য হাতে। কলকাতায় তখন বাড়ি ভাড়া বেজায় শস্তা হয়ে গেল। আমি যে বাড়িতে ছিলাম তার ভাড়া ৪০ থেকে ২৫ টাকায় নামল। এখন শুনতে পাই সে বাড়ির পৌনে দুশ টাকা মাসিক ভাড়া।

সবই জাপানি বোমার ফল। তার উদ্দেশ্য ছিল আতঙ্ক সৃষ্টি, বোমার নাম ছিল অ্যান্টি-পারসোনেল বম্। আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। কিন্তু এর তিন বছরের মধ্যে ৬ই অগস্ট (১৯৪৫) হিরোশিমার উপর এবং ৯ই অগস্ট নাগাসাকির উপরে যে পরমাণু-বোমা পড়ল, তাতে সমস্ত পৃথিবী আতঙ্কিত হল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হল ১৪ই অগস্ট—সেই দিন জাপান বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল।

যখন সম্পাদক ছিলাম

যুদ্ধ থেমে গেলে আমরা কিছু নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কিন্তু এ থামাটা কিছু দিন আগে থেকেই অপেক্ষিত ছিল।

কাজে উৎসাহ নতুন করে জেগে উঠল। একদিকে যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে, তাতে আমরা নিশ্চয় অল্পদিনের মধ্যেই সুখের দিন দেখতে পাব এই আশা, অন্যদিকে নতুন পরিবেশের রোমাঞ্চ।

এখনকার মতো, তখন লেখক সংখ্যা অথবা প্রেরিত লেখার সংখ্যা বিশেষ কিছুই ছিল না। যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে তখন অনেকেই অতি ব্যস্ত এবং ক্লান্ত। একটা মজার ব্যাপার এই যে, যুদ্ধের কয়েক বছরে পাঠক সংখ্যাই শুধু অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। এবং সেও যুদ্ধের বিষয়ে প্রবন্ধ বা পুস্তক পাঠকের সংখ্যা। যুদ্ধ বেশ ভাল ভাবে জমে উঠলে কাগজে পড়ে বা রেডিওতে শুনে সাধারণ পাঠক হঠাৎ বুঝতে পারল, তাদের এ বিষয়ে অনেক কিছুই জানা নেই, তাই এই আগ্রহ। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ল। এর পর যখন প্রায় বছর দশেকের মধ্যে লেখক সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার মুখে, তখন যুগান্তরের এক সাংবাদিক ত্রিবিক্রম পাঠক, এম-এ, (অধুনা মৃত) আমার কাছে একটি প্রবন্ধ নিয়ে এলেন। আমি তখন ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলাম, বাংলাদেশে একমাত্র আপনিই পাঠক ছিলেন, শেষে আপনিও লেখক হলেন ?

এই কথাতে বোঝা যাচ্ছে, লেখক সংখ্যা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়েও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং সেও তো প্রায় দশ বছর হতে চলল। এখন সাময়িকী বিভাগে লেখার হিসাব রাখতে সহকারী-সংখ্যা আরও বাড়াতে হয়েছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার তখনকার সাব-এডিটর প্রফুল্ল মিত্র, ইনি আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন, আমাকে একদিন বললেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে ভাল লোক তুষারকান্তি ঘোষ। হঠাৎ এ কথার তাৎপর্য আদৌ বুঝতে পারিনি। প্রফুল্লবাবু বললেন, সবচেয়ে ভাল, কারণ তিনি আমাদের প্রত্যেকের বেতন প্রতি মাসের পয়লা চুকিয়ে দেন। বলা বাহুল্য কথাটা শ্রুতিমনোহর। এবং কথাটা যে বাড়িয়ে বলা নয়, তা পরবর্তী ১৮ বছর ধরে প্রতি মাসে অনুভব করেছি।

যুগান্তরে এসে দেখি কাজে জটিলতা নেই। সে সময় প্রেরিত রচনা-সংখ্যা

নাম মাত্র, কাজেই আমাকে পরিচিত লেখকদের শরণাপন্ন হতে হল কিছু পরিমাণ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একটি ধারাবাহিক ঘরোয়া উপন্যাস লিখছিলেন। আমি আমন্ত্রণ জানালাম প্রমথ চৌধুরীকে। ইন্দিরা দেবী খুব যত্ন করে তাঁর অপ্রকাশিত কয়েকটি লেখা আমার পাবার ব্যবস্থা করলেন। বিজ্ঞান সংবাদ বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু লেখার ব্যবস্থা করা গেল শ্রীমতী গৌরী চৌধুরী (বি-এসসি)-কে দিয়ে। গৌরী সুধাংশু-প্রকাশ চৌধুরীর স্ত্রী। দুজনেই বিজ্ঞানের উপাধিধারী। জিনিসটি নির্ভর-যোগ্যও হল অবশ্যই। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় বিজ্ঞানের নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে রচনা লেখাবার ব্যবস্থাও করলাম। আমি নিজে দুচারটি বাইরে থেকে আসা রচনা বাছাই করার কাজে তৃপ্তি না পেয়ে ছদ্মনামে নানা বিষয়ে সরস প্যারাগ্রাফ কয়েকটি করে লিখতে আরম্ভ করলাম। অনেক জিনিস বলবার আছে অথচ বলব না, এ অবস্থা আমার কাছে পীড়াদায়ক বোধ হয়েছিল। এডিটিং-এর আসল অর্থ ছাপার জন্য কপি সংশোধন ইত্যাদি করে তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু শুধুই সে কাজ আমার পক্ষে ভাল লাগেনি। সম্পাদক যখন, তখন কিছু সম্পাদকীয় অবশ্যই লিখতে হবে, এইটি হলেই তা আমার মনের মতন হয়। শেষে আনন্দ চাটুজ্জে লেন থেকে বাগবাজার স্ট্রীটে সম্পাদকীয় বিভাগ উঠে এলো। নিয়মিত সাপ্তাহিক ফীচার লিখতে আরম্ভ করলাম ম্যাগাজিন সেকশনে। নাম ইতস্তত:। কিছুদিনের মধ্যে আমাদের সেক্রেটারি আমাকে বললেন ঐ নামে আগে সম্পাদকীয় পাতায় অন্য একজন লিখতেন। লেখক অভিযোগ করেছেন, আমার এ লেখার নাম ইতস্তত: হওয়াতে অনেকে ভাবছেন এটি তাঁর লেখা, তাতে তাঁর লেখার এই অবনতিতে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ইতস্তত: নাম যে বহু আগে আর একজন ব্যবহার করেছেন তা আমার জানা ছিল না। এটি একটি সাধারণ নাম। এই শিরোনামে যে কোনো কাগজে যে-কোনো লেখক লিখলেই একমাত্র সেই বিশেষ ব্যক্তির লেখা বলে সবাই সন্দেহ করবে এবং তাঁর কলমে এমন নিকৃষ্ট লেখা বেরুচ্ছে কেন, বলে অভিযোগ করবে, এটি অবিশ্বাস্য মনে হল। কোনো কোনো ব্যক্তির এ রকম ভ্যানিটি থাকে বটে। কিন্তু এ কথা আমার কানে আসামাত্র আমি সঙ্কুচিত হলাম এই ভেবে যে,

আমার লেখা অন্য কারো লেখা বলে পাঠক সন্দেহ করবেন এ ব্যাপারটা আমার পক্ষেও অসহ্য। তাছাড়া আমি সে ব্যক্তির কোনো লেখাই পড়িনি। তাই নাম বদল করলাম উৎসাহের সঙ্গে। নতুন নাম দিলাম ইতশ্চেতঃ। একই অর্থ—ইতঃ+চ+ইতঃ। এবং এই নামটিই আমার কাছে বেশি ভাল লাগল আরো এ জন্য যে, এ শব্দটি অন্য কোথাও ব্যবহৃত হতে দেখিনি। এককলমী নাম নিয়ে কোনো আপত্তি ওঠেনি, কাজেই ওটা বজায় রইল। এককলমী অর্থে এক কলমে যে লেখে তা নয়। একটি কলম আছে যাব তাও নয়। একটি মাত্র চুলে যে সূক্ষ্ম তুলি তৈরি হয় সেই কলমের অধিকারী, এককলমী।

১৯৪৫ সনে আমি প্রমথ চৌধুরীর চারটি রচনা ছাপি, এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৮৯০ সনে চুয়াডাঙা থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেখানাও প্রকাশ করি। প্রমথ চৌধুরীর রচনা এর পরে আর কোথাও ছাপা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

দীর্ঘ সাত বছর অন্ধকারের কলকাতায় যুদ্ধের প্রভাব-ক্লিষ্ট শহরের পরিবেশে যত বৈচিত্র্যই থাক, মন অজ্ঞাতসারেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তা হঠাৎ খুব বেশি করে বোঝা গেল ২রা সেপটেম্বর (১৯৪৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পর। সমস্ত মনপ্রাণ শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে যে-কোনো খোলা জায়গায় ছুটে যাবার জন্য ছটফট করতে লাগল। কবি কীটস লিখেছেন—

To one who has been
long in city pent
'Tis very sweet to look
into the fair
And open face of heaven
—to breathe a prayer
Full in the smile of the
blue firmament.

আমি ঐ very sweetএর স্থানে, বলতে চাই, ঐ লাইনটা বদল করা উচিত এইভাবে 'Tis a crime not to look into the fair and open face of heaven.

একটা মিল দেখতে পাচ্ছি—যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রায় দেড় মাস পরেই ভবিষ্যতে কবে আর বাইরে যেতে পারব আশঙ্কায় গিয়েছিলাম দারজিলিং। আমার সঙ্গী ছিল তিনজন, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, কিরণকুমার রায় ও সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। এবারে যুদ্ধান্তে প্রায় সেই একই সঙ্গী—শুধু অতুলানন্দের স্থলে রবি ঘোষ।

গিয়েছিলাম হাজারিবাগ রোডে ও পরে হাজারিবাগ জেলাশহর থেকে রাজরপ্পা। হাজারিবাগ রোডের সামান্য কয়েকটা দিনে যে আশ্চর্য মুক্তির আনন্দ পেয়েছিলাম তা আজও মনে গাঁথা হয়ে আছে। না-শীত না-গ্রীষ্মের আবহাওয়া অথচ তারই মধ্যে একদিন সমস্ত আকাশ জুড়ে ঘনকালো, ধূসর, আর শাদা মেঘের জড়িত বিজড়িত আবির্ভাব, আকাশ জুড়ে তাম্র আগুনের ডালপালা বিস্তার করা বিদ্যুতের মুহুর্মুহু রেখাচিত্রাঙ্কন আর সমস্ত আকাশ জুড়ে গুরুগর্জনের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার আবির্ভাব ঘোষণা, তার সঙ্গে বিপুল বর্ষণ, সে যে কি প্রবলভাবে সুন্দর তা শুধু অনুভব করা যায় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমন দিগন্তব্যাপী ঝড়ের আবির্ভাব কতদিন যে দেখিনি গ্রাম ছাড়ার পর, তাই হঠাৎ মনে হল এ যেন মুহূর্তকালের মধ্যে আমার জন্মান্তর ঘটে গেল। আরো একদিন ঐ স্থানের বিরাট মুক্ত প্রান্তরে নিস্তব্ধ পরিবেশে আকাশ-জোড়া নক্ষত্ররাজির ক্রমআবির্ভাবের দৃশ্যের নিচে বসার দুর্লভ পুণ্য লাভ করেছিলাম। এ সব সে দিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছিল যুদ্ধান্তের দিনে। ফিরে এলাম নতুন জীবন আর উৎসাহ নিয়ে। এ ভ্রমণে সঞ্চয় যা কিছু হল শুধু মনের। ১৯৪৬ সনের কথা এটি এবং ঐ একই বছরের শেষ দিকে আর এক ভ্রমণে যেতে হল এক দুর্লভ দর্শনীয়ের টানে। জলপাইগুড়ি থেকে আমন্ত্রণ এলো, খেদা প্রস্তুত, চলে আসুন। অশোক মৈত্রের পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ, তবু ত্রুটি ছিল না কিছু। এবারে সঙ্গী মাত্র সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। হাতী খেদা দেখা হল, বুনো হাতী বাঁধার কৌশল দেখারও সুযোগ ঘটল, ফোটোগ্রাফ তোলার সুযোগ ঘটল।

কিন্তু জয়ন্তীর জনহীন উঁচুনিচু পাহাড়ী অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে এমন এক গম্ভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম মুহূর্তের জন্য, যা আর কোথাও অনুভব করিনি। আধুনিকতার সকল স্পর্শ বর্জিত হিংস্র জন্তুর

গোপন নিবাসে বসে সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বটাই তার অতীত নিয়ে মনে মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠেছিল। কিন্তু সে কথা এখন আর বলা চলবে না। কারণ এ সবই প্রসঙ্গত এসে গেল, হয়তো অপ্রাসঙ্গিকও মনে হতে পারে। তাই ফিরে যাই বাগবাজার স্ট্রীটে। আসল কথা হচ্ছে মনের দিক থেকে হাওয়া পরিবর্তন দরকার ছিল, তা যথেষ্ট পরিমাণেই হল। এবং ফিরে এসে আর এক অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। এক বন্ধু আমার এই ভ্রমণ কাহিনী শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সব কাগজের খরচে তো? আমি বললাম, না, নিজের। তিনি বললেন, এটা আপনার নির্বুদ্ধিতা। এসে বিল করবেন এবং কাগজের কাজেই যে গিয়েছিলেন তা প্রমাণ করা কঠিন হবে না। বললাম, তা কঠিন না হলেও আমার পক্ষে কঠিন, কারণ, অভ্যাস নেই। তিনি দুতিন দিন ধরে আমাকে এ বিষয়ে বুঝিয়েছিলেন. এবং বলেছিলেন তিনি বাইরে গেলে সবসময় বিল করেন। কারণ অতিরিক্ত কিছু আয়ের পথ কর্তৃপক্ষ এইভাবেই করে রেখেছেন, এটা সবাই জানে। কিন্তু তিনি আমাকে দীক্ষা দিতে না পেরে হতাশ হয়েছিলেন।

আমি অপেক্ষাকৃত নবাগত বলে অনেকেই তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ দিয়ে ম্যাগাজিন সেকশনের সমালোচনা করতেন। নামকরা বিজ্ঞান-লেখকদের নিয়মিত সরল ভাষায় লেখা বিজ্ঞান কথাও চলল না। আর একজন বললেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথেষ্ট বিজ্ঞাপন প্রচার হয়েছে, তাঁর বিষয়ে আর কোনো রচনা ছাপান কি ভাল? আর একজন লিখে জানালেন, হাসির অন্তরালে পর্যায় আর কত দিন চালাবেন? আর একটি ধারাবাহিক রচনা—ব্যক্তিগত জীবনের কৌতুক কাহিনী (দেশী ও বিদেশী)। চলতে না চলতে একজন বললেন ভাল হচ্ছে না। বাইরের অ্যানেকডোট-গুলি অবশ্য বিদেশে বহুখ্যাত ছিল।

নবাগতকে এত সমালোচকের মন রাখার চেষ্টা করতে হয়েছে। কিন্তু পরে এঁদের সবাইকে অগ্রাহ্য করতেই হল। যাই হোক আমি যেসব ধারাবাহিক রচনা নিজে লেখকদের অনুরোধ করে লিখিয়েছি এবং প্রকাশ করেছি তা প্রায় সবই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং খ্যাতিলাভ করেছে। হাসির অন্তরালে একখানি অতি উল্লেখযোগ পুস্তকরূপে সমাদৃত হয়েছে। অবিস্মরণীয় মুহূর্ত চমৎকার বই হয়েছে। এ ছাড়া দুখানি

শিকারের বই। আর একখানি বই 'আমার ঘরের আশেপাশে'—পুস্তকাকারে ছাপা হওয়ার পর 'নরসিং দাস পুরস্কার' পেয়েছে। এই বই সম্পর্কে কিছু পূর্ব ইতিহাস আছে যা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং শুনলে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভও হতে পারে। অনেক আগে থেকে আরম্ভ করতে হবে ইতিহাসটি।

বিষয়টি জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে। ১.-১০-৫৯ তারিখে রেডিওর একটি 'রূপক' শুনে বিস্মিত হলাম। দীপালি দত্ত নামক একটি অনাথ মেয়েকে উদয় ভিলা আশ্রমে রাখা হবে, তার সঙ্গে কথা হচ্ছে। প্রশ্ন হল জগদীশচন্দ্র বসুর নাম জান? মেয়েটি বলল, জানি, তিনি গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন। প্রশ্নকারী শুনে মহা খুশি। বা! বা! তুমি তো অনেক জান, তোমাকে আমরা ভরতি করে নেব।

আমার সমালোচনাটি এই উপলক্ষেই আরম্ভ। গাছের প্রাণ আবিষ্কার করার প্রশ্নটাই এমন অসম্ভব রকমের হাস্যকর যে এ কথাটা কে প্রচার করল সন্ধান নিতে গিয়ে দেখি ছোটদের পাঠ্য প্রায় সকল বইতে ঐ এক কথাই লেখা আছে। কিন্তু কি করে এই প্রাণ আবিষ্কারের প্রশ্ন উঠল? জীববিদ্যা বা বায়োলজির দুটি ভাগ আছে, একটি ভাগে জুওলজি অন্য ভাগে বটানি। উদ্ভিদের জীবন আছে বলেই এই বিদ্যা জীববিদ্যার মধ্যে স্থান পেয়েছে জগদীশচন্দ্রের জন্মের অন্তত আড়াই শ' বছর আগে। কাজেই তিনি গাছকে প্রাণীরূপে জৈববিজ্ঞানের জগতে চিনিয়ে দিয়েছেন এ কথা জগদীশচন্দ্র কল্পনা করেননি কখনো। প্রাণ আবিষ্কারের কথা কোনো প্রাণী সম্পর্কেই অদ্যাবধি ওঠেনি। তবে যদি কেউ বলেন ধাতু একজাতীয় প্রাণী, তখন প্রশ্ন উঠতে পারে প্রমাণ দেখাও। এবং সেই ব্যক্তি যদি একখণ্ড সোনা এনে দেখাতে পারেন, সোনার বৃদ্ধি আছে, মৃত্যু আছে, বাচ্চা হয়, তবে সেই ব্যক্তির বিষয়ে এ কথা বলা চলে যে তিনি সোনাকে প্রাণীরূপে প্রমাণ করেছেন।

তা ছাড়া কোনো প্রাণী বা জীবের প্রাণ তার সর্বাঙ্গে কোষের মধ্যে সঞ্চারিত থাকে। কাজেই তার প্রাণ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আবিষ্কার করা যায় না। এবং সে প্রাণ দেহের অংশ বাদ দিলেও থাকে। আর যদি প্রাণ মানে আত্মা হয় তা হলে সে আত্মাও কোথায় থাকে তার প্রমাণও অদ্যাবধি

পাওয়া যায়নি। কোনো জীবেরই না। অতএব একমাত্র গাছের আত্মা আছে এবং সে আত্মা জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেছেন এমন কথা ঐ পাঠ্য-পুস্তক লেখকগণ, ও তা পাঠ করে যারা এই জ্ঞান লাভ করেছে, তারা ভিন্ন পৃথিবীর আর কেউ জানে না।

এই প্রাণ আবিষ্কার সংবাদ যে মিথ্যা একথা ইতশ্চেতঃতে লেখার পর বহু চিঠি পেলাম আমার মতের বিরুদ্ধে। কেউ লিখলেন জগদীশচন্দ্র যদি গাছের প্রাণ আবিষ্কার না করে থাকেন তবে তিনি কি করেছেন ?

প্রসঙ্গত বলি, আজ এই ১৯৭৩এর এপ্রিল মাসে যখন এই সব কথা লিখছি—আজও আমি অনেক গ্র্যাজুয়েটের কাছ থেকে জগদীশ বসুর কোন্ আবিষ্কার বিখ্যাত, এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি গাছের প্রাণ আবিষ্কার। যাই হোক আমার 'কলমে' এই মূঢ়তার বিরুদ্ধে সোজাসুজি কিছু বলে কোনো লাভ হবে না জেনে কিছু কৌতুকের পথে যেতে উৎসাহিত হলাম। উৎসাহ আরো বাড়ল সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে। সে জানিয়েছিল, কোনো একখানি স্কুলপাঠ্য বইতে লেখা আছে গাছের সুখদুঃখ, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতির বোধ আছে এবং এ সবই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার।

আমি যে পথ অবলম্বন করেছিলাম তা বলার আগে আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা দরকার। মানুষের বিবর্তনের ধারা খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি দেশে এমন কয়েকটি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে যাদের বংশধর এখন কেউ নেই। দক্ষিণ ফ্রানসের ক্রো-মানিয়ঁ গ্রামে এমনি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল—সেই মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে ক্রো-মানিয়ঁ ম্যান। ইংরেজি উচ্চারণে ক্রো-ম্যাগনন। এমনি নেয়ানডারথাল ম্যান, পিকিন ম্যান, রোডেসিয়ান ম্যান, সোলো ম্যান, ইত্যাদি নির্বংশ প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হওয়াতে বিবর্তনের ধারা বুঝতে কিছু সুবিধা হয়েছে। (এর মধ্যে পিলটডাউন ম্যান নামক মিঃ ডসনের একটি ধাপ্পা বাতিল হয়ে গেছে।) আমার লেখার মধ্যে এই সব নাম জীবিত রূপে কল্পিত হয়েছিল, এবং এই ধাপ্পায় কিছু কাজও হয়েছিল। অন্তত তখনকার মতো হয়েছিল। তাছাড়া ডকটর কেঞ্চু নামে এক কল্পিত বিজ্ঞানীকে আমদানি করেছিলাম। এটি আমারই উদ্ভাবিত কেঁচোর একটি ভদ্র নাম। কেঞ্চু নামে একটি গদ্য ছন্দে কাহিনীও

লিখেছিলাম এককালে শনিবারের চিঠিতে। এতদিন পরে সেই কেঞ্চুকে বিজ্ঞানী সাজিয়ে হাজির করা গেল প্রাণ আবিষ্কারের আলোচনার মধ্যে। আরো বিজ্ঞানীর মর্যাদা দেওয়া গেল কেফালোপডকে (শামুক জাতীয় জীব), মারসুপিয়ালকে (অর্থ, পেটে থলে বিশিষ্ট জীব, যেমন ক্যাঙারু)। এ ছাড়া প্রোটোজোয়াকেও বিজ্ঞানী বানিয়েছিলাম।

এইবার আমি যা লিখেছিলাম (১লা নভেম্বর ১৯৫৯, ইতশ্চেতঃতে) তার অংশ উদ্ধৃত করছি (আগের জের টেনে)—

গত সপ্তাহে ইতশ্চেতঃ লিখতে আরম্ভ করেই বুঝতে পারছিলাম মৌচাকে ঢিল ছোঁড়া হচ্ছে। জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার করেছিলেন, এই তথ্যটা দেশে কতখানি প্রচার হয়েছে তা দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কারণ আমি নিজে একখানি সাধারণজ্ঞানের বই লিখছি, এবং ছাপাচ্ছি (কারণ তা ভিন্ন মৌলিক জ্ঞান প্রচারের স্বাধীনতা আর কোন্ বইতে পাওয়া যাবে ?) . আমার বইয়ের একটি অধ্যায় একটু পরেই উদধৃত করব, কিন্তু তার আগে আমার উপর আক্রমণের কিছু কিছু নমুনা দিই :

একজন লিখছেন...দীপালি দত্ত (রেডিওর সেই রূপকের অনাথ বালিকা) প্রসঙ্গে আপনি কি বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা গেল না। উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কিত জগদীশচন্দ্রের সবজন পরিচিত আবিষ্কারকে অস্বীকার করাই কি আপনার উদ্দেশ্য ? আপনার লেখা থেকে আপত্তিকর অংশটুকু উদধৃত করছি—"জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার করেছিলেন, এই মিথ্যা কথাটা অবলীলাক্রমে ঐ মেয়েটি বলল (রেডিওর সেই রূপক প্রসঙ্গে) এবং পরে যারা ভরতি করে নিলেন তাঁরা এই মিথ্যা কথাটা শুনে প্রশংসা করলেন এবং তাকে আনন্দের সঙ্গে ভরতি করে নিলেন এবং নিলেন এমন একটি আশ্রমে যার সঙ্গে অবলা বসুর নাম জড়িত।'—আশা করি আপনার মতটা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবেন। (২৭।১০।৫৯)

আর একজন লিখছেন—আপনার ২৫শে অকটোবরএর যুগান্তরে দীপালি দত্তের ভাগ্যের কথা পড়িয়া মনে হইতেছে যেন জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার করেন নাই।...

ফলিত গণিত বিভাগের (কলি. বিশ্ববিদ্যালয়) বিদ্যার্থী ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র (পঞ্চানন রায়) এক চিঠি লিখে আমাকে বিব্রত করলেন। তিনি লিখলেন...উদ্ভিদের প্রাণ আছে এটা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার এ ভ্রান্ত ধারণা...আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শতকরা নিরানব্বই জন পোষণ করে আসছে।...

এ চিঠি দীর্ঘ। এই প্রথম এক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এমন চিঠি পাওয়া গেল। এ চিঠির পরে আমার মন্তব্য ছিল এই :

এইবার আমার নিজের লেখা বই থেকে প্রতিশ্রুত উদ্‌ধৃতিগুলি নিচে দিচ্ছি।

১। স্পঞ্জ, সামুদ্রিক বিছা, ও কেঁচোর প্রাণ আছে, আবিষ্কার করেন ডকটর জন কেঞ্চু (১২৯৯ খ্রীঃ)।

২। শামুকের প্রাণ আছে, আবিষ্কার করেন ডকটর কেফালোপড (১৩০০ খ্রীঃ)

৩। ক্যাঙারুর প্রাণ আছে, আবিষ্কার করেন, ডকটর মারসুপিয়াল, (১৩৫০ খ্রীঃ)।

৪। বানরের প্রাণ আছে, আবিষ্কার করেন, চার্লস ডারউইন, (১৮৩৬ খ্রীঃ)।

৫। বিভিন্ন জাতীয় মানুষের মধ্যে একমাত্র পিলটডাউন ম্যানের প্রাণ আছে—আবিষ্কার করেন মিস্টার ডসন (১৯১২ খ্রীঃ)। বাকি সব মানুষ, ঘোড়া, গোরু প্রভৃতির প্রাণ আছে কিনা তা এখনও জোর করে বলা যাচ্ছে না। আমি গত কুড়ি বছর যাবৎ গবেষণা করে যে সব প্রাণ আবিষ্কারকের নাম সংগ্রহ করেছি তা সবই এখানে দেওয়া হল। অন্য নাম পাওয়া যায় নি, অতএব আমাকে বাধ্য হয়ে এই অনুমান করতে হচ্ছে যে, অন্যান্য মানুষ, পশু, পাখী ও কীটপতঙ্গের প্রাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি।

ঐ তারিখে এই পর্যন্তই লিখেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই থামেনি, এর জের চলেছিল আরো। এবং মাঝে মাঝে এই প্রসঙ্গ আরো উঠেছে এবং ১৯৭২ সনেও আবার উঠেছে। সে সব একটু পরেই বলছি।

১৫/১১/১৯৫৯ তারিখে আরো লিখলাম—(আসলে এটি আর একটি ধাপ্পা, যদিও দুখানা চিঠি ধাপ্পা নয়)। আমি লিখলাম—

জগদীশচন্দ্র, ও গাছের প্রাণ আবিষ্কার বিষয়, এত চিঠি পাব ভাবতেই পারিনি।... সিংভূম চক্রধরপুর থেকে একজন এই প্রশ্নগুলির উত্তর চেয়েছেন (১) উদ্ভিদের প্রাণ আছে কি? থাকলে কোন্ বৈজ্ঞানিক তা কখন আবিষ্কার করেছেন? জগদীশচন্দ্রেরই বা কি দান রয়েছে? (২) আমরা পিলটডাউন ম্যানের অন্তর্গত কিনা?

উপরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে আর একখানা চিঠির একটুখানি অংশ উদ্‌ধৃত করতে হবে আগে। চিঠিখানা এসেছে হাওড়া থেকে। পত্র লেখক ডকটর কেঞ্চু কর্তৃক স্পঞ্জের প্রাণ আবিষ্কার বিষয়ে আমার বক্তব্য উদ্‌ধৃত করে বলেছেন, স্পঞ্জ যখন উদ্‌ভিদ (পত্র লেখকের মতে) তখন জগদীশচন্দ্র বসু ও ডঃ কেঞ্চু (১২৯৯) এই দুইজনের মধ্যে কাহাকে প্রকৃত আবিষ্কারক বলিয়া জানিব?

উপরের এই প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায়, উদ্ভিদের প্রাণ আবিষ্কারের গৌরব ডকটর কেঞ্চুর প্রাপ্য, অবশ্য স্পঞ্জ যদি উদ্ভিদ হয়। ইটালিয়ান এনসাইক্লোপীডিয়ার তৃতীয় সংস্করণে মিস্টার চেলিনি প্রোটোজোয়া নামক এক জীবুদ্ভিদ বিজ্ঞানী এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন। আমার জ্ঞানের সীমা ঐ বইখানা পর্যন্তই বিস্তৃত।...প্রথম পত্র লেখকের দ্বিতীয় প্রশ্ন—"আমরা পিলটডাউন ম্যানের অন্তর্গত কিনা।"—অর্থাৎ তিনিই আমাদের আদিপুরুষ কিনা। কিন্তু আমি ইতিপূর্বেই নৃবিজ্ঞানী মিস্টার সোলো ম্যান (যাঁর বংশ থেকে জ্ঞানশ্রী সলোমনের উদ্ভব) এবং মিস্টার নেয়ানডারথাল ম্যান (যাঁর উত্তর পুরুষ টমাস ম্যান, হাউসম্যান) প্রভৃতির মত কি, জানবার জন্য বিলেতের টেট,

গ্যালারির অধিকর্তা মিঃ তুলুস লোত্রেক ও হুইপস্নেড পার্কের অধিবাসী বিখ্যাত নরতত্ত্ববিজ্ঞানী ডটকর ফেলিস টিগ্রিসের সঙ্গে পত্রালাপ করেছি।...এঁরা সবাই আমাকে ডকটর ক্রো-মানিয়ঁর সঙ্গে পত্রালাপ করতে বলেন। তাই করেছিলাম। ডকটর ক্রো-মানিয় আমাকে যে চিঠি দিয়েছেন তার সামান্য কিছু তুলে দিচ্ছি—

মঁসিয়ে, আপনার প্রেরিত চিঠি ও আপনার নিজের চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত হয়েছি। বাংলা দেশের শিক্ষার কি এই পরিণাম হয়েছে এখন? গাছের প্রাণ আবিষ্কার কে করেছে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া লজ্জাকর মনে করি। আচ্ছা বলতে পারেন পৃথিবীর মাটি কে প্রথম আবিষ্কার করেছে? প্রথম কে মানুষ আবিষ্কার করেছে? প্রথম কে কাক আবিষ্কার করেছে? প্রথম কে সূর্য আবিষ্কার করেছে?...আমার এই চারটি প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে পারেন তা হলেই আপনার পত্রপ্রেরকের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। নির্বুদ্ধিতার একটা সীমা থাকা উচিত।...ইতি বশংবদ ক্রো-মানিয়ঁ। দরদরেন, পুই ৯-১১-৫৯।

এই চিঠির পরের প্যারাগ্রাফে আরো দুজন কল্পিত বিজ্ঞানীকে আমদানি করতে হয়েছিল, একজন ডকটর ফেলিস পারডুস, অন্যজন মিস্টার প্যাংগোলিন। (প্রথম জন লেপার্ড, দ্বিতীয় জন পিঁপড়ে-খাওয়া প্রাণী)। এবারে আমি যা লিখেছিলাম তা বুঝতে সুবিধা হবে। যথা—

চিঠিখ না ছাপার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রূঢ় ভাষা থাকা সত্ত্বেও দেশের কিছু উপকার হবে বিবেচনায় ছাপাই ঠিক করলাম। আমার নিজেরই বলা উচিত ছিল অ্যালেকজাণ্ডার হিল বা হালিবারটন প্রভৃতি শারীরতত্ত্বে পণ্ডিতগণ এবং জগদীশচন্দ্র বসু একাসনে। প্রথম দুজন মানুষের প্রাণ আবিষ্কার করেন নি, জগদীশচন্দ্র ও গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেন নি। অর্থাৎ ডঃ কেন্দু ও জগদীশচন্দ্র সমগোত্রীয়, কেউ কারো চেয়ে বড় নন (আমার কাছে ডঃ ফেলিস পারডুস-লিখিত একখানি চিঠি আছে, সেটি আমি যে-কোনো মুহূর্তে প্রকাশ করতে প্রস্তুত আছি। পরিশেষে বক্তব্য আমরা পিলটডাউন মানুষের বংশধর নই। ডসন ১৯০৮ সনে তাকে আবিষ্কার করেন ও ১৯১২ সনে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন আইনজীবী, আইন বাঁচিয়ে কাজ করেছিলেন, তাঁর সেই জোচ্চুরি অনেক কাল পরে ধরা পড়ে। এ বিষয়ে আফ্রিকার বিজ্ঞানী মিস্টার প্যাংগোলিন আমার সঙ্গে একমত।

এইবার পূর্বের কথায় ফিরে যাই। ইতশ্চেতঃ কলমে যখন গাছের প্রাণ নিয়ে এই খেলা চলছিল, সেই সময় এক অপরিচিত লেখকের কাছ থেকে এক প্রবন্ধ এসে হাজির। লেখকের নাম অধ্যাপক তারকমোহন দাস পিএইচ-ডি (লণ্ডন)। তাঁর রচনার নাম 'জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেননি, সে চেষ্টাও তিনি করেননি।' ডকটর ক্রো-মানিয়ঁর চিঠি ছাপার পর ডকটর

তারকমোহন দাসের এই প্রবন্ধ ছাপা হল। ফলে অল্প কিছুদিন সবাই চুপ। (যদিও খুব বেশি দিনের জন্য নয়।)—যাই হোক এই উপলক্ষে তারকমোহনকে আমন্ত্রণ জানালাম দেখা করার জন্য। পরিচয় হল। তাঁকে অতঃপর অনুরোধ জানালাম, ধারাবাহিক একটি বিষয়ের রচনা লিখতে। তাঁকে বললাম আমাদের চারদিকে যে সব গাছপালা ফুল প্রভৃতি দেখতে পাই, সে সবের অনেকগুলিরই নাম আমরা জানি না। সেই সব পরিচিত অথচ নাম না জানা গাছপালা ও ফুলফল যাতে আমরা নামেও চিনতে পারি তার জন্যই এই অনুরোধ এবং সেই লক্ষ্য মনে রেখেই লিখতে হবে। আমি আরো বলেছিলাম, (অর্থাৎ আমি কেন এ ইচ্ছা করেছি) আমাদের লেখকেরা অনেকে গল্পের পটভূমি রচনায় প্রকৃতির যে সামান্য সামান্য বর্ণনা দেন তাতে অনেক সময় নাম না জানা ফুল, নাম না জানা পাখী প্রভৃতির উল্লেখ করেন। নাম জানা থাকলে কিছু বৈচিত্র্য বাড়তে পারে। অবশ্য তিনি যদিও খুব যত্ন করে অনেকগুলি সচিত্র প্রবন্ধ লিখলেন পর পর, এবং তা পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে পুরস্কারও লাভ করল (পূর্বে উল্লেখ করেছি এ কথা) কিন্তু ইতিমধ্যে লেখকেরা গল্প উপন্যাস থেকে প্রকৃতিকে মনে হয় একেবারেই বাদ দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর ফিরে পাওয়া গেল না।

জগদীশচন্দ্র ও গাছের প্রাণ বিষয়ে প্রসঙ্গ কিছু কাল চুপচাপ থাকার পরে মাঝে মাঝেই নতুন করে আরম্ভ হয়েছে, এবং আবার এর বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। কিন্তু অশিক্ষিত পাঠ্যপুস্তক লেখক ও উদাসীন শিক্ষা বিভাগের যোগাযোগে জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন এ জ্ঞান অদ্যাবধি সচল আছে। এমন কি জগদীশচন্দ্রের একান্ত স্নেহভাজন ও সহকর্মী বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের একখানা চিঠি ছাপার পরেও পাঠ্যপুস্তক থেকে ঐ মিথ্যাটি দূর হয়নি। গোপালবাবু লিখেছিলেন, জগদীশচন্দ্রের গাছের প্রাণ আবিষ্কারের কথা তিনি জানেন না, কারণ কখনো শোনেননি। অথচ তিনি প্রায় ৫০ বছর সেখানে আছেন।

ইতিমধ্যে তারকমোহন দাসের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল, তা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ আছে। এবং তিনি ১৯৬২-৬৩তে অ্যামেরিকায় থাকতে যে কয়েকখানি মূল্যবান চিঠি (শিক্ষা বিষয়ে প্রধানত) লিখেছিলেন তার কয়েকখানি

কিছু পরেই উদ্ধৃত করছি। কিন্তু তার আগে জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গে আরো একবার কিছু বলতে হচ্ছে। এক পাঠিকার কাছ থেকে ১৯৬৭ সনের প্রথম দিকে এক চিঠি পেলাম তা থেকে জানা গেল কোনো একখানা অভিধানেও ঐ প্রাণ আবিষ্কারের কথা লেখা আছে। এবারে এর উত্তরে আর ঘোরা পথে যাইনি। সোজাসুজি যা লিখেছিলাম তার সারাংশ হচ্ছে এই যে, জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে এ দেশের ভ্রান্তি ঘোচানো আর বোধ হয় সম্ভব নয়। যে-কোনো ছাত্র বা ছাত্রী (স্কুল বা কলেজের) সবাই ঐ একই কথা বলবে, জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন। আমি নিজে বহুদিন ধরে বহু জনকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঐ একই উত্তর পেয়েছি। জগদীশচন্দ্র যে উক্ত চেষ্টা করেননি, কারণ এমন অসম্ভব প্রশ্ন তাঁর মনে আসেনি, আসতে পারে না, কোনো জন্তুজানোয়ার বা কীটপতঙ্গ বা উদ্ভিদ বিষয়ে বা মানুষের বিষয়ে এ প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করানো এদেশে এক অসম্ভব ব্যাপার।

মানুষের আত্মা আছে কিনা এমন কথা বিজ্ঞানী মহলে আলোচিত হওয়ার কথা শুনেছি, কিন্তু সে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। দেহে আত্মার বসতি কোথায়, এ প্রশ্ন নিয়ে আমি বড় প্রবন্ধ লিখেছি এককালে। তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারে, কিন্তু যাদের জন্ম, বৃদ্ধি আহার, বংশ বিস্তার, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় বা আয়ুষ্কাল শেষ হলে মৃত্যু— প্রত্যেকটি মানুষের কাছে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ এবং এই চিহ্ন দেখেই যাদের প্রাণ আছে এই ধারণা, জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ থেকেই স্থান ও কালের ধারণার মতো মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার পরেও তাদের প্রাণ আছে কিনা এ প্রশ্ন একমাত্র পাগল ভিন্ন আর কারো মনে জাগবার কথা নয়।

কোনো জীবের মৃত্যু হলে যদি কারো মনে সন্দেহ হয় মৃত্যু হয়নি, তা হলে সে সন্দেহের মূল্য আছে। অর্থাৎ মৃত্যু হলে প্রাণ আছে কিনা এমন সন্দেহ, কিন্তু প্রত্যক্ষ জীবন্ত থাকতে প্রাণ আছে কিনা এ সন্দেহ পাগলের।

খবর রাখলে জানতে পারা যেত সপ্তদশ শতক থেকে বটানি শাস্ত্র দ্রুত এগিয়ে এসেছে বর্তমান যুগে। জানা যেত রবার্ট হুক নামক এক ভদ্রলোক ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভিদের গঠন নিয়ে আলোচনা করে দেহগঠনের সূক্ষ্ম একক-গুলিকে কোষ বা সেল নামে অভিহিত করেছিলেন। প্রায় এই সময় আরো দুজন বিজ্ঞানী উদ্ভিদের অ্যানাটমি নামক বিদ্যার ভিত্তি গড়ে তুলেছেন।

এই সময় অন্য আর একজন বিজ্ঞানী বীজ-উৎপাদনে পরাগ রেণুর ভূমিকা, পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেছেন। আর এক বিজ্ঞানী পরাগ-যোগ-কাজে কীট পতঙ্গের ভূমিকা আবিষ্কার করেছেন। এবং হাইব্রিডাইজেশন বা সঙ্করণ নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছেন। প্ল্যাণ্ট ফিজিওলজির কার্যধারার নির্ভুল হিসাব করেছেন। এর পর আরো গবেষক আছেন।

কিন্তু এঁরা কেউ প্রাণ আবিষ্কারের মতো মূর্খ-সুলভ বাক্য উচ্চারণ করেননি। জগদীশচন্দ্রও করেননি। এঁরা সবাই গত তিনশ বছরের মধ্যে গাছের প্রাণ আছে জেনেই তার অ্যানাটমি ফিজিওলজি এবং যৌন-জীবন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করে গেছেন।

তবে একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, আমার এসব কথা কেউ শুনবে না। তবু আমি এই ১৯৬৭ (একথা যখন লিখেছিলাম) খ্রীটাব্দে প্রবেশ করেও 'জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছেন' যাঁরা লিখতে সাহস পান, যাঁরা সে লেখা পাঠ্যরূপে চলতে অনুমতি দেন, এবং যাঁরা সে লেখা পড়ান, তাঁরা এদেশে শিক্ষার পটভূমিতে কোন্ ঘৃণ্য স্তরে বাস করেন তার একটা ইতিহাস ছাপার অক্ষরে রেখে দিলাম, ভবিষ্যৎ গবেষকের কাজে লাগবে।

এসব লিখেছিলাম ১৯৬৭ সনের ফেবরুয়ারির প্রথমে। এবং আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী যে বৃথা হয়নি তা বোঝা গেল আর এক সমজাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে। ডকটর তারকমোহন দাস বর্তমান আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত যুগান্তর সাময়িকীতে আর একবার জগদীশচন্দ্র বসু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, অতএব প্রসঙ্গত একথাও লিখতে হল যে, জগদীশচন্দ্র পাগল ছিলেন না, তিনি যা করেছেন তাই করেছেন, প্রাণ আবিষ্কার ইত্যাদির চেষ্টা করেননি। কেন করেননি আমি সেই কথাই এতক্ষণ ধরে বলেছি। আমার সম্পাদন কালে ঐ একই তারকমোহনের জগদীশচন্দ্র বসু প্রবন্ধ ছাপার পর অনেকেই কিছুকাল চুপ করে ছিলেন। কিন্তু এবারে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রবন্ধে যুগান্তর চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হল তারকবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

আবার তা পড়ে আমার মগজের কৌতুককেন্দ্র উল্লসিত হয়ে উঠল। আমি ঐ প্রতিবাদের সমর্থনে চিঠিপত্র বিভাগে পুরাতন কৌশলের আশ্রয় নিলাম অনেক দিন পরে। আমার চিঠিখানা আগাগোড়াই hoax, ধাপ্পা,

কিন্তু এমন গম্ভীরভাবে লিখলাম যাতে অনেকে বিশ্বাস করতে পারে। আমার চিঠি শিরোনাম সহ সবটাই উদ্ধৃত করছি।—চিঠিখানা ছাপা হয়েছিল ১৭/১২/৭২ তারিখে।

বৃক্ষের সুখ দুঃখ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গাছের প্রাণ আবিষ্কার সম্পর্কিত চিঠির (১৩।১২।৭২) বক্তব্য নির্ভুল। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর (১৯৩৭) ঠিক এক বছর আগে ১৯৩৬ সনের ৭ই জুন থেকে ২৫শে জুন তাঁর একান্ত স্নেহভাজন গবেষক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্মাণে যে অসাধারণ নৈপুণ্য আছে, সেই নৈপুণ্যের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র অন্যের অগোচরে কয়েকটি যুগান্তকারী পরীক্ষা চালান। কিন্তু সে যন্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি মাইক্রোসোনিওফোন নামক সেই অসম্পূর্ণ যন্ত্রের সাহায্যে যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, গোপালবাবুর কাছ থেকে আমি তা অনেক দিন আগেই শুনেছিলাম। এই যন্ত্রের দ্বারা জগদীশচন্দ্র বৃক্ষ কোষের বেদনায় ক্রন্দন, ও আনন্দে হাসির শব্দ ১০ লক্ষ গুণ অ্যামপ্লিফাই করতে সমর্থ হন, এবং খুব ক্ষীণ হলেও সে শব্দ তাঁরা দুজনেই শুনতে পান। তা ছাড়াও এমন একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন যার ম্যাগনিফিকেশন ১৪ হাজার। এর সাহায্যে আরো এক অদ্ভুত জিনিস প্রত্যক্ষ করেন। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের বক্তৃতা গৃহে একটি গ্রামোফোন যন্ত্রে একখানি অরকেস্ট্রা-বাদনের রেকর্ড চালিয়ে উক্ত বৃক্ষকোষ সমূহে তার ফলাফল প্রত্যক্ষ করেন। দেখা যায় সঙ্গীতের সুরে কোষগুলি ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে, আবার যন্ত্র বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দনও থেমে যাচ্ছে। একে কোষের নৃত্য বলা চলে। জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল কাজটি সম্পূর্ণ হলে তবে তা প্রকাশ করবেন। তাঁর হাতের লেখা নোট ও অসম্পূর্ণ যন্ত্র দুটি এখনো গোপালবাবুর বাড়িতে রক্ষিত আছে। ডকটর তারকমোহন দাস ও আমি দুজনেই কয়েকমাস আগে সেসব একত্র দেখে এসেছি। তবু কেন যে তারকবাবু ম্যাগাজিন সেকশনে ওরকম লিখলেন তা বোঝা যায় না।

জগদীশচন্দ্রের আরো অনেকগুলি পরীক্ষার বাসনা ছিল, ব্যাঙের প্রাণ আবিষ্কার তার অন্যতম। তাঁর মতে গালভানি ভুল পথে চালিত হয়েছিলেন।

—পরিমল গোস্বামী, কলিকাতা-৫০

আমি এ চিঠি প্রকাশের আগেই গোপালবাবু ও তারকবাবুকে টেলিফোনে শুনিয়ে দিয়েছিলাম। গোপালবাবু একটু ভয় পেলেন, কারণ অনেকেই এ চিঠি বিশ্বাস করে তাঁর কাছে ঐ সব যন্ত্র দেখতে আসবেন। আমি বললাম, যদি কেউ দেখতে চান বলে দেবেন ফ্রান্সের এক বিজ্ঞানী তাঁর কাছ থেকে সম্প্রতি যন্ত্রগুলি, জগদীশচন্দ্রের হাতে লেখা নোট সমেত কিনে নিয়ে গেছেন।

যখন সম্পাদক ছিলাম

দেশের প্রথম শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পথ একেবারে গোড়াতেই বন্ধ করে দেওয়ার এমন ষড়যন্ত্র পৃথিবীর কোনো শিক্ষিত দেশে নেই। আমি সম্পাদক রূপে একা প্রায় পনেরো বছর ধরে শিক্ষার নামে ধাপ্পাটা দেশবাসীর চোখের সামনে ধরে দেবার চেষ্টা করেছি, এখনো করছি। সম্পূর্ণ একা। কিন্তু প্রতারকদের দুর্গ দুর্ভেদ্য, সে দুর্গে কোথাও ফাটল নেই, কোনো দুর্বল অংশ নেই। এ তো শুধু জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে নয়। ইতস্ততঃতে প্রতিবছর অনেকগুলো করে 'পাঠ্য' বই নিয়ে আলোচনা করে আসছি, সে সব বইতে শত রকম মিথ্যা, আজগুবি সব তথ্য বা সংবাদ জ্ঞানবিজ্ঞানের নামে চালানো হয়। শিক্ষা বিভাগে এমন কোনো যথার্থ শিক্ষিত কর্তাব্যক্তির পরিচয় অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি, যিনি এসব বইয়ের প্রতারণা ধরতে পারেন। নইলে চলে কি করে?

আজ শিক্ষার যে পরিণতি হয়েছে তার সূচনা শিক্ষার আরম্ভ থেকেই। শিক্ষা হবে কোথায়? গোড়াতেই শিক্ষা নেই। কাজেই পরীক্ষায় নকল অনিবার্য। আমার এ কাজে খুব সমর্থন আছে। পাস করা যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে শিক্ষার কথা বলার মতো ভণ্ডামি আর নেই। সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষার অপব্যবস্থা, এবং শেষে পরীক্ষা ঘরে নকলের জন্য প্রায় হাহাকার। যেন একমাত্র এটাই অন্যায়। যাঁরা এ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা নিষ্পাপ. শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যায় কাকে বলে একেবারে যেন জানেন না। শাস্তি কার প্রাপ্য একদিন তার হিসাব অবশ্যই হবে।

এইবার অধ্যাপক তারকমোহন দাসের চিঠি কিছু উদ্ধৃত করা যাক।

Tarakmohan Das Ph. D. (London)

Purdue University

Lafayette, Indiana, U.S A.

6. 11. 62

· দেশ হিসাবে অ্যামেরিকা অবশ্য খুবই ভাল, অর্থ ও জিনিসপত্রের এত প্রাচুর্য আর কোথাও দেখলাম না। এখানে অভাব শুধু ভাল কাজ জানা লোকের—তাই সুযোগ সুবিধা এখানে প্রচুর।

মানুষ কাজ খুঁজছে—এটাই দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু কাজ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, এটা আমাদের চোখে কেমন কেমন ঠেকে। সারা পৃথিবী থেকে এরা টেকনিশিয়ান খুঁজে খুঁজে আনে। আমি ইউনিভারসিটির যে বিভাগে আছি, সেখানে বিভাগীয়

অধিকর্তা ছাড়া আর কোন অ্যামেরিকান নেই। আমার সঙ্গে রিসার্চের এবং teaching levelএ দুজন জার্মান আছেন, একজন ক্যানাডিয়ান আছেন, একজন চীনা আছেন। একজন জাপানী ছিলেন, চলে গেছেন সম্প্রতি। দুজন অস্ট্রেলিয়ান আসছেন, কিন্তু কোন অ্যামেরিকান ছাত্র নেই। একটি বাঙালী (সলিল চ্যাটার্জি) এখানে পিএচ-ডি'র রিসার্চ করছেন। অদূর ভবিষ্যতেও যে, কোন অ্যামেরিকান পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনাও নেই। অবশ্য সব বিভাগের অবস্থা এমন নয়। এখানকার ইউনিভারসিটিতে বাঙালী ছাত্রদের বেশ সুনাম আছে, তারা দেশে যাই করুক, এখানে এসে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে খাটে।... বিজ্ঞানের আজ এত অজস্র শাখা উপশাখা হয়েছে যে, প্রত্যেকটিতে উপযুক্ত যথেষ্ট লোক পাওয়া সম্ভব নয়, অথচ প্রত্যেকটিতে চাহিদা রয়েছে যথেষ্ট। তাছাড়া ইউনিভারসিটি এডুকেশনের জন্য এমনিতেই চাহিদার তুলনায় খুব কম ছাত্র আসে। যোগ্যতার অভাব, সহজে কাজ পাওয়া যায়, অল্প বয়সে বিবাহ, এইসব কারণে এখানকার অধিকাংশ ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে টেলিভিশনে এর জন্য প্রচার করা হয়, আন্দোলন করা হয়, যাতে আরও ছাত্র ভরতি হয়। আমাদের দেশে তো ছাত্রদের ভারে জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখাগুলি ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে আজ। আমাদের চোখে তাই এটা অদ্ভুত ঠেকে। আমরা (স্ত্রী পুত্র সহ) এখানে ভালই আছি।...

—তারকমোহন দাস

Lafayette, Indiana

15-3-63

...নিউ ওয়েস্টের পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন সব চেয়ে যে জিনিস আমার মন হরণ করেছিল তা হল এখানকার সুদৃশ্য ক্যাম্পাস।

আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রকম যদি একটি ক্যাম্পাস থাকত, তাহলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালাভ আরো সহজ ও সর্বাঙ্গীণ হতে পারত। আরো পরিষ্কার করে বলছি—একটি ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শুধু একটি ক্লাস বা ল্যাবরেটরির মধ্যে সম্পূর্ণ হতে পারে—এ ধারণা খুবই ভুল। একটি ছাত্রের শিক্ষাজগৎ কখনই একটি ক্লাস-ঘরের মধ্যে বা একটি ল্যাবরেটরির টেবিলের সীমায় সঙ্কুচিত করা যায় না। তার শিক্ষার অনুশীলন, সেই সঙ্গে নিজস্ব চিন্তাধারার বিকাশ ও চরিত্রের সুস্থ সবল পরিণতির জন্য একটি উন্নততর ও বৃহত্তর পরিবেশ অবশ্যই দরকার। একটি আদর্শ ক্যাম্পাস সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। এখানকার স্টুডেন্ট ইউনিয়নগুলিও শিক্ষার এই ব্যাপক রূপায়ণের যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।

এরা এখানকার অন্যতম গর্বের বস্তু। ইউনিয়নগুলিতে কি না আছে? সুবিশাল লাইব্রেরি, থিয়েটার হল, সিনেমা হল, সুসজ্জিত লাউঞ্জ, বলরুম, সুইমিং পুল, এ ছাড়া কত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর দুবেলা আহারের জন্য সুসজ্জিত ডাইনিং হল। এখানে ছাত্রছাত্রীদের পরিচালিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত নানারকম ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের অফিস আছে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি দৈনিক পত্রিকাও আছে। ছাত্ররা

যারা পড়ার খরচ নিজেরা উপার্জন করে নিতে চায়, তাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। ইউনিয়নের বহু পার্টটাইম কাজ এরা পেতে পারে। এখানকার আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ কেন্দ্রই হচ্ছে এই সব ইউনিয়ন। এখানে অধ্যাপকেরাও আসেন এবং সকল বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন।...

এখানকার পার্সোনেল (personnel) অফিসগুলির কাজ হল যেসব ছাত্র পড়াশুনার সঙ্গে রোজগার করতে চান, তাঁদের কাজ খুঁজে দেওয়া। এবং পড়া শেষ হলে যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান, অথবা আরও বেশি পড়তে চান, তাঁদের জন্যও এই সব অফিস সুযোগ খুঁজে দিতে চেষ্টা করে। ..

তারকমোহন দাস

স্টেট পার্ক
পেনসিলভানিয়া
১০-৪-৬৩

আমরা গত কাল পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে 'মানুষ কোন কিছু কিভাবে স্মরণে রাখে' সে সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল।

আমাদের মগজের মধ্যে অগণিত কোষসমষ্টির মধ্যকার নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুগুলি খুব সম্ভব কোন ঘটনা মনে রাখবার ক্ষমতা রাখে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ডিঅক্সিরাই-বোনিওক্লিক অ্যাসিডের এই অণুগুলি কমপিউটার মেশিনের ম্যাগনেটিক টেপ্-এর মত কাজ করে। একটির পর একটি ঘটনা মানুষ যা দেখে বা শোনে, এই অণুগুলি তা রেকর্ড করে রাখে। কোন্ রেকর্ড দীর্ঘস্থায়ী হবে বা কোন্ রেকর্ড পরমুহূর্তেই মুছে যাবে, তা নির্ভর করে অণুগুলির কতটা পরিবর্তন হচ্ছে তার উপর। আমরা একটি অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য দেখলে তার স্মৃতি কোন দিন ভুলি না, চেষ্টা করলেও না। কিন্তু একটি অগ্নিকাণ্ডের খবর কাগজে পড়লে কয়েক দিনের মধ্যেই তা ভুলে যাই। একটা টেলিফোন নম্বর কেউ বললে কয়েক মুহূর্ত পরেই তা ভুলে যাই। এটা স্মরণশক্তির দুর্বলতা নয়। এটাই তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এটা দেখা গেছে চোখের মধ্যস্থতায় যে বার্তা ঐ অণুগুলি পায় তার রেকর্ড অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী হয়। কানের সাহায্যে বা বই পড়ে যা পাওয়া যায় তা তুলনায় অল্প স্থায়ী হয়।

সুতরাং আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা এমন ভাবে বা এমন মাধ্যমে দেওয়া দরকার যা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক মনে রাখবার ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আমরা যদি ক্রমাগত অসংখ্য বিষয় এবং একরাশ তথ্য ছাত্রদের দিয়ে মুখস্থ করাই এবং আশা করতে থাকি যে, এগুলি তারা সারাজীবন ধরে মনে রাখবে, তা হলে তা হবে দুরাশা। এই ধরনের তথ্যগত শিক্ষা কখনও স্থায়ী হতে পারে না। কারণ তা ছেলেদের পক্ষে স্মরণ রাখা, তাদের মগজের স্বাভাবিক ক্ষমতার বাইরে। সাময়িকভাবে পরীক্ষার জন্য কিছুদিন এইসব মনে রাখা যায়, তারপর আর মনে থাকে না।

যখন সম্পাদক ছিলাম

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্রদের কাছ থেকে এটাই কিন্তু চাওয়া হয়, সেই সঙ্গে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে কিছু তাড়াতাড়ি লেখবার ক্ষমতা, অর্থাৎ যেসব ছাত্র সাময়িকভাবে অনেক কিছু মুখস্থ রাখতে পারে, আর সেগুলি তাড়াতাড়ি গুছিয়ে লিখতে পারে, তাদেরই আমরা বেশি মার্ক দিয়ে থাকি। কিন্তু শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তাতে কতটুকু সিদ্ধ হল তা নিয়ে আমরা আদৌ মাথা ঘামাই না। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তথ্যগুলি নিজস্ব করে নেওয়া, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন স্বাঙ্গীকরণ, তাই। এরকম সম্ভব হলে তবে ত তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে নিজ জীবনে ব্যবহার করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা লাভ করা যাবে। মুখস্থগত শিক্ষার ক্রটি আমাদের দেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের মৌলিক চিন্তাধারা বিকাশের পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছে।

এ রকম ঘটবার অন্যতম প্রধান কারণ হল শিক্ষার মূল লক্ষ্যের দিকে নজর না রেখে পরীক্ষায় পাস করার বা পাস করাবার দিকে সবটুকু মনোযোগ নিয়োগ করা। আসল শিক্ষার একটি গৌণ অংশ হল পরীক্ষা, কিন্তু পরীক্ষাই যেখানে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করেন, শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। অর্থাৎ পরীক্ষা শিক্ষার শত্রু। পরীক্ষাকে তাই যথাসম্ভব গৌণ রাখাই বাঞ্ছনীয়। নানা উপায়ে তা করা যেতে পারে। পরীক্ষার সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিয়ে একটি মাত্র পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল না হওয়া একটি উপায়। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে এ রকম করা হয়। তার ফলে কোন একটি পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পরীক্ষা হয়ে পড়ে রুটিন বাঁধা কাজের মত। তাছাড়া এই সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষার ফলে শিক্ষকেরাও পিছিয়ে ছাত্রদের দিকে বেশি নজর দেওয়ার সুযোগ পান। আমাদের দেশে দু'বছর পর একমাত্র পরীক্ষায় ফেল করলে যখন আর কিছুই করবার থাকে না, শুধু গ্রেস মার্ক দিতে হয় তখন।...

মানুষের জানবার ইচ্ছা তার দৈহিক ক্ষুধাতৃষ্ণার মতই একটি সহজাত প্রবৃত্তি। যে-কোন নতুন বিষয় পরিষ্কার জানতে পারলে গভীর আনন্দ লাভ হয়। পৃথিবীর কোন জ্ঞানই তাই দুর্জ্ঞেয় নয়। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাগিয়ে দিতে পারলে সবই তাকে শেখানো যায়। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞান শিক্ষার্থী সহজে গ্রহণ করতে পারে না। দেশে সবাই মিলে প্রকৃত শিক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলুন।

তারকমোহন দাস

ম্যাডিসন,
উইসকনসিন
১-৬-৬৩

আমার অ্যামেরিকার বন্ধুরা অনেকেই একটা প্রশ্ন জানতে চান, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের সঠিক সংখ্যা কত। তাঁরা শুনেছেন সংখ্যাটা অবিশ্বাস্য রকমের কম। তাই যাচাই করে নিতে চান কথাটা সত্য কিনা। কিন্তু তাঁরা শোনেননি, এবং শুনলেও হয়ত তাঁরা বিশ্বাস করবেন না—আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাংলা দেশের অভিভাবকরা

তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আজ কত বেশি উদ্বেগ ও আগ্রহ পোষণ করে থাকেন? ...আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থেরা মাসিক আয়ের শতকরা প্রায় ২০ থেকে ৪০ ভাগ ব্যয় করেন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পিছনে। তবু তাঁদের ছেলে-মেয়েরা যে উপযুক্ত শিক্ষা পাচ্ছে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। এই ধরনের ত্যাগ স্বীকার ও অর্থব্যয় ইউরোপ বা আমেরিকার কোন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারবে না। আমার মনে হয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য আমাদের দেশের অভিভাবকেরা যে নিপীড়ন সহ্য করেছেন, আক্ষরিক অর্থে যেভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যাবে না।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যয়ে ব্যতিব্যস্ত কোন অভিভাবক যদি অ্যামেরিকায় আসেন তা হলে যে দুটি জিনিস দেখে তিনি অবাক হবেন, তা হল গৃহশিক্ষকের অনুপস্থিতি এবং অবৈতনিক স্কুলের শিক্ষা। অ্যামেরিকায় গৃহশিক্ষকের কেন বৃত্তি নেই, আগেও লিখেছি আপনাকে। ইউরোপেও নেই। আমাদের ব্যয়বহুল জটিল শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি দুঃসহ দায় হল এই গৃহশিক্ষক। এর ব্যয় শিক্ষাব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার জন্যই অভিভাবককে বহন করতে হয়। আগে স্কুলের ছাত্রের জন্য ছিল, এখন কলেজের ছাত্রদের জন্য গৃহ-শিক্ষকের বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে। এর উপর 'টিউটোরিয়াল হোম'ও আছে। আমরা ভাবি বাড়িতে যদি শিক্ষক না আসে তা হলে ছেলেরা পড়া তৈরি করবে কি করে। এরা বলে বাড়িতেই যদি শিক্ষক আসবে তা হলে স্কুলে যাওয়ার কি দরকার?

এই সব দেশের শিক্ষাপদ্ধতি মোটামুটি সহজ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। পাঠ্যসূচী যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত। স্কুলেই অধিকাংশ পাঠ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এটাই স্বাভাবিক, এটাই হওয়া উচিত।

এখানকার অবৈতনিক পাবলিক স্কুলগুলির বিরাট ব্যয়-ভার অভিভাবকেরাই বহন করে থাকেন—ট্যাক্স মারফৎ। কিন্তু সেটা কত? এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থেরা আয়ের শতকরা ১৫ থেকে ২০ অংশ ট্যাক্স দেন। পোষ্য-সংখ্যা বেশী হলে এই ট্যাক্স অনেক কম লাগে। অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই লাগে না। কিন্তু সকলেই অবৈতনিক স্কুলের শিক্ষা, বৃদ্ধ বয়সের পেনশন, বেকার ভাতা ইত্যাদি বহু রকম সুবিধা পেয়ে থাকেন। আমাদের মধ্যবিত্তরা হয়ত প্রত্যক্ষভাবে কোনো ট্যাক্স দেন না, কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষার জন্যই তাঁদের আয়ের একটি মোটা অংশ তাঁদের ব্যয় করতে হয়; এবং পোষ্যসংখ্যা যত বেশী হয়, এই ব্যয় ততই বেড়ে যায়, যেখানে নীতিগতভাবে কমে যাওয়াই উচিত ছিল।...

তারকমোহন দাস

ম্যাডিসন, উইসকনসিন

১০-৭-৬৩

...অ্যামেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা ভাল এবং ভাল দিকগুলি সম্পর্কে আপনাকে আগে কিছু লিখেছি। কিন্তু একেবারে যে নিখুঁত তা বলা চলে না। এখানে বড্ড বেশী স্পেশালাই-জেশনের ব্যবস্থা। বিদ্যার সমগ্র রূপটি সেজন্য ছেলেরা গ্রহণ করতে পারে না। বস্তুতঃ

যখন সম্পাদক ছিলাম

কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে ত্রুটিশূন্য হওয়া সম্ভব নয়। যথেষ্ট সমস্যা আছে সকল দেশেই। শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোটা মোটামুটি যাই হোক, তার সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে মাত্র দুজন মানুষের উপর—শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। ইয়োরোপ ও অ্যামেরিকার সব চেয়ে বড় সমস্যা উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া। শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্র অনেক কিছু আশা করে। শুধু বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় তিনি বুঝিয়ে দেবেন তাই নয়, চাই আরও প্রেরণা এবং প্রাণের স্পর্শ। আদর্শ শিক্ষক সব দেশেই বিরল।

অ্যামেরিকায় এমন সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বহু ছাত্রছাত্রী স্কুলের শিক্ষাই সম্পূর্ণ করতে পারে না। এই সুযোগের অভাবে আমাদের দেশে বহু ছাত্র স্কুল কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয়, কিন্তু যেখানে ধনসম্পদ অপরিমেয়, ভোগবিলাসের নানা উপকরণ চোখের সামনে ছড়িয়ে আছে, তার প্রতিক্রিয়াও শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে অনুকূল নয়। এখানকার শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন, মোটর, বান্ধবী ও অ্যালকোহল, এই তিনটি বস্তু তাঁদের সুচিন্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করছে। শিক্ষা-পরিবেশের এই অবস্থাটা আমার ভাল লাগেনি। এখানকার ছাত্ররা চায় তাদের প্রত্যেকেরই একটা করে নিজস্ব মোটর থাকুক, বান্ধবী থাকুক, ছাত্র অবস্থায় বিবাহ হোক, ফলে অপরিণত বয়সের বিবাহ এখানে অনেক। শেষ পর্যন্ত এই সব কারণে তারা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। তাই এখানে বিজ্ঞানের বা ইনজিনিয়ারিং বিভাগের ও ডাক্তারের অসংখ্য পদ শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। এসব পদ পূরণের জন্য ইয়োরোপ, বিটেন, ভারতবর্ষ এবং জাপান থেকে আমাদের মত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়, অথচ নিজের দেশে লক্ষ লক্ষ অল্পশিক্ষিত অ্যামেরিকান রয়েছেন, যাঁরা শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধার জন্যই এই সব পদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেন না।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালের শিক্ষার ব্যবহার পরিবেশ সৃষ্টির যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তা আজ মহাকাশ বিজয়ের যুগেও আদর্শ বলে মনে হবে। এখানকার স্কুলে অভিভাবকদের ও শিক্ষকদের সমিতি আছে। এক অধিবেশনে এখানকার একজন প্রধান সমস্যা কি? তিনি বলেছিলেন, মোটিভেশনের অভাব।......

তারকমোহন দাস

সান ফ্রানসিসকো

২৮-৮-৬৩

আমরা কয়েকদিন হল সান ফ্রানসিসকো শহরে এসে পৌঁছেছি। গতকাল ওয়েবস্টার স্ট্রীটের রামকৃষ্ণ দেবের মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। ঝকঝকে, পরিচ্ছন্ন, ঢেউ খেলান উঁচুনীচু রাস্তা সান ফ্রানসিসকো শহরের যা বৈশিষ্ট্য—দুপাশে ঘন সবুজ তরুশ্রেণী, ক্রমশঃ ঢালু হয়ে দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের কূল অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। দু-পাশে সবুজ গাছগুলির ফাঁক দিয়ে নীল সমুদ্রের শোভা দেখা যায়, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এই রাস্তার মোড়েই রামকৃষ্ণ দেবের সুন্দর পুরানো মন্দিরটি অবস্থিত। এই পথের অন্যান্য বাড়ী থেকে এর গঠনরীতি এমন সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় যা সহজেই পথিকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখতে অনেকটা আবাসিক গৃহের মত, কিন্তু এর মন্দিরের চঙে নানা কারুকার্যময়

চূড়াগুলি সান ফ্রানসিসকো শহরের তথা সারা অ্যামেরিকার প্রচলিত ধারা থেকে এক সুশোভন স্বাতন্ত্র্যের সম্পদ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের বাইরে আমাদের যা সামান্য কিছু নিজস্ব সম্পদ আছে তার মধ্যে ইয়োরোপ, অ্যামেরিকা আফ্রিকা, ও দূর প্রাচ্যের রামকৃষ্ণ দেবের মন্দিরগুলি অন্যতম। দেশ ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে যখন চলে আসি, তখন এই রকম কোন বিদেশী শহরের অপরিচিত পথে আমাদের একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান দেখতে পেলে বিস্ময়ে ও আনন্দে মন ভরে ওঠে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় যে যুগান্তকারী বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তারপর কি হল? স্বামী বিবেকানন্দকে কি ধীরে ধীরে ভুলে গিয়েছে অ্যামেরিকা? তাঁর বাণী কি স্তব্ধ হয়ে গেল সেখানে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের অনেকেরই জানা নেই। আজ অ্যামেরিকার জনসাধারণের এক বিরাট অংশ স্বামীজীকে চেনে এবং তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ একথা বললে বাড়িয়ে বলা হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক আগ্রহী শ্রদ্ধাশীল ও শিক্ষিত অ্যামেরিকান গোষ্ঠী এই সব বেদান্ত সোসাইটির সভ্য। নিউ ইয়র্কে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির নিজেদের বিরাট পাঁচতলা ভবন রয়েছে, সেটাই তাঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। এ ছাড়া বস্টন, শিকাগো, সেন্ট লুইস, সিয়াটল, পোর্টল্যাণ্ড, ও প্রভিডেনসে এদের শাখা ছড়িয়ে আছে। এই সব কেন্দ্রের উপাচার্যরা নিয়মিতভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে বেদান্ত শিক্ষা ও ধর্ম মহাসভার আয়োজন করে থাকেন। এ ছাড়া তাঁরা বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেমন হারভার্ড, বস্টন, শিকাগো, মিশিগান, ভারজিনিয়া ইত্যাদিতে ভারতীয় দর্শন, হিন্দু ধর্ম ও বেদান্তের কোর্স শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ফলে প্রতি বছর বহু তরুণ অ্যামেরিকান ছাত্র-ছাত্রী আমাদের দেশের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে জানবার সুযোগ পান।...আমরা কিন্তু বাইরের অনেক কিছুই জানি, কিন্তু সবচেয়ে কম জানি বা চিনি নিজেকে।.. বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আমাদের মধ্যে যে শক্তি ও কর্মক্ষমতা নিহিত আছে তার দশভাগের একভাগ মাত্র জীবনে কাজে লাগাতে পারি। বাকি নয় ভাগ, সেটা জানা না থাকার জন্যই জীবনে কাজে লাগে না।..

তারকমোহন দাস

উইসকনসিন
১৬-২-৬৪

এত রোদ আর ঠাণ্ডার মিলন উত্তর অ্যামেরিকা ছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র বিরল। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র, ঘরের মধ্যে বসে কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে দেখলে মনে হয় ছাতা ছাড়া বেরুনোই অসম্ভবই। অথচ বাইরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কবিন্দুর বহু নীচে ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রীর মধ্যে। এই রোদের মধ্যে এক ফোঁটা জল পড়লে সঙ্গে সঙ্গে জমে বরফ হয়ে যায়। উত্তর ইয়োরোপে এত রোদ পাওয়া মহা সৌভাগ্যের কথা, ইংল্যাণ্ডে তো বটেই। শীতকালে লণ্ডনে টেমস নদীর জল জমে বরফ হয় না, অ্যামেরিকার নায়াগারা জলপ্রপাতের জল জমে যায়, চিত্রার্পিত দৈত্যের মত।

যখন সম্পাদক ছিলাম

শীতের প্রকোপ এবার শীতের শেষের দিকেই বেশী। উইসকনসিনে লেক মণ্ডোনার আইস হকির মরশুম চলছে পুরোদমে। আর সেই সঙ্গে আইস ফিশিং। এই দুটি শীতের আমোদ এখানকার ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয়। সবুজ মাঠের উপর আমেরিকানদের হকি খেলতে আমি দেখিনি, কিন্তু বরফ জমা লেকের উপর এদের হকি জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে এই খেলা চলে। আমার মুভি ক্যামেরায় টেক্‌নিকালার ফিলমে আইস হকির অনেকগুলি দৃশ্য চমৎকার উঠেছে। বরফের উপর রোদ পড়লে এক ধরনের চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতার সৃষ্টি হয়, সান-গগ্‌লস না পরলে ভালভাবে তাকান যায় না। চোখের ক্ষতি হয়। কিন্তু একটু সাবধানে কাজ করলে মুভিতে ছবি খুব ভাল আসে।

মুভি ক্যামেরার ব্যবহার আজ শুধু সিনেমা-দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য বা শৌখিনদের 'ছবি' হিসাবেই যে চলে তা নয়, শিক্ষার বিস্তারে ও বিজ্ঞানের গবেষণাগারে এর ব্যবহার এখন অপরিহার্য।

আমাদের পাশের বাড়ীটি হল উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত। এখানে মানুষের দেহের নানা অংশ বিশেষতঃ হার্টের ব্যাধি সম্পর্কিত গবেষণায় নানা জাতীয় মুভি ক্যামেরা ব্যবহৃত হচ্ছে। আলোর বদলে এক্স-রশ্মি টিউব এবং এক্স-রশ্মি ফিলম ব্যবহৃত হয়। আমার ভারতীয় বন্ধু ডক্টর আফানসো এই বিভাগে গবেষণা করেন। তিনি একটি কুকুরের দেহে অন্য কুকুরের হার্ট ট্রানসপ্লান্ট করার কাজে নিযুক্ত আছেন। একদিন তিনি আমি ও আমাদের বাড়ীওয়ালা মিস্‌টার ও মিসেস ক্লিংগার গাড়ি করে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। আমরা সকলে একই বাড়ীতে থাকি। কথায় কথায় মিসেস ক্লিংগার বলছিলেন, "এবার যদি আমার হার্ট খারাপ হয় তা হলে তা মেরামত করে দেবে।" তাঁর স্বামী টিপ্পনি কাটলেন "আফানসো তোমার আসল হার্টের বদলে কুকুরের হার্ট জুড়ে দেবে। তুমি তখন শুধু ঘেউ ঘেউ করবে।" মিসেস বললেন, "তাই বা কম কি? আমি তখন আরও বিশ্বস্ত হব, আর আরও অল্পে সন্তুষ্ট হব।"

আমি যতদূর জানি আফানসো ও তাঁর অধ্যাপকেরা এই ধরনের অস্ত্রোপচারের পর একটি কুকুরকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। আফানসো বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, ভবিষ্যতে মানুষের ব্যাধিগ্রস্ত হার্ট সম্পূর্ণ বদল করা সম্ভব হবে।...

তারকমোহন দাস

এই পত্র লেখার তিন বছরের মধ্যে ১৯৬৭ সনের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রিশ্চিয়ান বারনার্ড মানুষের দেহে হার্ট ট্রানসপ্ল্যান্ট করেছেন সাফল্যের সঙ্গে।

Dept. of Plant Pathology
College of Agriculture
Wisconsin University, Madison-6
U. S. A. 17-12-63

গতকাল রূপা কম্পানীর শ্রীমেহরার চিঠিতে জানলাম আমার বইটি [আমার ঘরের

আপেপাশে] দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিং দাস পুরস্কার পেয়েছে। আপনার কথাই আমার সর্বপ্রথম মনে হচ্ছে। আপনারই অনুরোধে আমি বইটি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। আপনার সক্রিয় উৎসাহ ও সাহায্যেই বইটির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে। আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেজন্য।

আমি এখন উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি, উপবের ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারছেন। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি অপরূপ। চারিদিকে লেক ও সবুজ বার্চ, পাইন ও ম্যাপল-এর রাজ্য। ধীরে ধীরে তারা এখন বরফের কম্বলে ঢাকা পড়ছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অ্যামেরিকার পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম। আমি এখানে একটি উদ্ভিদ কোষের মধ্যে ভাইরাস্ প্রবেশ করলে কি কি পরিবর্তন ঘটে তাই জানবার চেষ্টায় আছি। আমার হাতিয়ার হচ্ছে কয়েকটি অতি শক্তিশালী phase ও ইউ. ভি. মাইক্রোস্কোপ ও একটি ভাল 16mm মুভিক্যামেরা, যার গতি ইচ্ছামত বাড়ানো কমানো যায়। কোষের মধ্যে যে ক্রমপরিবর্তন দুচার দিন ধরে চলে তা অতি মন্থরগতিতে ক্যামেরা চালিয়ে মুভি ফিলমে ধরা সম্ভব।

তারকমোহন দাস

438 West Johnson St.
Madison-3. Wisconsin
July 12, 1964

...আমাদের এক বন্ধু এখানকার কার্ডিও-ভ্যাস্কুলার বিভাগে গবেষণা করেন। তিনি বলেন অধিকাংশ হৃৎপিণ্ড নিখুঁত নয়, কিছু না কিছু গণ্ডগোল আছে। ভদ্রলোক নিজে সম্প্রতি হার্টে কিছু কষ্ট পাচ্ছেন। তবে তাঁর আশা আছে চার পাঁচ বছরের মধ্যে পুরাতন হৃৎপিণ্ড বাতিল করে নূতন হৃৎপিণ্ড বসাতে পারা যাবে। বর্তমানে মেরামত কাজ যথেষ্ট করা যাচ্ছে।

আমরা অকটোবরের শেষে এখান থেকে রওনা হব, ইয়োরোপে একমাস থাকব। সামনের মাসে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছি। উদ্ভিদের কোষের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তার অনেক মুভি ফিলম তুলেছি। এডিনবরোতে ইনটারন্যাশন্যাল বটানিক্যাল কংগ্রেসে এই মুভি দেখানো হবে।..

গত বিশবছরের মধ্যে শিক্ষা ব্যাপারে যে অগ্রগতি ঘটেছে তার আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আমাদের দেশে অনেক কিছুই করবার আছে। একটা ছোট উদাহরণ দিই—অ্যামেরিকা বা ইয়োরোপে 'গৃহশিক্ষক' নামক কোন জীব নেই। গৃহশিক্ষক রাখবার কথা এখানে কেউ কল্পনাও করে না, অথচ আমরা গৃহশিক্ষক রেখেও ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারি না।

অনেক দিন বাংলা সাহিত্যের কোন খবর জানি না। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব বইই আছে, বাংলা ভাষা পড়ানোও হয়। আমাদের বাংলা

দেশের সম্ভবত একমাত্র গর্ব করার বিষয় তার সাহিত্য। দুঃখের বিষয় শুধু এই কারণেই অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে, এক ধরনের complexএ ভোগে, ভারতের বাইরেও তার প্রমাণ পেয়েছি।...

তারকমোহন দাস

Madison, Wis.

...আমরা দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ ধরে অ্যামেরিকার পশ্চিম সমুদ্রকূল বরাবর বেড়িয়ে এলাম। প্রথমে গিয়েছিলাম কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানীদের এক সম্মিলনে। পর্বতমালার কোলে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সত্যই দেখবার মত। এখানকার রোমান স্থাপত্যের অনুকরণে পাথর দিয়ে তৈরী বাড়িগুলি, ফুলফলশোভিত দীর্ঘ বনগুলি ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার single cellএর চলচ্চিত্র-গুলি এখানে খুব সুনাম অর্জন করেছে। এখান থেকে আমরা গিয়েছিলাম সল্ট লেক সিটিতে। ছোট সুন্দর শহর, এই হ্রদের কথা আমরা ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম। কোটি কোটি বছর ধরে এর বিরাট জলভাগ ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসছে, তীরে লবণের স্তূপ। এখানে জলে নুনের পরিমাণ শতকরা ২২ ভাগ। এর জলে মানুষ ডোবে না। জল, পানের উপযুক্ত নয়। পাহাড়ের কোলে এই হ্রদটির চারিদিকে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। এরপর নেভাডার মরুপ্রায় অঞ্চল দিয়ে গেলাম ক্যালিফোরনিয়ায়। নেভাডার অঞ্চলটি বিচিত্র। এখানকার লোকেরা দিনের বেলায় মরুভূমির আরবদের মত পড়ে পড়ে ঘুময়। রাত্রিবেলা হাজ.র হাজার আলোর রোশনাই জ্বলে ওঠে। সমস্ত রাত জুয়া খেলা চলে, আর নরনারীর উদ্দাম নৃত্যোৎসব। জুয়াখেলা এখানে বেআইনি নয়, এ রাজ্যের এটাই প্রধান ব্যবসা। মিডওয়েস্ট ও ক্যালিফোরনিয়া থেকে বহু লোক এখানে আসে আমোদ করার জন্য। লাস ভেগাস ও রিনো এখানকার প্রধান কেন্দ্র।

আমরা রাত তিনটের সময় রিনোতে পৌঁছেছিলাম, অথচ রাস্তাঘাটে লোকজন ও যানবাহনের অসম্ভব ভিড়। মধ্য রাত্রে মধ্যদিনের কর্মব্যস্ততা। ক্যালিফোরনিয়ার সানফ্রানসিসকো শহরটি আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কূলের এই শহরটি, এর আবহাওয়া, লোকজনের ভিড় আমাদের দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রচুর চীনা, এখানকার চায়না টাউনটি দেখবার মত। সানফ্রানসিসকোর বার্কলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটী বেশ ভাল লাগল।

.. আপনি লিখেছেন আপনার জন্য একটি নূতন হার্ট কিনে আনার জন্য। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই জন্য একটা করে নূতন হার্ট দরকার।

তারকমোহন দাস

দুদেশের শিক্ষার পাশাপাশি ছবি দেওয়া গেল আরো পরে দেওয়া যাবে।

ম্যাগাজিন সেকশনের একমাত্র সহকারী সম্পাদক ছিল ভূষণচন্দ্র দাস এর কথা আগে উল্লেখ করেছি। এ রকম অদ্ভুত ভাল মানুষ সহজে দেখা যায় না। কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের সঙ্গে একটা দিকে অদ্ভুত মিল। কাজে কোথাও ফাঁকি নেই, সততা সমস্ত সত্তায়। অফিসের কাজের বাইরে আমার বহু ব্যক্তিগত বিপদে ভূষণচন্দ্র না হলে আমার কি দুর্দশা ঘটত, তা ভাবলে শিউরে উঠি। নিজের আরাম তুচ্ছ করে আমার বহু সঙ্কটে ভূষণচন্দ্র এসে পাশে দাঁড়িয়েছে পরমাত্মীয়ের মতো। সে সব কথা বলতে গেলে একখানা বই হয়ে পড়বে। মনুষ্যত্বের বিচারে ভূষণচন্দ্র আমার তুলনায় অনেক বড় এ বিশ্বাস আমার মনে কোনো একটি বা দুটি ঘটনায় আসেনি। দিনের পর দিন একসঙ্গে কাজ করে সেটি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছি। আমার অনেক কাজ কোনো কোনো সময়ে তাকে আঘাত দিয়েছে, সেজন্য আমি বিষম পীড়া বোধ করেছি মনে মনে।

ম্যাগাজিন সেকশনের কাজ দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল। তখন ভূষণের কাজও সেই পরিমাণে বাড়ল। কিন্তু তাতে অফিসের বাইরের কাজ তার বন্ধ থাকেনি। যেখানে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্কট সেখানে ভূষণচন্দ্র হাজির। সঙ্কট পার করিয়ে দিয়ে তবে তার মুক্তি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কেউ মারা গেলে শ্মশান পর্যন্ত তার শবানুগমন বোধ করতে পারবে না কেউ। আমি আগের এক অধ্যায় বলেছি, যখন আমি যুগান্তরে আসিনি, তখন ১৯৩৮ বা সেই সময় ভূষণচন্দ্র বছরে একবার বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমার কাছ থেকে পূজা সংখ্যার জন্য লেখা নিতে আসত। বলেছি, দেখেই ভয় হত। ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না, ঠিক তারিখে লেখা দিতেই হত। সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী ভূষণচন্দ্রকে ভীষণবাবু বলে সম্বোধন করত। ঠিক ঐ একই কারণে। কাজে যার কখনো ফাঁকি নেই, সব সময় সীরিয়াম এবং সর্বোপরি যথাসাধ্য—এবং অনেক সময়েই সাধ্যের অতিরিক্ত জনসেবায় নিযুক্ত, তাকে ভীষণবাবু বললে অন্যায় হয় না কিছু।

ম্যাগাজিন সেকশনে কাজ বেড়ে গেলে ক্রমে আরো সহকারী নেওয়ার দরকার হয়ে পড়ল। প্রথমে এলো কিষণচাঁদ বর্মণ। প্রায় কচি ছেলে, কিন্তু কাজের লোক, তদুপরি কাজ শেখায় আগ্রহী। পুরো পাঁচ বছর

তার সহযোগিতা পেয়েছিলাম। মধুর স্বভাব এবং কর্মনিষ্ঠ। যুগান্তরে সে কাজ করেছিল ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত। তারপর তার যুগান্তর ছেড়ে বেতার জগৎ পাক্ষিক পত্রিকায় যোগদান। এখানে সে সাত বছর ছিল এই সরকারী চাকুরিতে। নিজগুণে ক্রমে তার উন্নতির উর্ধ্বগতি। কলকাতা থেকে পরে সে দিল্লী চলে গেল এবং বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে যোগ দিল ১৯৬২তে। তারপর বিজ্ঞাপন বিভাগের অ্যাসিস্টাণ্ট ডাইরেকটর, তারপর পাবলিকেশনস ডিভিশনের বাংলা বিভাগে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। ১৯৬৯ থেকে অদ্যাবধি অর্থাৎ আজ যখন মে, ১৯৭৩ তারিখে এটি লিখছি তখন অবধি সে এই পদে অধিষ্ঠিত আছে। কলকাতা থাকতেই সে নানা কাগজে লিখত, ইংরেজি বা বাংলা। আমার প্রতি তার একটা প্রীতির সম্পর্ক আজও অব্যাহত, এবং পত্র বিনিময়ে ছেদ নেই বললেই চলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। অশোক সেন (অবসর প্রাপ্ত ডাইরেকটর জেনারাল, ইনফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং) ও তস্য সহধর্মিনী শ্রীমতী আরতি সেন ও কিষণচাঁদের বিনম্র ব্যবহারে বিশেষ প্রীত ছিলেন। এখন চাকরির চাপে পড়ে অনেক গুণই তার স্ফুরণের সুযোগ আর পাচ্ছে না।

আরো একজন এলো কিছু পরে। তার নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। খুব লাজুক (বোধহয় কেবল আমার কাছে!) এবং নম্র। (আমি ১৯৫১-মণ্ডলের আশুর কথা বলছি।) সংবাদ বিভাগে কলকাতা শহরের নানা পরিচয় সংবলিত রচনা সে অন্য বিভাগে ধারাবাহিক লিখছিল। তারপর দিনে এক ইঞ্চি করে এগিয়ে আসতে আসতে একদিন ম্যাগাজিন সেকশনের দরজায় এসে হাজির। ৩০০ গজ আসতে পুরো এক বছর লাগল।

সাংবাদিকতায় আগ্রহ, অথচ নিজে মৌলিক গল্প উপন্যাস রচনায় তখন থেকেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমার বিভাগে কিছু কিছু খুচরো লেখার পর তাকে একটা ফীচার লেখার ভার দিলাম। কাজটি কঠিন কিন্তু প্রায় সব সময়েই সমাজের কিছু উপকার হবে কল্পনা করেই এই ফীচারের কথা ভেবেছিলাম। আশুতোষকে বললাম শহরের যত রকম প্রতারণা আছে পরপর তা নিয়ে রচনা লেখ। এবং এর জন্যে থানায় যেতে হবে তথ্য সংগ্রহের জন্য, তাও দরকার হলে যাবে। আশু অবিলম্বে কাজে লেগে

গেল। বহু কৌশলী প্রতারণা-শিল্পীর বহু চিত্তাকর্ষক সংবাদ সে সংগ্রহ করে অনেক রচনা লিখেছিল। কোনো কোনো পাঠকও কিভাবে প্রতারিত হয়েছেন তার তথ্য লিখে পাঠাতেন। কিন্তু সব যখন শেষ হল, তখন বোঝা গেল এতে সমাজের কিছুমাত্র উপকার হয়নি। কারণ যাঁদের জন্য এ সব লেখা হল, তাঁরা প্রতারিত হতে ভালবাসেন, এবং যিনি যে রকম প্রতারক পছন্দ করেন, তিনি ঠিক সেই রকম প্রতারক খুঁজে নেন। প্রতারিত হওয়ার মধ্যে দারুণ একটা রোমাঞ্চ আছে, তা থেকে পাঠকেরা বেশি দিন বঞ্চিত হতে রাজি হননি। এবং সে প্রতারণা অদ্যাবধি সমানে চলছে, এবং এর মোহে আকৃষ্ট হওয়ার লোকও ক্রমে বাড়ছে।

১৯৫৫ সনের সেপটেম্বর মাসের গোড়ায়, তুষারকান্তি ঘোষ আমাকে ফোনে জানালেন 'আপনার সিনেমা বিভাগের জন্য আমি সহকারী রূপে '—' কে যোগ দিতে বলেছি।' আমি বললাম, আমি সিনেমা বিভাগের সম্পাদক নই, রবিবারের ম্যাগাজিন সেকশনের সম্পাদক।' তুষারবাবুর সম্ভবত ধারণা ছিল দুটি বিভাগ একজনেরই অধীন। আমি তৎকালীন সেক্রেটারি রতননাথ দত্তকে বললাম, তুষারবাবু যাঁর নাম করেছেন, তাঁকে আমি চিনি, তিনি সম্পূর্ণভাবে সিনেমার লোক। আমার বিভাগে এলে খুবই অসুবিধা বোধ করব দুজনেই। একথা বলবার আরো কারণ আশুতোষ ইতিমধ্যে তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছে, এবং এ বিভাগের কাজের সঙ্গে অনেকখানি পরিচিত হয়েছে। যাই হোক সিনেমার লোক এ বিভাগে আর এলেন না, রতনবাবু ব্যবস্থা করলেন যাতে আশুতোষই নিযুক্ত হতে পারে।

এডিটিংএর প্রধান কাজ হল শতশত বাইরে থেকে আসা লেখার ভিতর থেকে বিবেচনা-যোগ্য লেখা সব বাছাই করা। সে কাজ বেশির ভাগ, অন্তত গল্প বাছাই করার কাজ, ভূষণচন্দ্রের উপরেই ন্যস্ত ছিল বেশি। কিষণচাঁদও এ কাজে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু মাসে শতাধিক লেখা এলে কাজটা কঠিন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে কিষণচাঁদ্ বেতার জগতে চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ চলে আসাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। আর শুধু সাপ্তাহিকের কাজই তো নয়, বছরে একবার শারদীয় সংখ্যা ছেপে বার করা সে এক অমানুষিক ব্যাপার। এ কাজে ভূষণচন্দ্র ছিল

ভীষণ নির্ভরযোগ্য, এবং তার নিষ্ঠার জন্যই আমাকে তখন অনেকটা হাল্কা মনে হয়েছে। তারপর আশু যোগ দিল ভূষণচন্দ্রের সঙ্গে, কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হতে লাগল। পূজা সংখ্যা সম্পাদনে ভূষণচন্দ্র সত্যাই ভীষণচন্দ্রের রূপ ধরত।

আশু সম্ভবত আত্মজীবনী লিখছে, অথবা ডায়ারি। তার কয়েকখানি পাতা আমাকে দেখতে দিয়েছিল। তার একটি অংশ পড়ে আমি সত্যাই অভিভূত হয়ে পড়েছি। তার লেখা থেকেই আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সে আমাকে দাদা বলে ডাকে. সেই নামই এতে আছে।

> ১৯৬৩ সনে মে মাসে দাদা অবসর নিলেন, এবং আরো এক বছর এক্সটেনশনে ছিলেন। ভাবতেও অস্বস্তি, তাঁর জায়গায় আমি সাময়িকী সম্পাদক। আটদশ দিন তাঁর চেয়ার টেবিল খালি পড়ে ছিল। আমার কেবলই মনে হত ওই চেয়ারে বসার যোগ্যতা আমার নেই, ওটা সম্পাদকের চেয়ার যত না, তার থেকে ঢের বেশি···আমার দাদার চেয়ার।—শেষে সেক্রেটারিকে বলে ঐ চেয়ার আমি বদলে নিলাম।

আশুর বিরুদ্ধে আমাদের সবাইর একটা ক্ষোভ আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, তার উপর কেউ রাগতে পারে না। সে নিজে আশুতোষ অর্থে আশুতোষ কিনা, জানি না, কিন্তু তার ব্যবহারে অল্প সময়ের মধ্যেই সবাই আশুতোষ হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে আর এক মৃত্যু সংবাদে আমার পূর্বে উল্লেখ করা মৃত ও জীবিতের তালিকা থেকে আরো একটি নাম মৃতের তালিকায় উঠে গেল। আমাদের পূর্ব আড্ডার বন্ধু কৃষ্ণধন দে। তার কথা পূর্বে বলেছি এবং তার একটি ছন্দে লেখা ছোট গল্পের কথাও বলেছি। সে ছিল আমার সমবয়সী। রহস্য-গল্প লেখায় হাত ছিল, যেমন হাত ছিল তার মধুর কাব্য রচনার। আমি শ. চিঠিতে থাকবার সময়, মনে হয় ১৯৩৪ বা ৩৫ সনে কৃষ্ণধন দের স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। কৃষ্ণধনকে সে সময় অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় দেখেছি। কথা বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত অনেক সময়, আমার ঘরে বসে—অর্থাৎ শ. চিঠির অফিসে বসে।

কৃষ্ণধনের অনেক লেখা আমি ছেপেছি, যুগান্তরেও। খুব প্রিয় আড্ডাধারী ছিল সে। বঙ্গশ্রীর আড্ডায় একদিন ঠিক হল মুখে মুখে সবাই মিলে এক লাইন করে কবিতা রচনা করবে। কৃষ্ণধন এমন একটা কঠিন মিল

লাগাল তার রচিত লাইনটিতে যে তার পরের লাইন যোগ করতে আমাকে বেশ একটু ভাবতে হয়েছিল। কিন্তু সব মিলিয়ে কি হয়েছিল এখন আর মনে পড়ে না। সেটা যে অন্তত মুদ্রণযোগ্য হয়নি, তার প্রমাণ, শেষ পর্যন্ত তা মুদ্রিত হয়নি বঙ্গশ্রীতে, যদিও কথা ছিল সেই রকম। কিন্তু আমাব এ লেখার ষষ্ঠ অধ্যায়ে আর এক খেয়ালের কথা বলেছি—পূজা সংখ্যায় এক পৃষ্ঠার গল্প লিখতে হবে। এই গল্পগুচ্ছে কৃষ্ণধন দে 'মরণের পরে' (বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪০, ইং ১৯৩৩) নামক একটি ভারী সুন্দর এক পৃষ্ঠার গল্প লিখেছিল। আজ তার মরণের পরে আমি সেই কথা লিখছি। কৃষ্ণধনের মৃত্যু ঘটল ৩০শে মার্চ ১৯৭৩ তারিখে।

আমার জীবিতের তালিকা ক্রমে শীর্ণ হয়ে আসছে, কিন্তু তবু জানি শেষ হবে না আমার জীবিতকালে। শেষ না হোক, এই কামনা করি।

॥ বারো ॥

যুগান্তরে ফিরে আসি। ম্যাগাজিন সেকশনে আরো কাজ বেড়েছে। আমি প্রথম থেকেই (১৯৪৫) নিয়ম করেছিলাম প্রতি সপ্তাহে যে লেখা যাবে, একটা খাতায় তার সূচিপত্র নিয়মিত রেখে যেতে হবে। সেও একটি কঠিন কাজ। কারণ যা প্রেসে গেল সব ছাপা হত না স্থানাভাবে। এটা করেছিলাম, ভবিষ্যতে এটি বিশেষ কাজে লাগবে বলে। কার লেখা, কি লেখা, কবে বেরিয়েছিল, তা ঐ খাতায় লেখা সূচিপত্র থেকে জানা যেতে পারবে। তা ছাড়া যে লেখা আসত তার তালিকা করা, লেখক বা লেখিকার নাম ঠিকানা সহ, সেও আরম্ভ হল। কারণ ১৯৪৫ সনে এর দরকার বোধ হয়নি। বাইরে থেকে আসা লেখার পরিমাণ শেষে এত বেড়ে গেল যে, তখন আরো লোক না হলে আর চলে না। আর একটা কথা বলতে ভুলেছি—পুস্তক সমালোচনা বিভাগটাও আমাদেরই অধীন ছিল। তার হিসাব রাখাও ক্রমে কঠিন হয়ে উঠল। দুখানা করে বই দিতে হয় এজন্য। একখানা সমালোচকের প্রাপ্য, অন্যখানা যুগান্তর লাইব্রেরির জন্য। বইয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। সব দিকে বিবেচনা করে আমার পূর্ব পরিচিত দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যকে এনে বসানো গেল এ বিভাগে। দ্বারেশ ইতিপূর্বে শনিবারের চিঠিতে কাজ করেছে আমার বিদায়ের পরে। গুণী লোক। এম-এ পাস, গল্প উপন্যাস লিখেছে, সে লেখা আমার বেশ ভাল লেগেছিল। দ্বারেশ কিছুদিন একটা কলেজে অধ্যাপনাও করেছিল, এবং সে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, এখনো আছে। তার আরো একটি গুণ সে কোষ্ঠীবিচারক এবং ভৃগুজাতক ছদ্মনামে জ্যোতিষ বিষয়ে নানা বই এখনও লিখছে। এ'দিক থেকে সে খুব জনপ্রিয়। অথচ যুগান্তরে তাকে জার্নালিস্ট রূপে দেওয়া সম্ভব হয়নি, সে ম্যাগাজিন সেকশনে বসে অন্যান্য কাজ করে, পুস্তক সমালোচনাও লেখে।

যুগান্তরে লেখকরূপে যাঁদের নাম আগে করেছি—তারপর শশিশেখর বসু, রাজশেখর বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গো-পাধ্যায়, কালিদাস নাগ, বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস রায়—এই

ছয়জন আগের যুগের লেখক তাঁদের নানা রচনা দিয়ে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তা ছাড়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পুত্রবধূ অবন্তী দেবীকে অনুরোধ জানিয়ে অনেক প্রাচীন চিঠিপত্র প্রকাশের সুবিধা পেয়েছি। বনবিহারী মুখোপাধ্যায় শক্তিশালী লেখক ছিলেন এ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে। এমন বহুমুখী প্রতিভার দেখা সহজে মিলবে না। ত্রিশ বছর পরে তাঁকে আবার লেখায় প্ররোচিত করা গেল, এবং আমি তাঁর ঘোর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পুনর্লিখনে রাজি করিয়েছিলাম, এবং তাঁর আগের দিনের ভুলে যাওয়া লেখাগুলি উদ্ধার করে পুনঃপ্রচার করেছিলাম। এসব কথা আমার স্মৃতিচিত্রণ, দ্বিতীয় স্মৃতি, ও আমি যাঁদের দেখেছিতে বিস্তারিতভাবে এবং পত্রস্মৃতিতে সংক্ষেপে বিবৃত করেছি। একমাত্র শিশিরকুমার ভাদুড়িকে নানা ভাবে অনুরোধ জানিয়েও কিছু লেখাতে পারিনি। তিনি অবশ্য লেখকরূপে পরিচিত ছিলেন না কোনো দিন, কলেজের বি-এ ইংরেজি নোট বই লিখেছিলেন এককালে (১৯১৭/১৮)। তবু আশা করেছিলাম তাঁর কোনো-না-কোনো বক্তব্য তাঁকে দিয়ে লেখাতে পারব। কিন্তু সফল হইনি।

ম্যাগাজিন সেকশনে নারীজগৎ নামে একটি পৃথক বিভাগ ছিল। এতে আমি দুটি ফীচারের ব্যবস্থা করেছিলাম। শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতী মহিলা, অন্যটি চিত্রলেখায় বাংলার মহিলা। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই দুটি ক্ষেত্রে বাংলার মহিলাগণ যেসব কৃতি দেখিয়েছেন অথবা দেখাচ্ছেন তাঁদের সেই কৃতি পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করা। চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে এত মহিলা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং ক্রমেই এদিকে মেয়েদের আকর্ষণ বাড়ছে তারও একটা রূপ সবার সামনে তুলে ধরার একটা সার্থকতা অনুভব করেছিলাম। প্রথমটির ভার নিয়েছিল বেলা দে, দ্বিতীয়টির ভার নিয়েছিল হাসিরাশি দেবী। এ ছাড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাঙালী মেয়েদের প্রবেশ নতুন মনে হওয়াতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা শিক্ষা বিভাগের পাস করা মেয়েদের কাহিনীও বেরিয়েছিল ধারাবাহিকভাবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতী মহিলা বোধ হয় লীলা মজুমদারকে দিয়ে আরম্ভ হয়। উমা রায়, রমা চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকটি প্রকাশিত হবার পর ১৯বি দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট কলিঃ ২৬ থেকে শ্রীযুক্তা মাধবী ঘোষ আমাকে লিখলেন (১৯৫৩ নভেম্বর) তাঁর কন্যা শ্রীমতী বাণী গুহঠাকুরতার বিষয়ে আপনারা

কিছু লিখতে পারেন, কৃতী মহিলা বিভাগে। তার বৈশিষ্ট্য সে ১০ বছর ৭ মাস বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে, এবং ১৪ বছর ১০ মাস বয়সে বি-এ পাস করেছে।

খবরটি বিশেষ চমকপ্রদ মনে হওয়াতে অবিলম্বে বাণীর বিষয়ে লিখে পাঠাতে বললাম। আরো চমকপ্রদ লাগল ঐ ঠিকানাটি। কারণ ১৯এ দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট ঠিকানায় আমি সপ্তাহে এর কিছু আগে অন্তত একবার যেতাম আমার বন্ধু অতুলানন্দ চক্রবর্তীর কাছে। পাশাপাশি ঠিকানা।

কৃতী মহিলারা নিজেরাই নিজেদের ছেলেবেলার কথা, কি কি বই পড়তে ভালবাস.তন ইত্যাদি লিখে দিতেন তাই ছাপা হত, তার সঙ্গে আর কোনো ভূমিকা থাকত না। বাণীও নিজেই লিখে পাঠাল। তার পরেই তার মা আরো কিছু সংবাদ আমাকে জানালেন। তা ঐ সঙ্গে ছাপা হয়েছিল কিনা মনে 'নই। বাণীর পিতৃপরিচয় উল্লেখযোগ্য। যে কাগজে শ্রীযুক্তা মাধবী ঘোষ চিঠি লিখলেন তার শিরে বাণীর পিতার কিছু পরিচয় মিলবে—

Dr J. M. GHOSH
Capt., M. B. (Cal.), D. P. H. (Lond.),
D. T.M.& H. (Cantab.), C.L.S.T.M. (Lond.).
Late Chief Medical Officer.
Keonjhar State & Govt of Tripura
And
Formerly of Nepal.

RESIDENCE :
19B, Deshapriya Park West,
Ballygunge, Calcutta-26

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

...ছেলেবেলা থেকেই ওর কি রকম একটা মেধা, আমরাই আশ্চর্য হয়ে গেছি।...ভাল গান বাজনা জানে, ভাল সেতার বাজায়, নেপালে অতটুকু বেলায় ওর গানের শিক্ষক বলেছেন যে এক এক জনকে একটা গানের তাল লয় ইত্যাদি শেখাতেই এক মাস কেটে যায়, আর এর এক দিনে হয়ে যায় কি করে ভেবে পাই না।...

বিনীতা—মাধবী ঘোষ

শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই ব্যতিক্রম। এবং এ শিক্ষা ও মেধা সমাজের কাজে লাগার সুযোগ পায়নি, সংসারের কাজে লেগেছে শুধু। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতী মহিলা পর্যায় অদ্যাবধি ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে বাণীর মেয়ের কথাও তাতে স্থান পেতে পারত। শুনেছি, পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে সে সিভিল এঞ্জিনিয়ার হয়েছে।

হাসিরাশি দেবী অসাধ্য সাধন করেছিল—চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, বহু মহিলার পরিচয় সংগ্রহ করে। নিজে চিত্রশিল্পী এবং কবি। শিল্পের প্রতি তার প্রাণের টান। এক বৃত্তির লোক হলে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর কিছু ঈর্ষার ভাব থাকে। হাসিরাশি তা থেকে মুক্ত আছে। সে যাঁদের আঁকা ছবির নমুনা সহ পরিচয় সংগ্রহ করেছিল তাঁদের সংখ্যা ৫০এর উপর। আরম্ভ করেছিল সুনয়নী দেবী, সুখলতা রাও, প্রতিমা ঠাকুর, করুণা সাহা ইত্যাদিকে দিয়ে। সব নাম উল্লেখ করা এখানে সম্ভব য়। এর মধ্যে হৈমন্তী সেন, কমলা দাসগুপ্ত, (প্রদোষ দাসগুপ্তের স্ত্রী) শীলা অডেন, শানু মজুমদার, (নীরদ মজুমদারের ভগিনী) শাশ্বতী ঘটক (মণীশ ঘটকের কন্যা) ইত্যাদি নামও আছে। তবে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এত মেয়ের নাম যোগাড় করা হয়েছিল এতেই প্রমাণ হয় সৌন্দর্য সৃষ্টির যে প্রেরণা মেয়েদের মধ্যে স্বভাবতই আছে, মেয়েদের মধ্যে তার একটি প্রকাশ চিত্রশিল্পের ভিতর দিয়ে হচ্ছে, অন্তত এর চেষ্টা হচ্ছে, এটাই বড় কথা। সবার ক্ষমতা বা সার্থকতা সমান নয়। সবার সুযোগ সমান নয়। বহু বাধা আছে এ পথের সার্থকতা লাভে। কিন্তু তবু প্রচার হওয়া দরকার—অবশ্যই বিজ্ঞাপনরূপে নয়, মেয়ে জগতের একটি দিকের পরিচয় রূপে। এতে ব্যক্তিগত প্রচারের কোনো কথাই ছিল না। সব মিলিয়ে একটা রূপসৃষ্টির দিকের চেহারা দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য। এবং যে সব ছবি ছাপা হয়েছিল প্রতি প্রবন্ধের সঙ্গে, তা বিশ্ব-শিল্পবিচারে মাস্টারপীস রূপে গণ্য হবে এমন কথাও ছিল না। সে প্রশ্নই মনে জাগেনি। আমার শুধু উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্রভাবে দেশের মেয়েরা এ পথে কি ভাবে এগিয়ে আসছেন সেইটি সবাইকে দেখানো। তাছাড়া রঙীন ছবি শাদা কালোয় ছেপে খবরের কাগজের স্ক্রীনে হাফটোন ব্লক করে ছাপলে মূলের কঙ্কালটির সঙ্গে মাত্র পরিচিত হওয়া যায়, এ জ্ঞান ছিল। কিন্তু এক আশ্চর্য ঘটনা, কোনো ব্যর্থ অথচ উচ্চাভিলাষী পুরুষ-শিল্পী এটি যাতে বন্ধ হয় সে চেষ্টা করেছিলেন। এবং আরো একটি ব্যাপার এই যে, এক চিত্রশিল্পের ইতিহাস লেখক, এবং তথাকথিত চিত্রসমালোচক, যিনি শিল্পরসগ্রাহীরূপে নিজেকে কখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, এবং যাঁর প্রবাসীতে একটি চিত্রবিষয়ক মতকে আমি যুগান্তরে যুক্তির ঘায়ে খণ্ডিত রেছিলাম (যে সব কথা আমার পত্রস্মৃতিতে পুনর্মুদ্রিত করে বিস্তারিত

আলোচনা করেছি) এবং শিল্পী অতুল বসু যা পড়ে আমার যুক্তির সঙ্গে একমত হয়েছিলেন (তাঁর সে চিঠিও ঐ পত্রস্মৃতিতে উদ্ধৃত করেছি) তিনি যুগান্তরে মহিলাশিল্পীদের কথা পড়ে ভুল ভাষা ও বানানে এমন একখানা চিঠি হাসিরাশিকে লিখেছিলেন, যা পড়ে আমি খুব যে বিস্মিত হয়েছিলাম তা বলি না, কারণ ঐ পত্রলেখকের শিল্পরসবিষয়ক মতকে আমি অশ্রদ্ধেয় মনে করেছি সব সময়। ৭-১১ ৫৪তে তিনি হাসিরাশিকে লিখছেন—

··স্নুনয়নী দেবী, রানী চন্দ, আমিনা লোটি এবং আরো দুএকজন মাত্র মহিলা শিল্পীদের কথা বাদ দিলে,—চিত্র-শিল্পে প্রায় কোনো মহিলাই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নাই·· তুমি যে সব মহিলাদের প্রতিভার দুন্দুভিধ্বনি করেছ তাহার মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯ জন—চিত্র-শিল্পে বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বেশির ভাগ মহিলা-শিল্পী (যাহাদের পরিচয় দিয়ে যুগান্তরের স্তম্ভ পরিপূর্ণ করেছ) অপরিপক্ক (sic) অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অক্ষম চিত্রকর...”

এই সব অভদ্র অমার্জিত কথা আমাকে নকল করে উদ্ধৃত করতে হচ্ছে সে জন্য আমার হাতের কলম পর্যন্ত পীড়া বোধ করছে। বিধাতা যাঁকে শিল্প রসবোধ থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাঁর পক্ষে এই জাতীয় আত্মনিয়োজিত রস-বিচারক সাজা শুধু বাংলা দেশেই সাজে। তিনি যে কয়েকজনকে শিল্পী-রূপে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের বিষয়ে লিখেছেন এঁরা শিল্পীরূপে সিদ্ধিলাভ করেছেন। সিদ্ধিলাভ কথাটি শিল্প ক্ষেত্রে কি কোনো অবস্থাতেই প্রযোজ্য? শিল্পী যিনি তিনি আজীবন সাধনা করে যাবেন, কোনো অবস্থাতেই তৃপ্ত হয়ে থেমে যাবেন না, এবং এটাই প্রকৃত শিল্পীর পরিচয়। শেষ সত্য লাভ করেছি অথবা সিদ্ধিলাভ করেছি, এ কথা, আমার যাঁদের ক্ষেত্রে জানা আছে তাঁদের অন্যতম গৌতম বুদ্ধ। কাজেই শিল্পীর বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কথাটির ব্যবহার সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা প্রসূত। এতে শিল্পীদের ছোট করা হয়। অথবা মৃত ঘোষণা করা হয়। শুধু ব্যাকরণ দিয়ে রসবিচার চলে না।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি ধারাবাহিক লেখার ব্যবস্থা করেছিলাম তার মধ্যে দুটো পরীক্ষার্থীদের জন্য। পরীক্ষায় বসলে ছাত্ররা যে সব ভুল সাধারণত করে, সে বিষয়ে সতর্ক করার জন্য। পাঠ্য কি ভাবে আয়ত্ত করা দরকার তারই নির্দেশ স্বরূপ একটি করে রচনা থাকত। ইংরেজি বিষয়েই প্রধানত। কলেজের অধ্যাপক স্কুলের হেড মাস্টার এঁরা লিখতেন। স্কুল ফাইনালে সঙ্গীত একটি বিষয়। সেজন্য বিজন ঘোষদস্তিদারকে

গানের পাঠ নিয়মিত লেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। সেও খুব সুন্দর লিখত, এবং এই দুটি ফীচারই খুব ছাত্রপ্রিয় হয়েছিল। মেয়েদের বিভাগে যোগ ব্যায়াম বা শরীর চর্চা বিষয়ে লিখত লাবণ্য পালিত।

কিন্তু এর কোনোটাই বেশি দিন চলেনি। ছাত্রদের কাছ থেকে দাবি ক্রমে শিথিল হতে লাগল। তারা কিছু শেখার বদলে নকলের দিকে ঝুঁকল ক্রমে। নকলে পরিশ্রম কম, মার্ক পাওয়া যায় অনেক বেশি। তা ছেড়ে কষ্ট করে কিছু শেখার প্রয়োজন ক্রমে ফুরিয়ে আসতে লাগল। তার পরিণাম বর্তমানের ছাত্রবিদ্রোহ।

তারপর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে প্রথম উদ্বোধন করা গেল 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না' পর্যায়। তারপরেই লিখল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আমার উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধিতে আপাত দৃষ্টিতে যার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না, এমন ঘটনা তো বহু ঘটে, সেই সব ঘটনা চিত্তাকর্ষক করে, যাঁদের এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁরা লিখবেন, কিন্তু ক্রমে শুধু ভূত দেখার কথাই বেশি আসতে লাগল। অসম্ভব সব কাহিনী, এবং ক্ষমতা থাকলে ভূতরাই তার প্রতিবাদ করত। এ রকম প্রায় দু শ ভূতের গল্প এসে হাজির হল। আমি ভেবে দেখলাম ভূত যদি সত্যই দেখা দিয়ে থাকে, এবং যাঁদের বিশ্বাস ভূত আছে, তাঁদের কাছে তা দুর্বোধ্য হবে কেন? বুদ্ধিতে এর ব্যাখার দরকার কি? মানুষও তো প্রতিদিন দেখা দিতে আসে, তবে তার সেই দেখা-দেওয়া বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলবে না, এ কেমন কথা? ভূত আছে অতএব তারা দেখা দেবে, কাউকে কোনো আসন্ন বিপদ বিষয়ে সতর্ক করে দেবে, অথবা গুপ্তধনের সন্ধান দেবে, এ ঘটনা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যার প্রশ্নই ওঠে না। তবে ভূতের গল্প হিসাবে যা চিত্তাকর্ষক বোধ হয়েছিল সেগুলি কিছু ছাপার পর, আমার উদ্দেশ্য কি ছিল, বলা দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু তা সোজা ভাবে না বলে আমিও এক ভূতের গল্প বানিয়ে ভূতের মুখ দিয়ে আমার উদ্দেশ্যের কথা বলিয়ে নিলাম। কিন্তু ফলে কোনো লাভ হল না, এটাকেও প্রকৃত জীবন্ত ভূতের গল্প হিসাবেই অনেকে বিশ্বাস করলেন। এবং তা নিয়ে পরে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, সংক্ষেপে বলছি। আমার এ গল্পের নাম ছিল অধর সরকার। সে তার পাঠানো গল্পের কি পরিণতি হল জানতে এসেছিল। বললাম এ গল্প চলবে না।

কেন চলবে না তা নিয়ে এক বক্তৃতা। এই বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না পর্যায়ের উদ্দেশ্য যা আগে বলেছি, অনেকটা সেই ধরনের বক্তৃতা। কিছুক্ষণ পরে একটু নিচের দিকে তাকানোর পরে মুখ তুলে দেখি অধর সরকার নেই। অনেক সন্ধান নেওয়া গেল, দরোয়ানরা পথ জুড়ে বসে, কিন্তু তারা কাউকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। চকিতে অন্তর্ধান। অথচ স্বপ্ন নয়।

যাই হোক পরে যখন এ গল্পের অর্থ ও উদ্দেশ্য না বুঝে অনেকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন, তখনও তার সোজা উত্তর না দিয়ে আর একটি গল্প লিখলাম! সেই গল্পটি এই ভাবে সাজিয়েছিলাম—

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না পর্যায়ে অধর সরকার নামক কাহিনীটি প্রকাশিত হবার পর পাঠকদের কাছ থেকে অনেক চিঠি আসে। তাঁদের অনেকে নানা রকম সন্দেহ প্রকাশ করেন।...এর জবাব দেব এমন সময় কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে যাতে তার আর দরকার হল না। ঘটনাগুলি এই—

সেই সপ্তাহের বুধবার দিন রাত্রি ৮টায় যখন অফিস থেকে উঠতে যাচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে এক বলিষ্ঠকায় ইংরেজের আবির্ভাব ঘটল সাময়িকী বিভাগে। এখানে ইংরেজের আবির্ভাব সব সময় প্রত্যাশিত নয়, তাই আমাকে আবার বসতে হল।

পরিষ্কার বাংলায় 'ভিতরে আসতে পারি কি?' বলতে বলতেই তিনি বিনা ভূমিকায় নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, আমি সোজা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আজই এসে পৌঁছেছি কলকাতায়, উদ্দেশ্য: অধর সরকার সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।—বলেই তিনি পাশের শূন্য চেয়ারখানায় বসলেন এবং আমাকে বসতে বললেন।

...তিনি বলতে লাগলেন, আমি যুগান্তর অফিসে এসেই প্রথমে উপরে গিয়ে যুগান্তরের সহকারী সম্পাদকের কাছে সন্ধান করি। জানতে পারি অমর সরকার নামে এক দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক কমার্স বিভাগের সম্পাদকের কাছে এসে তাঁর একটি অমনোনীত লেখা ফেরৎ নিয়ে গেছেন। সেখান থেকে আমি নিচে নেমে দরোয়ানের কাছে যাই। ৬ই জুন তারিখে যখন বৃষ্টি পড়ছিল সে সময় তারা দাড়িওয়ালা কোনো ভদ্রলোককে বেরিয়ে যেতে দেখেছে কিনা প্রশ্ন করি। প্রথমে তারা কিছুই মনে করতে পারে না। তারপর অনেক ইঙ্গিত করার ফলে তাদের মনে পড়েছে, একটি দাড়িওয়ালা লোক বৃষ্টির মধ্যে সেদিন সত্যই বেরিয়ে গেছে তাদের সম্মুখ দিয়ে। ঘটনা অত্যন্ত পরিষ্কার। আমার অনুমান হচ্ছে সেই ভদ্রলোকই এসেছিলেন আপনার কাছে। তাঁর নাম অধর সরকার। বুঝতে পারছেন না বোধহয়। ঘটনাটা হচ্ছে এই যে, একই লেখক অনেক সময় বিভিন্ন নামে একই কাগজে লেখা পাঠান। অনেক পুরুষ লেখক স্ত্রীলোকের নামও গ্রহণ করেন, যদিও তা লেখা পড়লেই বোঝা যায়। ইনটারন্যাল এভিডেন্স অত্যন্ত স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

যখন সম্পাদক ছিলাম

··কিন্তু অবান্তর কথা থাক। কথা হচ্ছে, একই লেখক অনেক সময় বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু এই জাতীয় অনেক লেখক অত্যন্ত ভীরু এবং লাজুক প্রকৃতির। তাই সর্বত্র ব্যর্থ হওয়ার লজ্জায় আত্মপরিচয় প্রকাশ করতে চান না। আপনার অধর সরকারও এই জাতীয় লেখক। ইনিই উপরে দাড়ি সম্বলিত অমর সরকার ছিলেন, নিচে আপনার ঘরে আসবার সময়ে ইনিই দাড়ি খুলে অধর সরকার হয়েছিলেন। এবং বেরিয়ে যাবার সময় পুনরায় অমর সরকার রূপে বেরিয়ে গেছেন। সামান্য কমন সেন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করে গেলাম। গুড নাইট।

আমি তো অবাক! বিস্ময় এখানেই শেষ নয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ চলে যাওয়ার পরেই প্রবেশ করলেন আর এক ইংরেজ। দীর্ঘ দেহ, কোমল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, মুখে পাইপ। ইনি ইংরেজিতে কথা বললেন। উচ্চারণ মধুর কিন্তু দৃঢ়। বললেন বেকার স্ট্রীট থেকে আসছি।

বেকার স্ট্রীটের নাম শুনে চমকে উঠে বললাম, শার—

—লক হোমস, সময় বেশি নেই, তাই পাদপূরণ করে সময় সংক্ষেপ করলাম। আপনাকে দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোক এসেছিল, দেখলাম। কেন যে বৃথা এলো। কিন্তু যাক, আপনি অধর সরকার কাহিনীর শেষ লাইনে যে লিখেছেন, চেয়ারখানা ভিজে, শুধু এরই মধ্যে আমার সূত্র পাব মনে করেই ছুটে এলাম বিলেত থেকে। যা ভেবেছি তাই। সূত্র পেয়েছি। সম্পাদকের সামনে একখানামাত্র চেয়ারই যে থাকে না এটা একরকম ধরেই নিয়েছিলাম, শুধু আপনার ঘরখানা দেখা দরকার ছিল। যখন কোনো কাহিনী লেখেন তখন পারিপার্শ্বিকের পুরো বর্ণনা না লিখলে কাহিনী সত্য হয় না। কাহিনী রচনার এই প্রাথমিক রীতিটি মনে রাখবেন ভবিষ্যতে। আপনার ঘরের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া উচিত ছিল আপনার লেখায়। দেখছেন না উপরের দিকের ঐ স্কাইলাইটের কাঁচে একটুখানি ফুটো আছে, আর আপনার চেয়ার, চারখানা?

কিন্তু এর সঙ্গে অধর সরকারের যোগসূত্রটি কোথায়?

শারলক হোমস এ কথায় শুধু একটু রহস্যময় হাসি হাসলেন। বললেন, কিছুক্ষণের জন্য একখানা খালি ঘর দিতে পারেন? মাত্র আধঘণ্টার জন্য?

আমি তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে বসিয়ে দিলাম, ঘরখানা তখন খালি ছিল। শারলক হোমস টেবিলে পা তুলে আরাম করে পাইপ টানতে লাগলেন।

আমি অপেক্ষা করছি আমার ঘরে। এমন সময়, মাত্র মিনিট দশেক পরে পদশব্দে চমকে উঠে দেখি তিনি ফিরে এসেছেন। আমি তাঁর দিকে চাইতেই তিনি বললেন, মনে কিছু করবেন না, কর্তব্যের খাতিরে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আফিং খান?

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, কখনো না।

ধন্যবাদ, বলে তিনি আবার ফিরে গেলেন। আরো কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এলেন বিজয়ী বীরের মতন। এসেই বললেন, অধর সরকার মিথ্যা, সে মানুষও নয়, ভূতও নয়। যদি মানুষ হত তা হলে আপনাকে না জানিয়ে হঠাৎ উঠে যেত না, অর্থাৎ মোটিভের

অভাব। কারণ যে লোকটি এমন কাতরভাবে লেখা ছাপানোর জন্য আবেদন জানায়, সে আর একবার চেষ্টা না করে উঠত না। আর যদি সে ভূত হত তা হলেও মোটিভের অভাব। ভূত কেন গল্প লিখবে? বিশেষ করে ভূতের গল্প? ওটা মানুষেই লেখে। ভূতের যদি লেখার ক্ষমতা থাকত, তা হলে ভাল লেখারও ক্ষমতা থাকত। আর না থাকলেও সে-গল্প ছাপানোর জন্য সে এমন হ্যাংলামি করত না···একেবারে সম্পাদকের ঘাড়ে চেপে বসত।

আমি প্রশ্ন করলাম, তা হলে চেয়ার ভিজে ছিল কি করে?

শারলক হোমস বললেন, আপনার লক্ষ্য করা উচিত ছিল, চেয়ার চারখানাই ভিজে ছিল। আপনি মাত্র তার চেয়ারখানাকেই লক্ষ্য করেছিলেন, চারখানা একসঙ্গে লক্ষ্য করেননি। ঝড় প্রবল হলে ঐ ভাঙা স্কাইলাইটের কাঁচের ফুটো দিয়ে জলের ছাট এসে চারখানা চেয়ারই ভেজাবে।

কিন্তু আমি তাকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছি। এটি আপনি অস্বীকার করছেন কোন্ যুক্তিতে?

যুক্তি অতি প্রবল। আপনি দিবাস্বপ্ন দেখেছেন।—গুড নাইট।

শারলক হোমস চলে যেতেই দেখি আর একজন কেশবিরল মাথা, বেঁটে ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। তিনি ইংরেজিতে পরিচয় দিয়ে বললেন তিনি জাতিতে ফরাসী, নাম এরক্যুল পোয়ারো।

তিনি এসেই চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সব দেখে নিলেন এবং একখানা চেয়ারে বসে বললেন, শারলক হোমস যে আসবেন জানতাম। কিন্তু অতি-লজিক ওঁর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়েছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ভদ্রলোক বেশ ওস্তাদ, কিন্তু শুধু লজিকের পথে চললে মূলে ভুল হয় অনেক সময়। আমাদের ফরাসী কৌশলে বিশুদ্ধ শুকনো লজিকের স্থান নেই। **Eh bien**! আপনার অধর সরকার পড়েছি। একটিমাত্র প্রশ্ন আছে আমার। অধর সরকারকে আপনি আপনার কাহিনীতে যা যা শুনিয়েছেন তার চেয়ে বেশি আর কিছু কি আপনার বলবার ছিল না?

ছিল।

বলেননি কেন?

এ প্রশ্নটিতে চমকে উঠলাম। মসিয়ে পোয়ারো আমার অবস্থা বুঝতে পেরে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশগুলির বর্তমান পরিণতি বিষয়ে আলাপ চলল কয়েক মিনিট। কথা শেষ করে আমার চোখের দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর উঠে মৃদু হেসে **bon soir** বলে পা বাড়ালেন।

আমি তাঁর পথ আটকালাম। বললাম, আপনি তো কিছুই বলে গেলেন না?

Eh bien! আপনি তো আগাগোড়াই একটি গল্প রচনা করেছেন। লেখকদের কাছে আপনার কিছু বলবার ছিল, সেটি সোজা ভাষায় না বলে একটি গল্পের আকারে বলেছেন।

আরো বলতেন, কিন্তু কাগজে জায়গা কম তাই দুকলমের মধ্যে শেষ করেছেন। Bon soir!

মঃ পোয়ারো একটি খরগোসের গতিতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

আমিও।—কিন্তু কচ্ছপের গতিতে।

এই গল্পটি নিয়ে একটি ট্র্যাজিডি ঘটেছিল। এতে একস্থানে আছে 'ভূতের যদি লেখার ক্ষমতা থাকত'—একথা গল্পে পড়ে এক মহিলা লিখলেন, তিনি ভূত নিয়ে অনেকদিন গবেষণা করছেন, ভূত সব পারে, এবং তিনি তার প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পারেন। এ চিঠিটা ছেপে দিয়েছিলাম, লেখিকার ঠিকানা সমেত (যা সাধারণত করা হয় না)। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এ চিঠি নিয়ে বাদপ্রতিবাদ হতে পারে, অনেকে ঠিকানা চাইতে পারেন, তার চেয়ে ঠিকানা ছেপে দেওয়াই ভাল, যাতে কৌতূহলীরা তাঁর সঙ্গে সোজা যোগ স্থাপন করতে পারেন। এর দিন কয়েক পরেই একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে ঘরে প্রবেশ করেই একখানা চিঠি দিল আমাকে। পেনসিলে লেখা, দ্রুত হাতের। তাতে লেখা—আমাকে বাঁচান, ঠিকানা ছেপেছেন কেন, বহু লোক এসে দরজায় ভিড় করেছে।

ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তাদের বাড়িতে ভীষণ ভিড়, দলে দলে লোক আসছে ভূত দেখার জন্য। মহিলার স্বামী লাঠি হাতে দরজায় বসে আছেন ভিড় ঠেকাবার জন্য।

এই পর্যায়ের গল্পগুলি পরে পুস্তকাকারের প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ মাসিকে এ বইয়ের সমালোচনা হয়। এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত আমার দুটি গল্প পড়ে সমালোচক প্রায় ক্ষিপ্ত। এই ব্যাপারটা আমার খুব মজার মনে হয়েছিল। একদিকে ভিড় তাড়াবার জন্য মহিলার স্বামী প্রায় ক্ষিপ্ত, আর আমি গল্পের ভিতর দিয়ে ভূত তাড়িয়েছি, এজন্য সমালোচক ক্ষিপ্ত। সমালোচকের বহুদিনের বিশ্বাসে আঘাত লেগে থাকবে। আমার ভূত যদি ডিটেকটিভদের পাল্লায় পড়ে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে তার জন্য কে দায়ী? তবে ঐ সমালোচক যে ধার্মিক একথা মানতে আমি বাধ্য, কারণ ভূত মানলেই বুঝতে হবে মান্যকারী ভগবানকেও মানেন। ও দুটি বিশ্বাস প্রায় অবিচ্ছেদ্য।

অবশ্য ভূত বাদ দিয়েও কেউ কেউ বুদ্ধির অগম্য কাহিনী লিখেছিলেন।

এর মধ্যে কিষণচাঁদ বর্মণ একটি গল্প লিখেছিল, সেটি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ছিল। একটি 'সাপে কামড়ানো'র ঘটনা। কামড়ের চার দিন পরে যখন জানতে পারা গেল কামড়টা আসলে কেউটে সাপের, তখন, যাকে কামড়েছিল তার দেহে সাপের বিষের লক্ষণ দেখা দিল এবং তাইতে সে মারা গেল। আসলে তাকে মোটেই সাপে কামড়ায়নি। চার দিন সে বেশ সুস্থ ছিল এবং সুন্দরবন এলাকায় তার বাড়ি থেকে কলকাতা এসেছিল কাজে এবং সুস্থ দেহেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। আসলে গর্তের মধ্যে একটা কাঁকড়া তার আঙুলে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, এবং পরে ঐ গর্তে একটা মরা সাপ দেখা দিয়েছিল।

এই গল্পের সঙ্গে আমি আর একটি বা দুটি ঘটনা যোগ করেছিলাম, বিদেশী পড়া কাহিনী থেকে। দুটিই মনস্তত্ত্বের ঘটনা। এই কাহিনী যোগ করার কারণ কিষণচাঁদের গল্প পড়ে শিবচন্দ্র নাথ নামক এক পাঠক সুন্দর একখানি চিঠি লেখেন। তাঁর বক্তব্য এমন ঘটনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ঐ মৃত্যু কেউটে সাপের বিষে নয়। কিন্তু তিনি সাপে কামড়ানোর কথা শোনামাত্র ভয়ে মারা গেছেন। তিনি আরো বললেন এ ঘটনা ব্যাখ্যার বাইরে বলে মনে হয় না।

এটি পড়ে আমি লিখলাম, কারণ আমার মতে এটি বুদ্ধিতে ব্যাখ্যার কিছু বাইরে তথাপি আছে। ভয়জনিত লক্ষণাদি প্রকাশ ও মৃত্যু. এতে কোনো সন্দেহ না থাকলেও এরকম কেন হয় তার পুরো ব্যাখ্যা আমরা জানি না। অবশ্য এমন বহু ঘটনার রেকর্ড আছে। একথা সবারই জানা যে বিষের ভয়ে বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কলেরার ভয়ে কলেরার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মৃত্যুও ঘটে। এর নাম দেওয়া হয়েছে অটো-সাজেস্‌চন। কিন্তু নাম ব্যাখ্যা নয়। আমি প্রথমে শিকাগো থেকে প্রকাশিত স্বাস্থ্য বিষয়ক একখানা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কাহিনী এইখানে বিবৃত করলাম। কাহিনীটি এই—

এক মহিলা তাঁর বাড়িতে তিনজন বন্ধুকে ব্রিজ খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বন্ধুদের খাওয়াবার জন্য তিনি নিজ হাতে একথালা স্যামন স্যানড্‌উইচ প্রস্তুত করেছিলেন। মহিলা স্যানড্‌উইচ আনতে রান্না ঘরে গিয়ে দেখলেন তাঁর বিড়ালটি সেই খাবারে মুখ লাগিয়েছে। মহিলা ভীষণ

রেগে গেলেন বিড়ালের উপর এবং তাকে তাড়িয়ে দিলেন। দুতিনটি সানডুইচে বিড়ালের দাঁতের দাগ পড়েছিল, সেগুলো তিনি ফেলে দিয়ে বাকিগুলো এনে অতিথিদের খাওয়ালেন। খেয়ে সবাই খুব খুশি। প্রায় আধঘণ্টা পরে ভদ্রমহিলা রান্না ঘরে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন বিড়ালটা বাড়ির পিছনের দরজার কাছে মরে পড়ে আছে। তিনি ভাবলেন সব খুলে বলাই ভাল নিমন্ত্রিতদের কাছে। সবই তিনি বললেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনজন মহিলার খাদ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিল তাঁদের দেহ ফ্যাকাশে, পেটের যন্ত্রণায় তাঁরা আর্তনাদ করতে লাগলেন। মহা বিপদ, অবিলম্বে ডাক্তারকে ফোন করা হল। ডাক্তার এসে স্টমাক পাম্প দিয়ে তাঁদের পেট থেকে সব খাদ্যবস্তু উদ্‌গার করিয়ে দিলেন এবং সবাইকে কোনো রকমে বাড়ি পৌঁছে দিলেন।

এর পরেব ঘটনা মর্মান্তিক। সেটি এই—

ওঁদের যাবার ঠিক পরেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দেখেন পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। তিনি সবিনয়ে বললেন, দেখুন আমি বড়ই দুঃখিত। গাড়িখানাকে আমি গ্যারাজে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আপনার বিড়ালটা ছুটে এসে আমার গাড়ির চাকার নিচে পড়েই মারা গেল। তখন আপনার বাড়িতে দেখলাম অতিথিরা রয়েছেন, তাই কিছু বলিনি। মৃত বিড়ালটিকে পিছন দিকের দরজার গোড়ায় রেখে দিয়েছিলাম।

আর একটি ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এটি ফরাসী দেশের। অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে তাকে সেই দণ্ড দেওয়া হবে। একথা প্রচার হওয়ার পর কয়েকজন বিজ্ঞানী কর্তৃপক্ষকে এসে বললেন, অপরাধীকে যখন মরতেই হবে, তখন আমরা তার উপর একটি পরীক্ষা চালাতে চাই। আমাদের এ পরীক্ষাতেও তার মৃত্যু হবে, এবং তাকে কোনো আঘাত দেওয়া হবে না। কর্তৃপক্ষ সব শুনে সহজেই রাজি হলেন। কয়েদীকে নির্দিষ্ট স্থানে আনা হল, বিজ্ঞানীরা তার পাশে একটি বড় গামলা রাখলেন। কয়েদীকে বলা হল তার শিরা ফুটো করে তা থেকে রক্ত সব বার করে নেওয়া হবে। সিরিঞ্জ যথারীতি প্রবেশ করল শিরায় এবং রবারের নলের সঙ্গে তাকে সংলগ্ন করে দিয়ে

গামলায় রক্ত ধরা হতে লাগল। ধীরে ধীরে গামলাটি কয়েদীর চোখের সামনে রক্তে ভরে উঠতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে সে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মরে গেল।

পরীক্ষা সফল। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করল না। এ ঘটনার গোপন অংশ হচ্ছে, তার গা থেকে কোনো রক্তই নেওয়া হয়নি। গামলার সঙ্গে এমন কৌশল করা ছিল যাতে নিচে থেকে রক্তের মতো তরল পদার্থ গামলায় প্রবেশ করে গামলাটিকে ধীরে ধীরে ভরে তুলতে পারে। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে হাতে বিঁধানো সিরিঞ্জের থেকে রক্ত রবারের নলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে গামলাটিকে ভরে তুলছে।

মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা সফল।

তখনকার দিনের এসব ঘটনা সবসুদ্ধ মনে পড়ে যায়। এ ছাড়া অনেক মজার ঘটনা আছে, পরে আসবে সে সব কথা।

সঙ্গীত-শাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে দিয়ে মাঝে মাঝে লিখিয়েছি। তিনি রচনায় খুব পাকা ছিলেন, এবং আপন ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য সঙ্গীত জগতে বিশেষ মান্য ছিল। কৌতুকপূর্ণ কথা বলা তাঁর ছিল সহজাত, অনেক সময় লেখাতেও তা ফুটিয়ে তুলতেন। এসরাজে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একদিন এসরাজ শুনিয়া বিশেষ মুগ্ধ করেছিলেন। সুরেশবাবু, নলিনীকান্ত সরকার, অরকেস্ট্রা স্রষ্টা সুরেন্দ্রলাল দাস, কাজি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি মিলে গার্সটিন প্লেসের আকাশবাণী গৃহে বেশ একটা মজলিশ ছিল। সেখানে আমারও আসন ছিল একটি। এসব বহু আগের কথা।

সুরেশ চক্রবর্তীর কথায় কাশীর সুরেশ চক্রবর্তীর কথা মনে এলো। এই রচনা লেখার সময় তার মৃত্যু ঘটেছে। উত্তরা মাসিকের সম্পাদক রূপে বাঙালী শিক্ষিত সমাজে সে ছিল সুপরিচিত। কালী ও কলম মাসিকে সে অতুলপ্রসাদ সেন সম্পর্কে লেখা শেষ করেছিল। পশ্চিম ও পূবের বাঙালী লেখক-পাঠকদের মাঝখানে সে ছিল সেতু। গত ১৪ই মে (১৯৭৩) তারিখে তার মৃত্যু ঘটেছে কাগজে পড়ে বেদনা বোধ করলাম। কয়েক বছর আগে তার এক পুত্রের (সেও আমার পরিচিত ছিল) অপমৃত্যুর পর সুরেশ প্রায় ভেঙে পড়েছিল। সুরেশের মৃত্যু সংবাদ কাগজে পড়েছি কিছুক্ষণ আগে।

সুরেশকে লেখা চাইলে দিতেই হত, এড়াবার উপায় ছিল না। উত্তরাতে আমার অনেক লেখাই প্রকাশিত হয়েছে। আমার দন্তপ্রলয় নামক বইতে রেডিওতে অভিনীত যে সাতটি নাটিকা স্থান পেয়েছে তার তিনটিই উত্তরাতে, অভিনয়ের পরে প্রকাশিত হয়েছিল, একটি তদতিরিক্ত। একদিন যুগান্তরে আমার লেখা চাইতে এলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে তার সামনেই উত্তরা কাগজের মলাট নিয়ে একটি রচনা লিখে দিয়েছিলাম। তা ছাড়া ওকে চিঠি আকারে কয়েকটি লেখা দিয়েছিলাম তা পত্র সাহিত্য নামে প্রকাশিত হত।

আর একটি ব্যাপারে সে আমার স্মরণীয় হয়ে আছে। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীকে সে একদিন যুগান্তরে নিয়ে এসেছিল, এবং সেই দিনই ঐ লেখিকার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সে পরিচয় আজও অক্ষুণ্ণ আছে এবং অদ্যাবধি তাঁর সঙ্গে আমার পত্র বিনিময় চলছে।

সুরেশকে সবাই চটপটি বলে ডাকত। তার মুখে কথার খই ফুটত। এত পরিশ্রম করত, এবং কলকাতায় যখনই দেখেছি কোথাও চুপ চাপ অলসভাবে থাকতে দেখিনি। আমার থেকে সে চার বছরের ছোট ছিল।

ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে প্রায় ত্রিশ বছর পরে পুনরাবিষ্কার করলাম কলকাতায়, কোনো রকমে তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করে। তাঁর অনেক গুলি লেখা ছেপেছিলাম যুগান্তরে। কবিতা গল্প প্রবন্ধ ও কারটুন চিত্রের সাহায্যে এককালে তিনি কয়েকখানি পত্রিকাতে বেশ প্রবলভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁর লেখা ও ছবি আমাকে অভিভূত করেছিল বলা চলে। আমি যাঁদের দেখেছি বইতে তাঁর বিষয়ে যে অধ্যায়টি লিখেছি সেটি তিনি মৃত্যুর পূর্বে দেখে যেতে না পারলেও তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচিত্রণ ও দ্বিতীয় স্মৃতিতে যা লিখেছি তা তিনি পড়েছিলেন। তাঁর একটি লেখা আমার পড়া ছিল না, সেটি আমাকে পড়বার সুযোগ করে দিয়েছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। সেটি খুব বড় গল্প, নাম শিরাজীর পেয়ালা। তৎকালীন সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদিকা জয়ন্তী সেনের সহায়তায় ঐ গল্পটি তার কাগজ পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলাম। তাঁর দুখানি উপন্যাস যোগভ্রষ্ট ও দশচক্র তাঁর বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ কাজে লেগেছিল, এবং সে দুখানা আমি সংগ্রহ করেছিলাম পুলিনবিহারী সেনের কাছ থেকে। নরকের

কীট নামক গল্পটি আমি পুরাতন শ, চিঠি থেকে উদ্ধার করে নানা ভাবে তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি আমার আধুনিক বাঙ্গ পরিচয় নামক পুস্তকে। তার আগে ঐ গল্পটি আমার সম্পাদিত একখানি বাঙ্গ গল্প সংকলনের বইতে সবটাই পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলাম। —বর্নবিহারীবাবু, তাঁর প্রতি আমার এই শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে আমার প্রতি বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন।

॥ তেরো ॥

১৯৪৬ সনের দুটি ভ্রমণ (হাজারিবাগ ও জলপাইগুড়ি-জয়ন্তী-হাতীখেদা) শেষে ১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাসে একবার গেলাম ভাগলপুর। স্বইচ্ছায় নয়। ভাগলপুরের জলকলের সুপারিনটেনডেন্ট বিজয়রত্ন বসু আমার স্বাস্থ্যের কিছু অবনতি দেখে (যখন দেখলেন, তার কয়েক ঘণ্টা পরেই) আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন শিয়ালদহ স্টেশনে। তখন স্টেশনে গেলেই টিকিট পাওয়া যেত। এমন কি গাড়ির মধ্যে অনেক সময় বসবার স্থানও মিলত।

বিজয়বাবুর সঙ্গে একটি শর্ত হয়েছিল এই যে, আমি গঙ্গার উঁচু পাড়ের উপর একা বসে বা শুয়ে চুপচাপ পড়ে থাকব। (স্থানটি খুবই লোভনীয় ছিল। তাঁর বাড়িও ঐখানেই—এক মিনিটের দূরত্বে), একা থাকব—সেই নির্জন পাড়ে—গঙ্গার দৃশ্য স্টীমার নৌকা আর দূরের পারাপারের দৃশ্য দেখব, ক্যামেরা সঙ্গেই থাকবে, দরকার বুঝলে তারও সদ্ব্যবহার করব। এই শর্তেই শেষ নয়। আরো কথা হল বনফুল অথবা তস্য ভ্রাতা ডাক্তার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় যেন ঘুণাক্ষরে আমার আস টের না পায়। বিজয় বাবু সব শর্তে রাজি হয়েছিলেন।

তাঁর দোষ ছিল না—আমি তাঁর বাড়িতে যাওয়া মাত্র চার মাইল দূরের বনফুল এবং এক মাইল দূরেব বরারী হাসপাতালের ডাক্তার ভোলানাথ খবরটা জেনে ফেলল। ফলে আমার সাত দিনের বায়ু পরিবর্তনে বাধা পড়ল। সাত দিনের মধ্যে বরারির গঙ্গার ঘাটের বায়ু এবং ভাগলপুর শহরের বায়ু—এই দুটি বায়ু নিউট্রালাইজড হয়ে গেল, এবং এই পরিবর্তনে শুধু বায়ুর প্রকোপই বাড়ল। কলকাতার যে বায়ুতে দেহ কিঞ্চিৎ কাবু হয়েছিল, সেই বায়ুর প্রভাব কাটানো গেল না।

গিয়েছিলাম সমস্ত দেহমন শিথিল করে গঙ্গার পাড়ে বসে কিংবা শুয়ে থাকতে। তাতে সাত দিনের মধ্যেই দৈহিক কিছু উন্নতি আশা করেছিলাম। বনফুলের কাছে দুদিন ছুটি চেয়ে নিয়ে দুদিন অন্তত বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছিলাম। একদিকে চাঁপা গাছের অজস্র দান, চাঁপার কি মনমাতানো

গন্ধ। আর পাশে আর এক প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া গাছে ডজনখানেক অতিকায় হনুমান আমার উপস্থিতিতে সম্ভবত বিরক্ত হয়ে নানা রকম মুখ ভঙ্গি করছে এই ছিল সেখানকার পটভূমি।

যাই হোক মোটের উপর উদ্দেশ্য সফল হল না। দ্বিতীয় স্মৃতিতে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

১৯৪৫ সনে যখন যুগান্তরে প্রবেশ করি, তখন লেখিকাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ যুগান্তরে যে সব লেখা আসত তার মধ্যে মেয়েদের লেখা নিতান্তই কম ছিল। মনে আছে, ১৯৪৫ সনে একমাত্র অলকা মজুমদার নামের এক লেখিকা একটি গল্প পাঠিয়েছিল—সে তখন কলেজের ছাত্রী—গল্পটি খুব ভাল লেগেছিল, মনে হয়েছিল খুব পাকা হাতের লেখা। পূব-অপরিচিতের মধ্যে এই একটি নাম মনে আছে। পরিচিতের মধ্যে অন্নপূর্ণা গোস্বামী ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, আশালতা সিংহ, বাণী রায়। উমা রায় এইগুলি মনে পড়ে। মেধা ঘোষ লিখল কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ, তার ইংল্যাণ্ডের শিশু অপরাধীদের বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে। আশাপূর্ণার আবির্ভাব ছিল শুধু শরৎ সংখ্যায়। এর কয়েক বছর পরে কনক মুখোপাধ্যায় তার এক গল্পে আমাকে বিস্মিত করেছিল। এবং পরে তার আর একটি গল্প নিয়ে বেশ কিছু মজার কাণ্ড ঘটেছিল। সে কথা পরে বলব। এবং ইতস্ততঃতে মেয়েদের বয়স নিয়ে অথবা স্ত্রী স্বামীকে কি বলে ডাকবে তা নিয়ে যে সব কৌতুক সৃষ্টি করা গিয়েছিল, সে সব প্রসঙ্গও সম্ভব হলে পরে বলা যাবে। আশাপূর্ণা দেবী তো পুরাতন পাপী, লীলা মজুমদারও তাই। মেয়েদের মধ্যে মায়া বসু, অনীতা গুপ্ত, এরাও ভাল লিখেছে। মায়া বসুর যুগান্তরেই গল্পের হাতে খড়ি এবং পাকা হাতে খড়ি। বন্দনা গুপ্ত তার আন্দামান বাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে ধারাবাহিক অনেকগুলি রচনা লিখেছিল, বই হয়ে বেরিয়েছে 'দ্বীপমালার দেশে' নামে। রেণুকা বিশ্বাস ছিল শিক্ষিকা। সে মাঝে মাঝে লিখত। তারপর সে রুমানিয়া ভ্রমণে গেলে আমি বলেছিলাম ভ্রমণ কাহিনী লিখতে। ফিরে এসেই লিখেছিল কয়েকটি। তারপর সে চলে গেল অ্যামেরিকায়, এবং ফিরে এসে লখনৌতে চাকরি করার পর আবার গেল অ্যামেরিকায় এবং এখনো সেখানেই আছে। তার অনেক উন্নতিও হয়েছে। এখন সে কি করছে জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম।

তার উত্তর গত ২৩।৫।৭২ তারিখে পেয়েছি। এর আগে সে নিয়মিত চিঠি লিখত ওখানকার হালচাল জানিয়ে। সে সব চিঠি অন্যান্য চিঠির সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে (প্রবাসী, মাঘ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৫ থেকে বৈশাখ ১৩৭৬) পত্র ধারা নামে। এই চিঠিটায় নতুন কয়েকটি খবর জানা যাবে সেজন্য এর অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। একটি বাঙালী মেয়ে নিজের চেষ্টায় নিউ ইয়র্কে বহু সামাজিক কাজ করছে তা বাঙালী পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক হবে আশা করি।

প্রিয় পরিমলদা,

লিখেছেন আমার সম্বন্ধে জানতে। বক্তব্যটা হচ্ছে এই 'আমি' বস্তুটাকে নিয়ে বড় মুশকিলে পড়েছি। এটা যে কি তা বোঝানো কঠিন। কেরিয়ার সম্বন্ধে বলতে পারি সোশাল ওয়ার্ক করছি। এখানকার খুব বড় একটা হাসপাতালে মেটারনিটি এবং গাইনিকোলজি বিভাগে সোশাল ওয়ার্কারদের সুপারভাইজ করা আমার কাজ। কলম্বিয়া ও নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্মী ছাত্রদেব ফিলড ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি। এ ছাড়া সিটি ইউনিভার্সিটিতে স্কুল অভ সোশাল ওয়ার্কে এম-এস-ডাবলিউ ছাত্রদেব পড়িয়েছি এ বছর। আগামী বছরেও হয়তো পড়াব।

হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে এ দেশের সমাজের নানা সমস্যা বুঝতে সুযোগ পাচ্ছি যা অন্যান্য ভারতীয়দের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এখানকার দরিদ্রেরা অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েব। এদেশের সমস্ত ঐশ্বর্যকে যেন এরা মাথায় ধরে রেখেছে। এরা এদেশে শূদ্র। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয় এরা সভ্যতার পিলসুজ। এদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে—আলো এদের কাছে পৌঁছয় না।

এখানে এসোসিয়েশন অভ ইণ্ডিয়ানস ইন অ্যামেরিকা ইনকরপোরেটেড নামক একটি সংস্থা হয়েছে ভারতীয় ইমিগ্র্যান্টদের জন্য। আমি ইমিগ্র্যান্ট না হয়েও তাব সেন্ট্রাল কমিটিতে এবং নিউ ইয়র্ক একজেকিউটিভ কমিটিতে আছি। ভারতীয় ইমিগ্র্যান্টদের মধ্যে যোগাযোগ ও নানা ভাবে তাদের সাহায্য করা এবং সক্রিয় রাখা এই সংস্থার উদ্দেশ্য। সংস্থার সমাজ সেবার কাজের পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ আমার। পরিকল্পনার মধ্যে হাউসিং, এমার্জেন্সি, এমপ্লয়মেন্ট, এডুকেশন, হসপিটালিটি, হেলথ—সব ব্যাপারে উপদেষ্টার এবং সাহায্য করার নানা ব্যবস্থা আছে। সংস্থা থেকে ভারতীয়দের সব রকম সাফল্যকে জনসমক্ষে উঁচু করে ধরার ব্যবস্থা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ভারতীয় ইমিগ্র্যান্টরা এদেশের সমাজের উপর কোনো রকম বোঝা হয়ে ওঠেনি। সেটা যাতে না হয় তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আপনার হয়তো মনে আছে ১৯৪৯ সনে নিউ ইয়র্কে এসে টেগোর সোসাইটি

করেছিলাম। সেটা এখনও বেঁচে আছে এবং একটা টেগোর সেন্টার করার চেষ্টাতেও আছি। এই সোসাইটি এখন একটি প্রেস্টিজিয়াস অরগানাইজেশন হয়েছে। ওদের সঙ্গেও আছি। এখন ভোকেশন ও অ্যাভোকেশন এক হয়ে গেছে।

দেশে থাকা কালেও নানা জনসেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলাম। সে অভ্যাস এখনও আছে। এখানে অনেক তরুণী মা আছে যারা বিবাহিত নয়। বয়স কম বলে তাদের না আছে বিচারবুদ্ধি, না আছে মায়ের দায়িত্ব নেবার শিক্ষা এবং যোগ্যতা। এদের জন্য কোনো রকম ব্যবস্থা না থাকাতে এদের বাচ্চাদের কি অবস্থায় মানুষ হতে হচ্ছে বুঝতেই পারছেন। এদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্মসংযমের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয় না, তা অভ্যাস করিয়ে দেওয়ারও কোনো চেষ্টা নেই। তারপর অল্পবয়স্করা যখন যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করতে চায় তখন সমাজ তর্জনী দেখায়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের কল্যাণে যৌনতা জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করা হয় যেন। আর অর্থ এদের (সম্ভবত আমাদের দেশেও) একমাত্র ভগবান। ফলে বহু অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েকে হঠাৎ পূর্ণবয়স্কের দায়িত্বভার নিতে হয়—সমাজস্বীকৃত অথবা অস্বীকৃত নানা পন্থায়। এদেব সাহায্য করার জন্য কিছু আইন কানুন ও ব্যবস্থার দরকার। আমি এখানকার কমিউনিটি কাউন্সিলের কমিটিতে থেকে এ ব্যাপারেও কিছু সাহায্য করছি। মোটকথা আমার ব্যস্ত থাকার ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই। দেশে ফিরে কিছু ডেভেলপমেন্টের কাজে হাত দেবার ইচ্ছা আছে। সে বিষয়ে নানা চেষ্টাও করছি।

Slum Clearance in Kanpur নামে একটা বই ছাপানর ইচ্ছা আছে। লখনৌতে থাকার সময় একটা স্টাডি করেছি। সেটাব উপর আমার ডকটর‍্যাল ডিসারটেশন ছিল। আপনাকে বোধ হয় লিখেছি যে গত বছর এপ্রিলে আমি ডকটর অভ সোশাল ওয়েলফেয়ার (D.S.W.) ডিগ্রী পেয়েছি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অতএব এখন থেকে ডকটর রেণুকা বিশ্বাস বলতে পারেন।

আমাব ক্ষোভ বাংলায় লেখার প্রেরণা পাচ্ছি না। আপনি যখন লেখা ছাপতেন তখন অজস্র লিখেছি। এখানে সাহিত্যচর্চার অবকাশ এবং সঙ্গ নেই। অতএব এখন কিছু সময় পাচ্ছি বলে সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করব এদেশে। প্রণাম নিন, ইতি

রেণুকা বিশ্বাস

যুগান্তরে রেণুকা প্রথম লিখেছে, আবার হয়তো ভবিষ্যতে লিখবে—তার মধ্যবর্তী কর্মজীবন বিষয়ে তার অনেক কথাই লেখবার থাকবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এক দুঃসাহসিকা, নাম শেফালী নন্দী—একা গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, ইউরোপের নানা স্থান এমনকি একা ভেনিস্ ভ্রমণ করেছিলেন, আয়ারল্যাণ্ডে ডি ভ্যালেরার সঙ্গে দেখা করেছিলেন—সর্বত্র

একা। তাঁর অনেক কাহিনী আমি ছেপেছিলাম। দুঃখের বিষয় অল্প দিন তাঁর অকালমৃত্যু ঘটেছে।

শিক্ষার প্রসঙ্গে এবারে লণ্ডনের একটি ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলের কয়েকটি বেশ মজার খবর দিচ্ছি। এটি একটি বড় প্রবন্ধের সংক্ষেপাংশ। আমার ছোট বোন শ্রীমতী মঞ্জুর এই রচনাটি আমি ২৬শে এপ্রিল ১৯৫৩ তারিখে যুগান্তরে প্রকাশ করেছিলাম। মঞ্জু এই সময় লণ্ডনের মে ফ্লাওয়ার স্কুলের শিক্ষিকা। তার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা এতে বলা হয়েছে। সে বলছে—

মে ফ্লাওয়ার জুনিয়র স্কুল লণ্ডনের প্রাইমারি স্কুলগুলির মধ্যে একটি। ঈস্ট লণ্ডনের আপার নর্থ স্ট্রীট ধরে একটুখানি হাঁটলেই স্কুলে পৌছানো যায়। গত যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে স্কুলবাড়ির খানিকটা অংশ ভেঙে গিয়েছিল, সেটুকু আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে।

জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে যেদিন শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে সেখানে গেলাম, মনে সেদিন অনেকখানিই দুর্ভাবনা ছিল, না জানি কেমন ব্যবহার পাব ওদের কাছ থেকে। সকাল থেকেই সেদিন মেঘে ঢাকা আকাশ, থেকে থেকে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সিক্ত অবস্থায় স্কুলে যখন পৌছলাম, তখন বেলা ১১টা। হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি এমন সাদর অভ্যর্থনা জানালেন যে, মুহূর্তের মধ্যে আমার সব আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর তিনি আমাকে স্টাফ রুমে নিয়ে গিয়ে মিস উইলিয়ামস-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঠিক হল লাঞ্চের পর তিনি আমাকে ক্লাসে নিয়ে যাবেন···

ভারতীয় টীচার মে ফ্লাওয়ার স্কুলে সম্পূর্ণ নতুন। একরাশ বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে ছেলেমেয়েরা আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর নানা প্রশ্ন। আমি কোন দেশ থেকে এসেছি, আমার পোশাক এরকম কেন, আমার ভাষা কি ইত্যাদি। কেউ জিজ্ঞাসা করল অ্যামেরিকার কোন জায়গাকে ইণ্ডিয়া বলে।.. এদের ধারণা ভারতবর্ষের সব বাড়ি মাটির তৈরি, সব কুঁড়েঘর, জঙ্গলে ভরা দেশ, পথে ঘাটে বাঘ হাতী কুমীর সাপ, মোটর নেই, রেল গাড়ি নেই, ভারতের ছেলেমেয়েরা কেউ স্কুলে যায় না।

আমাদের দেশের সঙ্গে এদেশের শিক্ষা পদ্ধতির তফাৎ কোথায় সে বিষয়ে নতুন অভিজ্ঞতা হল। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ল সে হল একমাত্র খেলার মাঠ ছাড়া স্কুলের সময় আর কখনো ঘণ্টা বাজে না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম এতে অসুবিধা হয় কিনা। টীচাররা সবাই বললেন এতে সুবিধাই হয়। কিছুক্ষণ পর পর ঘণ্টা বাজলে ছেলেমেয়েদের মন বিক্ষিপ্ত হয়। তারা হয়তো মন দিয়ে অঙ্ক করছে বা পড়ছে, ঘণ্টা বাজার ফলে সেটা তাকে ছাড়তে হল। যে পর্যন্ত না আগ্রহ কমে সে পর্যন্ত কাজটা ওদের করতে দেওয়াই উচিত।

আমাদের দেশে যেমন সাবজেক্ট-টীচার সিসটেম, এখানে তা নয়। সেকেণ্ডারি স্কুলে এবং গ্রামার স্কুলে অবশ্য স্পেশালাইজড টীচার দুচার জন করে থাকেন, কিন্তু প্রাইমারি

যখন সম্পাদক ছিলাম

স্কুলে একজন টীচারের উপর একটি ক্লাসের সম্পূর্ণ ভার। এতে সুবিধা এই যে, তিনি তাঁর ক্লাসের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে ব্যক্তিগতভাবে জানবার সুযোগ পান। ছেলেমেয়েরা খালি হাতে স্কুলে আসে ও খালি হাতে বাড়ি ফেরে। বই খাতা পেনসিল সব স্কুল থেকে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি ক্লাসে তিন চারটি আলমারি ভরতি বই। যার যা খুশি, নিয়ে পড়ে। বাঁধাধরা কোনো পাঠ্যক্রম এদের নেই। ক্লাস টীচার নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় যে বই পড়ানো উপযুক্ত মনে করেন, পড়াতে পারেন। ছেলেমেয়েরা সাধারণত চটপটে ও সপ্রতিভ। অযথা এদের লজ্জা নেই। অনুরোধ করা মাত্র এরা গান শোনায়, কবিতা আবৃত্তি করে, গল্প বলে, অভিনয় দেখায়। কতদিন ওরা নিজেরাই বলেছে আজ পড়ব না, তার চাইতে আমরা গান গাই, বা অভিনয় করি—আপনি বলুন কেমন হল। রূপকথা বা ইতিহাসের কোনো ঘটনা অথবা কোনো মজার গল্প থেকে ওরা নিজেরাই অভিনয় উপযোগী করে লিখে নেয়। কয়েকটা এই ধরনের নাটিকা ওরা আমাকে পড়তে দিয়েছিল। বানান অনেক ভুল হলেও মোটামুটি লেখা মন্দ নয়।

একদিন ক্লাসে কবিতা পড়ানোর কথা। কিন্তু বই খোলা মাত্র ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করে উঠল—আমরা কবিতা পড়ব না। কারণ? কবিতা ভাল লাগে না। কবিতার কোনো মানেই হয় না। বললাম যারা কবিতা পছন্দ কর না, হাত তোল। অধিকাংশ হাত আকাশে উঠল। কেন ভাল লাগে না কারণ—জন বলল—কবিতা একঘেয়ে শুনলেই ঘুম পায়। জিমি বলল, কবিতা শুনলে মাথা ধরে। নবমার মতে কবিতা একটুও সুন্দর না। পলিন বলল, ভাল না লাগার কারণ সে বুঝতে পারে না। কেনেথ বলল, কবিতা হচ্ছে কতগুলো বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করা। এইভাবে কবিতা বিষয়ে ওরা নিজ নিজ স্বাধীন মত স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করল। কবিতা পড়ানো বন্ধ রাখতে হল। আমাকে বলা হয়েছিল ওদের যাতে আগ্রহ নেই তা পড়ানো হয় না। ওরা তাদের পছন্দ অপছন্দ নির্ভয়ে খুলে বলে। ওদের রুচি বা ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়।

একদিন স্কুলের যে-কোনো টীচার সম্বন্ধে রচনা লিখতে দিয়েছিলাম। ওরা এমন বর্ণনাই দিয়েছিল যা পড়ে টীচাররাও খুব উপভোগ করেছিলেন। মিসেস পাইন সম্বন্ধে একজন লিখেছিল, 'মাথার চুল এমন বিশ্রী করে রাখেন যে মনে হয় এইমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন। আবার একদিন দেখি চুল বেশ পরিপাটি, সেদিন বোধহয় মেজাজ ভাল থাকে।' মিস উইলিয়ামসের কথা লিখেছিল 'প্রায়ই দেরি করে আসেন আর বলেন টিউবে বড় ভিড় ছিল, অথবা বাস দেরি করে এসেছে। মোটেই বিশ্বাস করি না এসব কথা।' মিস জনসন রেগে গেলে চেহারা কি রকম হয়, হাতের লেখা তখন কেমন হয়, কোন্ দিন মিস রেনারের মোজা ছেঁড়া ছিল, মিস্টার উইলসন কবে কোন্ টীচারের সঙ্গে নাইট ক্লাবে গিয়েছিলেন, এই সব তথ্য। আমার সম্বন্ধে দু একজন শুধু শাড়ীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিল।

প্রাইমারি স্কুলগুলির সময় তালিকায় অঙ্ক, ইংরেজি ও কিছু ইতিহাস ভূগোল ছাড়া আর সব সময়টাই **activity period**এর জন্য। এ সময়টা হাতের কাজের জন্য। নানা বিষয়ে অনুরাগ বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য। চিত্রাঙ্কন, পটারি, তাঁত বোনা, নাচ, গান,

অভিনয়, সাঁতার কাটা, রান্না, নানা রকম প্রজেক্ট, খেলা, শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

এর আগে আরো কয়েকটি স্কুল দেখার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু এই যে ফ্লাওয়ার স্কুলের মতো এতটা হাতের কাজ বা অন্যান্য activity অন্যত্র দেখিনি। এখানে দুটো বড় ঘর রয়েছে, আর্ট ও মাটির কাজ ও রান্নার জন্য, প্রকাণ্ড দুটো হলঘর রয়েছে গান অভিনয় ইত্যাদির জন্য। মাটির কাজ ও চিত্রাঙ্কনের জন্য বিশেষ টীচার আছেন। এক এক দিন ছেলেমেয়েরা আমাকে ডেকে নিয়ে ওদের কাজ দেখায়। এখন আর আমার সম্বন্ধে ওদের বিস্ময় ততটা নেই। অন্য ক্লাসের ছেলেমেয়েরাও এখন দেখা হলেই মিষ্টি হেসে সম্ভাষণ জানায়, এসে জড়িয়ে ধরে, হাতে চকোলেট গুঁজে দেয়, তখন ভুলে যায় যে আমি বিদেশী।

শিক্ষা বিষয়ে নানা দেশের কথাই জানা গেল এই সব চিঠির মধ্যতায়। ছোটদের শিক্ষা আমাদের দেশে কিভাবে দেওয়া হয় তা তো আমরা জানি। অন্ধভাবে রুটিন পালন। এবং অপাঠ্য বই যা পড়ানো হয় তাও এক জগদীশচন্দ্র বিষয়েই অনেক বলা গেছে। এ সব যুগান্তর ম্যাগাজিন সেকশনে আমি আজও আলোচনা করছি—আমার সম্পাদনাপদ থেকে অবসর গ্রহণের পরেও।

॥ চোদ্দ ॥

মাঝখানের আর একবার কলকাতার বাইরে গেলাম ১৯৪৯ সনে। সঙ্গী কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার। তার ব্যাগে বহু রং তুলি কাগজ, আর আমার সঙ্গে দুটি ক্যামেরা। প্রথমে ল্যানসডাউন, পরে সিমলা, কালীকিঙ্কর পথের ধারে বসে, কখনো বা নির্জন পাহাড়ের গায়ে বসে তুলি চালিয়ে স্কেচ করত, আমি ক্যামেরা নিয়ে বেরুতাম। কিন্তু আমার ছবি তোলবার বিশেষ কিছুই ছিল না। সেটা ছিল জুন মাস, কোথাও বরফের চিহ্ন দেখিনি—সেই ৮০০০ ফুট উচ্চতায়ও। তবে বন্ধু কিরণকুমার রায় ও ফণী চাটুজ্জে, বিশেষ করে প্রথমজন, আমাকে প্রচুর সঙ্গ দিয়েছিল, তাই বাজারের দিকে এসে কিছু কিছু ছবি তুলেছিলাম, যে রকম ছবি কলকাতাতেও অনেক তুলেছি। ক্যামেরার না হলেও আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা হল নতুন দেশ দেখার। আর একটা অভিজ্ঞতা, ওঠা নামার। দারজিলিঙে কয়েকবার গিয়েছি—কিন্তু সিমলার মতো এত খাড়া পথে ওঠা নামা আর কখনো করিনি। এক এক সময় পা অবশ হয়ে যেত। কালীকিঙ্করের পেনটিংগুলি এখন স্মৃতিমাত্র সম্বল। সেগুলি আমার কাছেই আছে। একটি স্কেচ শুধু কিরণ নিয়ে নিয়েছিল।

দারুণ ক্লান্ত হয়ে এবং জুন মাসের দারুণ গরম সহ্য করে যদি বা কলকাতা ফিরলাম, তবু আর এক কল্পনার অতীত অভিজ্ঞতা আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। আমি তখন বেশ অসুস্থ, সেই সময় একদিন শেষ রাত্রের কিছু পরে, ভোরের আলো তখনও অন্ধকারেই ঢাকা, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। কি ব্যাপার? দেখি থানার অফিসার। আমার বাড়ি সার্চের আদেশ ও আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছেন। বাড়ি বন্দুকধারী পুলিসে ঘিরে রেখেছে।

অফিসার আমার ঘরে এসে বসলেন, এবং বললেন, সার্চ ওয়ারাণ্ট আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে কোথাও কিছু ভুল হয়েছে, তবু ধরে নিয়ে যাওয়ার অর্ডার তাঁকে পালন করতেই হবে। সার্চ তিনি আর করলেন না, কারণ নিশ্চিতই ভুল, এ ধারণা তাঁর জন্মেছে। মনে হয় আমার পরিবেশ ও

অতি-রুগ্ন চেহারা দেখে। আমাকে গ্রেফতার করে পাড়ার বিস্ময় জাগিয়ে সদলবলে নিয়ে গেলেন তিনি, লর্ড সিংহ রোডে। সেখানে দেখি আরো কয়েকজন যুবককে ধরে আনা হয়েছে। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম অনির্দিষ্টকাল কোথাও বন্ধ থাকতে হবে। ইংরেজ আমলে কিন্তু কাউকে খুব আন্দাজে ধরা হত না, কিছুকাল তার গতিবিধির উপর নজর রেখে তবে ধরা হত। থানার অফিসারকে একথা বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন আমি জবাহরলাল নেহরুকে কলকাতার সভায় বোমা মারব এমন সংবাদ তাঁরা পেয়েছেন।—এ ঘটনার কমিক অংশ এটাই।

লর্ড সিংহ রোডে দুপুরে যা খেতে দিয়েছিল তার এক কণাও খাইনি, তখন খাওয়ার প্রবৃত্তি ছিল না। ডাক পড়ল বেলা দুটোয়। সেখানকার কর্তা ব্যক্তিরা আমার পেশা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তারপব বললেন কোনো কমিউনিস্টের খাতায় আমার নাম ঠিকানা পেয়েছেন। বললাম বহু কমিউনিস্ট আমার বন্ধু, এবং লেখক-সম্পাদক সম্পর্কেও অনেকের সঙ্গেই আমার পবিচয়। আমার ঠিকানা অনেকের খাতাতেই লেখা থাকা সম্ভব। তিনি তারপর বলতে লাগলেন ছোটছোট ছেলেরাও এই সব হিংসাত্মক কাজ করছে, বলে একজনকে আমার সামনে এনে হাজির করলেন। হাজির কবার উদ্দেশ্য তখনই মনে হয়েছিল আমাদের মধ্যে পরিচয়ের কোনো চিহ্ন ফুটে ওঠে কিনা। ছেলেটির বয়স বোধ হয় কুড়ি বাইশ হবে। একটা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা! কিন্তু অত্যন্ত কাঁচা, আমার চোখে অন্তত।

যাই হোক, বেলা প্রায় তিনটেয় আমাকে মুক্তি দেওয়া হল। ফেরবার পয়সাটাও দেওয়া দরকার মনে করলেন না তাঁরা। বাড়ি থেকে আমার কাছে আমার পুত্র শতদল গিয়েছিল তাই ওদের পয়সা না নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছিল। সম্পাদকীয় জীবনের বেশ একটা মজার অভিজ্ঞতা। ছেলেরা একমাত্র বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কেই ঘটনাটি জানিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, ভুল করে ধরেছে, নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

যুগান্তরে আমার বিভাগে আড্ডা মাঝে মাঝে বেশ জমে উঠত। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী প্রায় নিয়মিত। অশোক চট্টোপাধ্যায় মাঝে মাঝে আসতেন। ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এসেছেন কয়েকবার। বাসব ঠাকুর, কিরণকুমার রায়, অতুলানন্দ চক্রবর্তী

মাঝে মাঝে। অশোক মৈত্র প্রফুল্লকুমার মিত্র আসতেন তেলেভাজা খেতে। জ্যোতির্ময় ঘোষও তেলেভাজার বিষম ভক্ত ছিলেন। জ্যোতির্ময় ঘোষ ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিনসিপ্যাল। প্রকাণ্ড গাড়ি চালিয়ে এসে, তেলেভাজা খেয়ে এবং পরে এক টাকার তেলেভাজা কিনে নিয়ে সতোন দত্ত রোডের বাড়িতে ফিরে যেতেন, কিছুক্ষণ আড্ডা মেরে। ইনি ভাস্কর ছদ্মনামে হাস্যরসাত্মক গল্প লিখতেন যুগান্তরে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আসতেন মাঝে মাঝে। কালীকিঙ্কর প্রায় রোজ আসত। গোপাল ঘোষকেও প্রায়ই দেখা যেত। কালীকিঙ্কর বসে গল্প করত অথবা শুনত আর আপন খেয়ালে একের পর এক ছবি এঁকে যেত। লেখার প্যাডে কলম দিয়ে, কলমের হ্যাণ্ডল দিয়ে, কাগজ জড়িয়ে স্টাম্প বানিয়ে, কখনো বা আঙুলের সাহায্য নিয়ে কি আশ্চর্য সুন্দর সব ছবি এঁকে যেত। একদিনে কুড়ি পঁচিশখানাও এঁকেছে। সবই বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি। কখনো কারটুন। তার কল্পনার বৈচিত্র্য পরিমাপ করি এমন সাধ্য আমার নেই। নিজের আনন্দে ছবি আঁকা। আঁকা শেষ হলেই তার আনন্দও শেষ। তার দিকে আর ফিরেও চাইত না। আর আসতেন ১৯৪৫-৪৬ সনে জয়নাল আবেদীন। খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন তিনি, তাঁর অনেক স্কেচ আমি ছেপেছি।

গোপাল ঘোষ অতি শক্তিশালী শিল্পী। সেও প্যাডের কাগজে ক্রমাগত বসে বসে ছবি আঁকত। তার ছবি আঁকা ছিল ঝড়ের গতিতে। কয়েকটি টানে যা ফুটিয়ে তুলত, তা দেখামাত্র বোঝা যেত কতদিনের শিক্ষা আছে এর পিছনে। তার কলম যে রকম দ্রুতগতিতে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চলত, তাতে তার মধ্যে কোথাও দ্বিধা সঙ্কোচের স্থান ছিল না। সেও ছবি এঁকে ফেলে চলে যেত। আর আসতেন বিখ্যাত আড্ডাবাজ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। চরম আড্ডাবাজ আশু দেও আসতেন আড্ডা জমাতে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় আসতেন প্রায় নিয়মিত। হেমেন্দ্রকুমারও ছিলেন শিল্পী এবং তার চেয়েও শিল্পপ্রেমিক বেশি। নিজে নৃত্যশিল্পী ছিলেন, কবি ছিলেন, সঙ্গীতকার ছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ির সীতা নাটকের গান সবই তিনি রচনা করেছিলেন এবং বনদেবীদের নৃত্য পরিকল্পনা ও শিক্ষা ছিল তাঁরই। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় খুব মার্জিত সরস রচনা লিখতেন, এবং লেখা নিয়ে আসতেন মাঝে মাঝে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত নামক আমার পরিকল্পিত একটি ধারাবাহিক রচনা লিখেছিল। সে প্রতিবার এসে লেখা শুনিয়ে যেত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবিতা নিয়ে আসতেন অনুরোধ পালন করতে, এবং নিজে আবৃত্তি করে শুনিয়ে যেতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও আবির্ভাব ঘটত কদাচিৎ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশি আসেনি। শেষ এসেছিল যেদিন সেদিন হেমেন্দ্রকুমার রায় উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫৫ সনের কোনো একটা দিন। তার অকালমৃত্যুর বছরখানেক আগে। সেদিন তাকে কিছু উপদেশবাণী শোনাতে হয়েছিল, এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল আমার নির্দেশ মান্য করবে। সম্ভবত দশ মিনিটের মধ্যেই তা ভুলে গিয়েছিল। ওটাই ছিল তার স্বভাব। তার অকালমৃত্যুকে রোধ করা কারোই সাধ্য ছিল না। আমার দ্বিতীয় স্মৃতিতে তার বিষয়ে একটি অধ্যায় আছে, এবং পত্রস্মৃতিতে তার অনেকখানি অংশ উদ্ধৃতি করেছি। তার বয়স যখন ২৩ বা ২৪ তখন থেকেই তার লেখার ভিতর একটা বিশেষ শক্তি অনুভব করেছিলাম—সেই বঙ্গশ্রী যুগে ১৯৩৩ থেকে।

ইতিমধ্যে আর একটা প্রায় 'এক্সট্রা কারিকুল্যার' কাজ করেছি, তারও কথা কিছু বলা দরকার। সে হচ্ছে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে যোগ দেওয়া। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে সায়েন্স কলেজে এর জন্ম। আমার দ্বিতীয় স্মৃতি নামক পুস্তকে পরিষদের পুরো ইতিহাসটি দেওয়া আছে। আমি খবরের কাগজের নানা সংবাদ কেটে রেখেছিলাম, এবং পরিষদের আরম্ভের আগে যে সব ঘোষণা প্রকাশিত হয়, তাও সংগ্রহ করে রেখেছিলাম, সে সব জুড়েই এর একটা ইতিহাস খাড়া করেছিলাম পরে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় ১৮ই অকটোবর ১৯৪৭ তারিখে। সভা হয় সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতিত্ব করেন। সভাতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ নামটি গ্রহণ করা হয়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে মিল রেখে। সে সময় ঘোষণা করা হয়, ১৯৪৮ সনের ২৫শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হবে। ১৯৪৭ সনের ১১ই অকটোবর যে সভা হয় তাতে কমিটি গঠিত হয় এইভাবে—

সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কর্মসচিব ডকটর সুবোধনাথ বাগচী, সহযোগী সচিব সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ ডকটর জগন্নাথ গুপ্ত।

যখন সম্পাদক ছিলাম

সদস্যবর্গ : ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডঃ সবানীসহায় গুহসরকার, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, অমিয়কুমার ঘোষ, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, পরিমল গোস্বামী, সুধাময় মুখোপাধ্যায়।

এ তো সিকি শতক আগের কথা। এই পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার। কিন্তু ২৫ বছর পরে আমি আজ বলছি—পরিষদ, দেশের মধ্যে বিজ্ঞানের যে অপপ্রচার হচ্ছে তার দিকে আদৌ দৃষ্টি না দেওয়াতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নামে বুজরুকি প্রচার ক্রমে বেড়ে গেছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান নামক মাসিক পত্রে এই অপপ্রচার বিরোধী রচনা নিয়মিত প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অনাচার চললে বিজ্ঞান পরিষদের কি এসে যায়, মনোভাবটা অনেকটা কি এই রকম? বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার তবে কি একখানা মাসিক পত্রের কয়েকটি প্রবন্ধেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে? এবং যে মাসিকের শিক্ষা বিভাগের উপর কোনো প্রভাব নেই? বিজ্ঞানের নামে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ধাপ্পা চলছে তার সমালোচনাতেও এ ভীরুতা কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই পরস্পর-বিরোধা হয়ে গেল। বিজ্ঞান পরিষদের মূল উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার, কিন্তু যারা এই উদ্দেশ্যের বিপরীত পথে চলছে, উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিচ্ছে, তাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি, অর্থবল, এবং পৃষ্ঠপোষকতা অনেক —অনেক বেশি। তবে আর পরিষদের নামমাত্র সম্বল নিয়ে একখানা দুর্বল মাসিকপত্র প্রকাশের সার্থকতা কোথায়? গত প্রায় পনেরো বছর ধরে যুগান্তরের পৃষ্ঠায়, অবিজ্ঞানী আমি, যে একক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, এক বিজ্ঞান পরিষদের নিষ্ক্রিয়তা তা অনেকখানি ব্যর্থ করে দিচ্ছে না কি?

যাক এসব গভীর বিষয়ের আলোচনা। ইতশ্চেতঃতে কিছুকাল বেশ কয়েকটি বিষয়ে মজা সৃষ্টি করা গিয়েছিল। জগদীশচন্দ্র বসুর 'গাছের প্রাণ আবিষ্কার' বিষয়ে আগেই বলেছি। স্বপ্না সেনের কবিতার কথা বলি। সে তখন ব্রেবর্ণ কলেজের ইণ্টারমীডিয়েট ছাত্রী। আমার পরিচিত ছিল সে। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মারফৎ স্বপ্নার মাতামহের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, নাম বিজয়কান্ত সেন। তাঁর শিকার কাহিনী আমি ধারাবাহিক ছেপেছি যুগান্তরে, এবং তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিজয়বাবু হাজারিবাগে শিকারীরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই শিকার কাহিনীর কপি তৈরি করে দিত

তাঁর কন্যা জ্যোতি সেন। জ্যোতি সেন (এম-এ) এখন সরকারী অ্যানথ্রপলজি বিভাগে নিযুক্ত। তারই কন্যা স্বপ্না। স্বপ্না ছাত্রী অবস্থাতেই কবিতা লেখায় মেধা দেখিয়েছিল, ইংরেজি বাংলা দুটি ভাষাতেই কবিতা লিখতে পারত। খুব সহজ প্রকাশ, সাবলীল। সে তার কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি কবিতার নকল আমাকে পাঠিয়েছিল আমার কেমন লাগল জানতে চেয়ে। আমি এই কবিতা দিয়ে একটি গল্প রচনা করলাম। একটা উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে কিছু 'আধুনিক' কবিতা পড়ে খুব খারাপ লেগেছিল, পরবর্তী ঘটনা তারই প্রতিক্রিয়া। প্রথমে স্বপ্না সেনের কবিতাটি অংশত উদ্ধৃত কর।—কবিতাটির নাম. তুমি।

…নয়ন তোমার পায় না দেখা
মন যে তবু জানে
অদেখা মোর নও তো তুমি, মাগো।
তোমারই সুর দেয় যে ধরা
নিত্য আমার গানে
প্রাণের মাঝে যায় যে বলে—জাগো।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী এই কবিতাটি কি ছন্দে কিভাবে কল্পনা করেছিল, তা বোঝাবার পক্ষে এটুকুই আমার কাজে লাগবে। সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করে আমি লিখেছিলাম স্বপ্না সেন এই কবিতাটি পাঠিয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছে, এটি আধুনিক কালে লেখা, অতএব একে আধুনিক কবিতা বলা যায় কিনা। অবশ্য এটি আমার বক্তব্য প্রকাশের জন্য একটি সাজানো ব্যাপার। আমি মন্তব্য করলাম আধুনিক কালে লেখা বলে এটি আধুনিক কবিতা কিনা সেটি তর্কের বিষয়। অতএব তর্কে না ঢুকে আমি আমার এক পরিচিত আধুনিক কবির কাছে ঐ কবিতাটি পাঠিয়েছিলাম। লিখেছিলাম—

আমার সেই বন্ধু ওটিকে আধুনিক কবিতা বলে স্বীকার করতে রাজি নন। ঐ কবিতাটি আধুনিক ধাঁচে লিখলে তার কি রূপ হত তাও নমুনাস্বরূপ তিনি লিখে পাঠিয়েছেন।…তাঁর মতে (তিনি ওর যা রূপান্তর ঘটিয়েছেন) তা অবান্তর কথা থেকে মুক্ত হয়ে এক অনির্বচনীয় রূপে ফুটে উঠেছে। রান্নার আগে মুরগীর পালক ছাড়ালে যেমন সুন্দর দেখতে হয় তেমনি।.. আমার বন্ধু ঐ 'তুমি' কবিতাটি যেভাবে আধুনিক করেছেন তা এই—

দুনিয়ার বুকে সাহারা
আরব সাগর, উটপাখীর ডিম।
সর্বাঙ্গে কলেরা ইনঅকুলেশনের ব্যথা।
বাদুড় হাসছে। কালো কালো কালো।
তোমার নাইলন শাড়ীর
রাঙা ইস্পাত উড়ছে পিঙ্গল বাঘের চোখে।
ডালিম, বেদানার রসে স্তম্ভিত।
আঙুর টক। সাড়ে তিন টাকা সের আপেল।
গেল গেল গেল
ঐ গেল রকেট।

এর পরে যা লিখেছিলাম তা সংক্ষেপে বলি। লিখেছিলাম আমি এই রূপান্তর পড়ার পরে শক পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ি। কারণ বিশ্বাস হতে চায়নি। তাই অন্য দুই বন্ধুকে এর নকল পাঠিয়ে বললাম, এই কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ পাঠাও। কারণ তা হলে ঠিক ধরতে পারব 'তুমি' কবিতার আধুনিক ভাষায় রূপান্তরের অন্তর্নিহিত অর্থটি কি। কারণ, হয়তো 'তুমি'র সঙ্গে তার ঐ আধুনিক রূপান্তরের একটা ভাবগত মিল আছে, যা আমি ধরতে পারছি না। কিন্তু দুই বন্ধু যে দুটি ইংরেজি অনুবাদ পাঠালেন—তার ভাষা সম্পূর্ণ এক। এও এক আশ্চর্য ব্যাপার। কি করে এটা সম্ভব হল, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। ওঁরা যে ইংরেজি অনুবাদ পাঠালেন তা এই—

Speak of me as I am;
Nothing extenuate,
Nor set down aught in malice
Then, must you speak
Of one that lov'd not wisely
but too well.

এই ভাবে চলল অক্ষম আধুনিক কবিতার প্রতি কটাক্ষ। এটি প্রকাশ হওয়ার পর একজন লিখলেন এ কেমন করে হল। আর একজন লিখলেন, দুজনের ইংরেজি এক হল কি করে? তার উত্তরে আমি লিখলাম (২৯-১১-৫৯):

এর কারণ আমিও জানি না, তবে অনুরূপ আর একটি ঘটনা বলি। ঘটনাটি আমি বিদেশী কাগজে পড়েছি। সংবাদে উল্লেখ ছিল রুশ ভাষা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি

থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদের এক যন্ত্র বেরিয়েছে। এই যন্ত্রে একবার পরীক্ষা স্বরূপ একটি ইংরেজি বাক্য প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। বাক্যটি ছিল এই—The spirit is willing but the flesh is weak। কিন্তু এর রুশ অনুবাদ যা পাওয়া গেল, পুনরায় তার ইংরেজি করলে দাঁড়ায়—The whisky is all right, but the meat has gone wrong। আমার বিশ্বাস, প্রাচীনপন্থী কবিতাও আধুনিক কবির মনোযন্ত্রে ঐ রকম ক্রিয়া প্রকাশ করে থাকবে।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেল সাধারণ-কৌতুক হলেই পাঠক বেশি পছন্দ করেন। মাত্রা ছাড়ালে বোধের সীমাও ছাড়িয়ে যায়। একবার মেয়েদের বয়স কমানো নিয়ে একটা লেখা বেরোয়। তা নিয়ে বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছিল খুব। মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে আমি দর্শক সেজে সব দেখছিলাম। তারও কিছু নমুনা দিচ্ছি।

১৫ই জানুয়ারি ১৯৬১ সংখ্যার সাময়িকীতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি, লেখিকা অমিতা গুপ্ত, প্রবন্ধের নাম, বয়স লুকান। এ প্রবন্ধটি আমার কাছে নেই, কিন্তু তা নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তা আমার ইতস্ততঃ থেকে জানা যাবে। এর এক সপ্তাহ পরে (২২।১।৬১) মজা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমি এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করি ইতস্ততঃতে। আমি লিখলাম—

…অমিতা গুপ্তর বয়স লুকান প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেছেন আমাদের দেশেব অনেক মা তাঁদেব মেয়েদেব বয়স গোপন করেন। এবং অনেক মেয়েও প্রকৃত বয়স বলতে চায় না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। এবং শুধু অভিজ্ঞতা নয়, প্রকৃত ঘটনাও লেখিকার বক্তব্য থেকে পৃথক। অর্থাৎ আমি বলি, একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে মেয়েদের বয়স আর বাড়েই না।…

প্রকৃতি থেকেই এই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, মেয়েদের কোনো দোষ নেই।

আমার লেখার আরম্ভটুকু মাত্র উদ্ধৃত করলাম। অনেক 'যুক্তি' ছিল এর পক্ষে। কিন্তু এর পরের ঘটনাগুলি বেশি চিত্তাকর্ষক বোধ হবে পাঠকের কাছে। আমি ২৯-১-৬১ তারিখের ইতস্ততঃর সবখানিই উদ্ধৃত করছি—

মেয়েদের বয়স লুকানো বিষয়ে দুখানা চিঠি পেয়েছি। একখানি মূল প্রবন্ধ বিষয়ে আর একখানি আমার মন্তব্যের সমালোচনায়। প্রথম চিঠি—

মাননীয় মহাশয়,

গত রবিবার ১৫-১-৬১ তারিখেব সাময়িকী বিভাগে শ্রীমতী অমিতা গুপ্তর 'বয়স লুকান' লেখাটি পড়ে যথেষ্ট মর্মাহত হলাম। কতগুলি অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে এভাবে আলোচনা করে আর যাই হোক সাহিত্যের মান বাড়ে বলে আমি মনে করি না। কিছু লিখে খবরের কাগজে নামটা ছাপার এই যদি উদ্দেশ্য থাকে লেখিকার—তবে অবশ্য কিছু

বলার নেই। কিন্তু সাময়িকী বিভাগে কিছু বুদ্ধিগ্রাহ্য তথ্যবহুল প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হবে এটাই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে নারীজগৎ বিভাগে মহিলারা কিছু নতুন লেখা দিয়ে পাঠক সমাজে লেখিকাদের মান বৃদ্ধি কববেন—এটাই বাঞ্ছনীয়।...

শ্রীমতী শ্যামলী সেন
কলিকাতা-৩৫

পত্রলেখিকা 'বয়স লুকান' বিষয়টাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে করেন না, এবং অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। সম্ভবত এজন্য যে, যে-বিষয় প্রত্যেকের জানা, এবং যে-ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং পুরানো তা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা অনুচিত। যেমন যদি কেউ প্রতিদিনের সূর্য ওঠা নিয়ে অথবা জন্মিলে মরিতে হবে নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তবে তা অবশ্যই অবান্তর। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই মেয়েরা বয়স লুকোতে আরম্ভ করেছে, সেই অতি পরিচিত ঘটনা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা সময় নষ্ট ছাড়া আর কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে একটি মেয়েকে তার বয়স কত জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল, কুড়ি বছর এক শ কুড়ি মাস। এক স্কুলের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ১৯০৫ সনে যার জন্ম, ১৯৬০ সনে তার বয়স কত? ছেলেটি পালটা জিজ্ঞাসা করেছিল, যে ১৯০৫ সনে জন্মেছে, সে ছেলে না মেয়ে আগে বলুন, তা হলে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব।

পরবর্তী চিঠিখানা আমার মন্তব্যের সম্পর্কে লেখা—

শ্রদ্ধেয় এককলমী,

আমি আপনার ইতস্ততঃর একজন অনুরাগী পাঠিকা। গত ২২শে জানুয়ারির ইতস্ততঃয় মেয়েদের বয়স কমানো-বাড়ানো সম্বন্ধে যা লিখেছেন সেটা আমার মনে হয় কেবলমাত্র বিবাহিতাদের প্রতিই প্রযোজ্য। তার আগে ছাত্রী অবস্থায় কিন্তু সেটি হবার উপায় নেই। কেননা স্কুল ফাইনালের পর থেকে আমাদের বয়স ফুবছর করে বাড়তেই থাকে হাজার আপত্তি সত্ত্বেও। তাই বুদ্ধি করে স্কুলে থাকতে থাকতেই যে যার নিজের বয়স নির্ধারণ করে ফেলে, যাতে করে বেশ কচি অবস্থাতেই সব কটা পাস করা হয়ে যায়। ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর কোন মেয়েকে জিজ্ঞেস করে যদি জানতে পাই যে, তার বয়স ১৮, তা হলে আমাকে বাধ্য হয়েই তাকে অভিনন্দন জানিয়ে চলতে হয়—ওমা, তুই কি ভাল মেয়ে রে! মাত্র ১২ বছর বয়সে স্কুল ফাইনাল পাস করেছিস? অমনি তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তাই বুদ্ধিমতী মেয়েরা আজকাল তাদের বয়সের হিসেব রাখে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, কি জানি, মা জানেন। কি ভাগ্যি আশেপাশে তার মা উপস্থিত থাকে না। নইলে মাকে উত্তর দিতে হত, কি জানি ভাই টাকা পয়সার হিসেব করবো না মেয়ের বয়সের হিসেব করবো। অতশত জানিনে। আমার অনেক বন্ধু আছে যারা জিজ্ঞেস করলে সত্যিই রেগে যায়।

অতসী চৌধুরী (এম-এসসি)

পত্রলেখিকা ঘরের শত্রু বিভীষণ। এর পর আর বলবার কিছু নেই।

যাই হোক এর পরেও এ জিনিস অনেক দূর গড়িয়েছিল। মেয়েদের বয়স কমানো নিয়ে বহু রকম ঠাট্টা প্রচলিত আছে ইংরেজি ভাষায় এবং অনেক কাল ধরে। আমি সেই দিক থেকেই কৌতুক সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলাম। একটি গল্পে পড়েছিলাম এক ভদ্রলোক একটি মেয়ের বয়স জিজ্ঞাসা করাতে মেয়েটি বলেছিল সেটা একটা জিনিসের উপর নির্ভর করে। কোন্ জিনিসের উপর?—মেয়েটি বলল, যখন বাবার সঙ্গে থাকি, তখন আমার বয়স ১৮, আর যখন মায়ের সঙ্গে থাকি তখন আমার বয়স ১২। অসকার ওয়াইলডের নাটকের একটি নাটকের একটি অংশে আছে—

লেডি ব্র্যাকনেল: (সেসিলিকে): লক্ষ্মী মেয়েটি, কাছে এসো তো। (কাছে এলো) তোমার বয়স কত হল বল তো?

সেসিলি: আমার আসল বয়স ১৮, কিন্তু সান্ধ্য পার্টিতে গেলে সব সময়েই বলি, আমার বয়স ২০।

লেডি ব্র্যাকনেল: বয়স একটু অদল বদল করে তুমি খুবই ভাল কর। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো মেয়েরই তার আসল বয়সটা প্রকাশ করা ঠিক নয়। তা করলে মনে হয় মেয়েটা কি হিসেবীরে, বাবা। (আত্মগত ভাবে) বয়স ১৮ কিন্তু সান্ধ্য পার্টিতে গেলে বলে ২০। বেশ তো অল্পদিনেই তুমি সাবালিকা হবে, অভিভাবকত্বের হাত থেকেও মুক্ত হয়ে যাবে। কাজেই মনে হয় অভিভাবকের মত নেওয়া এমন গুরুতর কিছু নয়।

জ্যাক: মাফ করবেন লেডি ব্র্যাকনেল, আপনার কথার মাঝখানে থামিয়ে দিতে হল। আমি বলছি, ওর ঠাকুরদার উইলের শর্ত অনুযায়ী ওর বয়স ৩৫ না হওয়া পর্যন্ত ওর স্বাধীন মতে চলায় বাধা আছে।

লেডি ব্র্যাকনেল: ওটাকে আমি খুব আপত্তিকর মনে করি না। ৩৫ বছর বয়স তো খুবই চিত্তহারী বয়স। এইতো লণ্ডনের সমাজ অভিজাত শ্রেণীর স্ত্রীলোক ভরা, তাঁরা বহুকাল ধরে ৩৫ বছরে এসে থেমে আছেন। যেমন ধর লেডি ডাম্বলটন। আমি জানি তিনি যখন ৪০ বছরে পড়েন, তখন থেকে তিনি ৩৫ বছরের হয়ে আছেন, এবং সেও আজকের কথা নয়।…

এরকম অনেক ঠাট্টা প্রচলিত আছে ইংরেজিতে। যেমন, অ্যামেরিকায়

কোনো স্ত্রীলোক প্রেসিডেন্ট হন না কেন? কারণ তা হতে হলে বয়স অন্তত ৩৫ হওয়া দরকার, কিন্তু কোনো স্ত্রীলোক তাঁর বয়স ৩৫ হয়েছে একথা স্বীকার করেন না। পৃথিবীর বয়স কত তা ঠিক জানা যায় না, তার কারণ পৃথিবীকে স্ত্রীলোক কল্পনা করা হয় বলে।

এ রকম কত যে 'জোক' প্রচলিত আছে মেয়েদের বয়স নিয়ে। অসকার ওয়াইলডের যে নাটিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি সেটি আজ থেকে ৮০ বছরের আগে লেখা। সহজেই বোঝা যাবে—ইংল্যাণ্ডে কতদিন আগে থেকে মেয়েদের বয়স নিয়ে বিদ্রূপ প্রচলিত আছে। এবং আমাদের দেশেও যে এই লুকানোর কাজ চলে আসছে তা 'দি ইম্পাবট্যান্স অভ বিইং আর্নেস্ট' নামক নাটক পড়ার পর থেকে নয়। সব দেশেই এটি স্বভাবতই আছে। অতএব যখন বয়স নিয়ে মেয়েদেব মধ্যে ঝগড়া চালাতে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, তখন আমার মনে বরাবরই এই পটভূমিটি ছিল। এইবার বাকি অংশটুকুর নমুনা দিচ্ছি (এটি ১২-২-৬১ তারিখে প্রকাশিত।)—

স্বর্গ থেকে নারদ নামছেন ঢেঁকি-বাহনে। হাতে বীণা। চোখ দুটি বোঁজা। যেন কিছুর মধ্যেই নেই, এমনি ভাব। মেঘের অন্তরাল থেকে অদৃশ্য বহু কণ্ঠে 'নারদ নারদ' ধ্বনি উঠছে। নারদ মৃদু মৃদু হাসছেন। ফলে যুগান্তর ম্যাগাজিন সেকশনে কি হচ্ছে দেখা যাক—

প্রিয় এককলমী মহাশয়,

২২শে জানুয়ারি যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে প্রকাশিত অমিতা গুপ্তর 'বয়স লুকানো' রচনাটির দেখলাম আপনি এক রকম সমর্থনই জানিয়েছেন, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। কেননা এ অভ্যাস শুধু মেয়েদের নয় ছেলেদেরও আছে। তা ছাড়া এমন প্রাচীনাকে আমি জানি, তাঁরা নিজেদের বয়স বাড়িয়েই বলে থাকেন।

শ্রীমতী অমিতা গুপ্ত লিখেছেন যে, আমাদের দেশে শতকরা নব্বুই জন মহিলাই তাঁদের স্নেহের পাত্র-পাত্রীদের এবং নিজেদের বয়স কম করে বলে থাকেন। এবং এটা কম করে বলার অভ্যাস পুরুষ মানুষদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু আমি বলব এ অভ্যাস পুরুষদের মধ্যেও বেশ আছে। তাঁরা চাকরির সুবিধার জন্য স্কুল কলেজ থেকেই বয়স কম করে লিখিয়ে রাখেন। আমি এমন একজনকে জানি তাঁর প্রতি জন্মদিনেই গত পাঁচ বছর ধরে একই বয়স ঘোষণা করা হচ্ছে। আর নিজেকে সকলের থেকে ছোট প্রতিপন্ন করার জন্য সমবয়সী বা ছোটকে দাদা বলে ডাকতেও দুএকজনকে দেখেছি। তা ছাড়া বয়স কম দেখাবার জন্য অনেকেই চুলে কলপ ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ যৌবনকে বিদায় দিতে মন চায় না। বিয়ের ব্যাপারে অবশ্য আমাদের দেশের ছেলেদের ভাবনা নেই। ছেলেমেয়েদের বয়স কম হলে নিজেদের বয়সও কমে যাবে বলেই হোক,

অথবা স্নেহের বশেই হোক অনেক পিতারও নিজ সন্তানদের বয়স কমিয়ে বলার অভ্যাস আছে।…এ নিয়ে শুধু মেয়েদেরই দোষ দেওয়া যায় না।

স্মৃতি ঠাকুর
ওয়েলিংটন স্কয়ার, কলিকাতা

শ্রদ্ধেয় এককলমী মহাশয়,

আমার অতিভাষণের দোষ নেবেন না। মেয়েদের বয়স লুকানোর উত্তরে লিখছি।..

প্রকৃত বয়স লুকানোটা মেয়েদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। দরকার মত বয়স কমানো-বাড়ানো মেয়েপুরুষ আবালবৃদ্ধ সবারই করতে হয় এবং সেটা একান্তই দরকার মত। কেবলমাত্র বয়স কমানোর জন্যই কমানোর কোনো মানে হয় না। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যক্তি বয়স কমান। ভদ্রলোকেরা বয়স কমান পেনশন প্রাপ্তির বয়সটা ঠেকিয়ে রাখতে, উপযুক্ত সাক্ষীসাবুদ নিয়ে লিখিতভাবে। মায়েরা মেয়েদের বয়স কমান উপযুক্ত জামাই পাবার আশায়। বাপেরা ছেলেদের বয়স কমান অল্প বয়সে ছেলের কৃতিত্ব দেখাবার লোভে।…ছেলেরা কোনো কাজে অকৃতকার্য হলে প্রবীণরা অনায়াসে নিজেদের বয়স দুচার বছর বাড়িয়ে তাঁদের এখনও অটুট শক্তির কথা সগৌরবে বলে থাকেন। যে সব শাশুড়ি বৌএর উপর অসন্তুষ্ট তাঁরা কচি বৌকেও বুড়ী বলতে দ্বিধা করেন না—যদিও ছেলেরা সর্বদাই তাঁদের কোলের খোকা—বয়স যতর কোঠায়ই হোক।

বিনীতা—অঞ্জলি বসু (এম-এ)
নিউ আলিপুর, কলিকাতা

শ্রদ্ধেয় এককলমী মহাশয়,

২৯শে জানুয়ারি রবিবারের ইতস্ততঃয় বয়স লুকান নামক প্রবন্ধের বিরুদ্ধে শ্রীমতী শ্যামলী সেনের তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ পত্রখানি পড়ে বুঝতে পারলাম ঐ প্রবন্ধে অপ্রিয় সত্য কথা বলে অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছি। পত্রলেখিকার মতে আমার লেখার কোন সাহিত্যমূল্য নেই, এবং এরূপ লেখা উচিত নয়, কিন্তু আমি তো আমার লেখার উচ্চ সাহিত্যমূল্য দাবি করছি না, আর এ ধরনের লেখা প্রকাশ করা উচিত কি অনুচিত তা এ সব যাঁরা নির্বাচন করেন তাঁরাই বুঝবেন ভাল। নিছক সাধারণ ভাবেই মেয়েদেব দোষ ত্রুটির একটা দিক তাঁদেব সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম, তাতে ব্যক্তিগতভাবে পত্রলেখিকার এত বিরক্ত হবার কি কারণ থাকতে পারে?…

প্রথমে আমার লেখার কোন গুরুত্ব আছে মনে করিনি। কিন্তু তাই নিয়ে এত বেশি সমালোচনা পড়ে মনে হচ্ছে বেশ কিছু গুরুত্ব বেড়ে গেল।…মেয়েলি লেখা বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন বুঝলাম না। মেয়েরা পুরুষালি ছাঁদে লিখলেই কি সে লেখা বুদ্ধিগ্রাহ্য, তথ্যবহুল ও মূল্যবান হয়ে উঠবে?…

পত্রের শেষে একটি কথা না লিখে পারছি না। আমার প্রবন্ধের আপনি যে সমালোচনা করেছিলেন তাতে বিশেষ খুশি হতে পারিনি, কারণ আপনার লেখায় কিছু

বাড়িয়ে বলেছেন ও আমাদের নিয়ে মজা করেছেন। আমিও একজন মেয়ে, এ লেখা কি করে সহ্য হয় বলুন? নমস্কার ও শুভেচ্ছা রইল।

অমিতা গুপ্ত
কলিকাতা ১৪

মাননীয় এককলমী মহাশয়,

গত ২৯-১-৬১ তারিখের ইতশ্চেতঃতে শ্রীমতী শ্যামলী সেনের লেখাটা পড়লাম। একটা কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—সাহিত্যের কাজ কি সব সময়েই প্রয়োজনীয় বিষয় পরিবেশন করা? সেখানে কি সব সময়েই কোন নীতি, তত্ত্ব বা তথ্যকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে হয়? আমার তো মনে হয় এটা মোটেই বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। অপ্রয়োজনের আনন্দ দান করাই সাহিত্যের কাজ। সেখানে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রচার করা চলে না, সাহিত্যে অপ্রয়োজনীয় আনন্দই আমাদের আস্বাদ করতে হবে।···ইতি

কুমারী মঞ্জু রায়
সিঁথি

এই শেষ চিঠিখানার আরম্ভের দিকে যে আক্রমণ ছিল তা বড়ই নিষ্ঠুর। তাই সেই অংশটি বাদ দিয়ে বাকি অংশটি রেখেছি।···মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া লাগলে তা সম্ভবত ঐ রকমই হয়। কিন্তু বয়স নিয়ে আব ঝগড়া কেন? হায় মূঢ়াগণ, প্রকৃতির নিজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ তর্কে কি ফল?···

কিন্তু এ বিবাদ এখানেই মেটেনি। মাত্র দুসপ্তাহ বন্ধ ছিল। তারপর ১২-৩-৬১ তারিখ থেকে আরম্ভ হল। আমি ভূমিকা লিখলাম মেনডেলীয় তত্ত্বকে একটুখানি ব্যাখ্যা করে। তার সারাংশ হল এই যে, উনবিংশ শতকে গ্রেগর ইয়োহান মেনডেল নামক এক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী (তিনি প্রাণী-বিজ্ঞানীও ছিলেন) বংশগতি বিষয়ে এক আশ্চর্য পরীক্ষা করেন। তাঁর প্রথম পরীক্ষা তাঁর নিজের বাগানে। তিনি হলুদ ও সবুজ রঙের মটর শুঁটি নিয়ে ক্রস-ফারটিলাইজেশন বা সঙ্করণ ঘটিয়ে যে শস্য পেলেন তার রং হল হলুদপ্রধান সবুজ। তার পরের বংশে তিন রকম রঙের ফসল ফলল। একদল হল বিশুদ্ধ হলুদ আর একদল হল বিশুদ্ধ সবুজ, আর একদল হল ঠিক আগের হলুদপ্রধান সবুজ। তার পরের বংশে হলুদের ফসল হল হলুদ, সবুজের ফসল হল সবুজ। এইভাবে ফসলের মিশ্রণ যাই হোক, তৃতীয় বংশে আদির পুনরাবির্ভাব ঘটে। এই ভূমিকাটি শুধু উপমার খাতিরে। কিছু মিল পাওয়া যাবে বিবাদের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে—এটি আরম্ভ হল দুসপ্তাহ বাদে। কিন্তু তার পরিচয় দেবার সময় আসবে যথাসময়ে। তার

আগে এই বিষয়ের আর একটি ঘটনা ও আরো একটি ভ্রমণ কথা বলব। মেয়েদের এই বিবাদের দুবছর আগে কনক মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে 'একসাথে' মাসিক সম্পাদিকা ও ইংরেজির অধ্যাপিকা) একটি গল্প লিখল, যা উল্লেখযোগ্য। গল্পটি ছেপেছিলাম ২৯-৩-৫৯ তারিখে। মেয়েদের প্রকৃত বয়স কি তা গৌণভাবে অনুমান করলেও অনুমানকারীর কি দুর্দশা ঘটে, গল্পটিতে তারই একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি। গল্পটির সারাংশ এই—

সুনন্দার চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু প্রসাধনের সাহায্যে সে কাউকে তা জানতে দেয়নি। তার মেয়েকে একটি যুবক ছবি আঁকা শেখায়। এই শিল্পীটিকে সুনন্দার খুবই পছন্দ। সে তার জন্য একদিন পুলওভার বুনতে আরম্ভ করল। কয়েকদিন পরে তাকে একদিন আসতে বলেছে, গলা পর্যন্ত বোনা হয়ে গেছে, শেষ মাপ নিতে হবে যদি অদলবদল করতে হয়। সুনন্দা বাইরে গিয়েছিল, কিন্তু ফিরতে একটু দেরি হওয়াতে তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছিল। হঠাৎ দেখতে পেল শিল্পী যুবকটি তার পাশ দিয়ে জোরে হেঁটে এগিয়ে চলেছে, সুনন্দাকে সে লক্ষ্য করেনি। সুনন্দা তাকে ডেকে বলল, আরে, অম্লান যে, চিনতে পারছ না নাকি? যুবকটি অপ্রস্তুতভাবে বলল—অ্যাঁ, আপনি? সত্যিই আমি চিনতে পারিনি। মানে আপনি ঠিক আমাদের দেশের মেয়েদের ব্যতিক্রম। আপনি যেভাবে স্মার্টলি চলেছেন তাতে আমি ভেবেছিলাম কোনো অল্পবয়সী মেয়ে চলেছে বোধহয়। সত্যি, আপনার এই বয়সে আমাদের দেশের অন্য মেয়েরা কেমন যেন জড়সড়।

সুনন্দা অম্লানের কথা শেষ করতে না দিয়েই নীরবে এগিয়ে চলল। কিন্তু তার এই নীরব অবহেলার কারণ বুঝতে না পেরে অম্লান ভাবল সুনন্দা বোধহয় কোনো দুশ্চিন্তায় পড়েছে। এ সময় তার বাড়িতে না যাওয়াই ঠিক। সুনন্দা কোনো আপত্তি করল না। তারপর বাড়িতে এসে উলের বোনাটা খুলে ফেলল।···স্বামীকে বলল ওরা কি বুঝবে এমন ফ্যান্সি জিনিষের মর্ম?···এই উল দিয়ে রিনির একটা জাম্পার বুনে দেব!

বয়স লুকানো নিয়ে আন্দোলন পর্ব আরম্ভ হওয়ার দুবছর আগের লেখা এই গল্পটি পুরুষের লেখা নয়। এবং এ গল্পটির মধ্যে খুব চমৎকার একটি মনস্তত্ত্বের খেলা আছে আশা করি তা পাঠকের কাছে অতি স্পষ্ট। মেয়েরাই যদি মেয়েদের সঙ্গে এমন শত্রুতা করে, তা হলে আমার কিছুই বলবার নেই।

যাই হোক এ প্রসঙ্গ পরে আবার আসবে।

ভ্রমণের কথা বলছিলাম। এটি আমাদের চতুর্থ ভ্রমণ। ১৯৪৬ সনের হাজারিবাগ ভ্রমণের সময় আমরা ছিলাম চারজন। এবারেও তাই, কেবল কিরণকুমার রায়ের বদলে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের অমল দেব। ১৯৫২ সনের ঘটনা। কোথায় যাওয়া যায়—এ সমস্যার সহজ সমাধান হল ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের সাহায্যে। তাঁর সুন্দর একটি বাংলো আছে গালুডিতে, প্রায় মাঠের মধ্যে। তখন বাড়ির রক্ষক ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না, অতএব আমাদের গতি রোধ করে কে?

সমস্ত ব্যাপারটা আমি অরগ্যানাইজ করেছিলাম। অথচ আমি শেষ পর্যন্ত প্রতারিত হয়ে ফিরে এলাম সেখান থেকে।

॥ পনেরো ॥

গালুডি স্টেশনটি ঘাটশিলার পরে, টাটানগরের আগে। সেখানে যাওয়া মোটামুটি ঠিক হয়েছিল মার্চের দশ-এগারো তারিখে। তারপর ১৯শে মার্চ (১৯৫২) বুধবার রাত্রে রওনা হতে হবে। ঐ তারিখেই অমল দেব আমাদের বাড়িতে এলো সকাল সাড়ে দশটায় এবং সুধাংশুপ্রকাশ বিকেল তিনটের সময়। যাওয়ার পরিকল্পনাটা আরো একবার পাকা করে নেওয়া গেল। রবি ঘোষ সম্পূর্ণ সুধাংশুর অধীন, অতএব সুধাংশু রাজি হলেই রবি ঘোষ রাজি। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, (এম-এ, বি-এল) আমাদের লেখক গোষ্ঠীর একজন। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ। দুটি ভ্রমণে সে আমাদের সঙ্গী—প্রথমটি হাজারিবাগ ভ্রমণ—একাদশ অধ্যায়ে বলেছি সেকথা।

মাঝে মাঝে বাইরে ছুটে যাওয়ার একটা অদম্য ইচ্ছা জেগেছে এই ভাবেই। আমরা নাগপুর প্যাসেঞ্জারে রওনা হয়ে ভোর চারটের সময় গালুডিতে পৌঁছলাম। ৭ই চৈত্রের ভোর এবং বিহারের হাওয়া। ঘণ্টা-খানেক বসে থাকতে হল স্টেশন প্ল্যাটফর্মে—বাড়ির রক্ষকের অপেক্ষায়। সে এসে নিয়ে যাবে আমাদের, তবে সেই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারব। সেই একঘণ্টা বাইরের খোলা হাওয়ায় আমার বেশ কাঁপুনি ধরে গেল—এক্সপোজার ভালই লাগল। এবং যে সব ভাইরাস ও অন্যান্য ব্যাধিজীবাণু নাকে গলায় সেই ঠাণ্ডায় জেগে উঠল, তারা তাদের ইনকিউবেশনের জন্য মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময় দিল আমাকে। ঐ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমার কোনো কাজ থাকলে তা যেন শেষ করে নিই। একবেলা শুধু একটু বেড়াতে পেরেছিলাম। ক্যামেরা বহন সম্পূর্ণ বৃথা হল। ফিলমে এক্সপোজার দেওয়া হল না, এক্সপোজার লাগল সর্বদেহে। সঙ্গীরা উৎসাহের সঙ্গে নানা স্থান ঘুরে বেড়াল, কিন্তু পরদিন আমার পক্ষে আর ঘোরা সম্ভব হল না, কিছু জ্বর হল। খাওয়ার ব্যবস্থা কিছুই ছিল না, যে লোকটির আসার কথা ছিল রান্নার জন্য, সে আসেনি। সঙ্গীরা নিরুদ্দেশ, তারা জানে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তো হয়েই আছে, সুধাংশু টাটানগর চলে গেল এক বন্ধুর আকর্ষণে, একদিনের জন্য।

আমি মুখের আহারের বদলে চোখের আহার আরম্ভ করে দিলাম খোলা বারান্দায় একা বসে। সমস্ত দিন সেখানেই ছিলাম। সামনে যা দেখছি লিখছি বসে বসে। সম্পূর্ণ একটি রচনাই শেষ করে ফেললাম, সন্ধ্যা-রাত্রি ছটা সাড়ে ছটার মধ্যে। রচনাটি শেষ করেছিলাম এইভাবে—

খবরের কাগজের বাইরে একটা বড় জগৎ আছে—সেটিই আসলে বৃহত্তর জগৎ—অথচ তার অস্তিত্বই আমরা ভুলে থাকি।...

আমি যেখানে বাংলোয় বসে এই কথাগুলো লিখছি, তার সম্মুখে দিকচক্রের মতো প্রায় চতুর্দিকে পাহাড়শ্রেণী—বহু দূরের কুয়াশায় প্রায় বিলীন। খুব কাছেই একটা ছোট পাহাড়। বৃক্ষবিরল মাঠ। দূরে দূরে ছোট ছোট এক একটা গাছ বা গাছের গুচ্ছ। প্রায় তিন শ গজ দূরে ছোট একখানি লাল টালির ঘর। ছবির মতো দেখাচ্ছে। তার সামনে ডোবায় খানিকটা জল জমে আছে। ঢেউএর মতো উঁচুনীচু পথ। মাঝে মাঝে একজন কি দুজন লোক দুএকটা গোরু নিয়ে চলেছে। ছোট পাহাড়টির উপর দুটি রাখাল ছেলে গোটাকত ছাগল চরাচ্ছে। খাটো চিরল এক এক গুচ্ছ বাঁশ এই পাহাড়টির কটিদেশ স্তরে স্তরে বেষ্টন করে আছে—কাটা পথ পাহাড় ঘিরে ঘিরে উপরে উঠে গেছে। আজ প্রায় সমস্ত দিন ধরে মাত্র কুড়ি-পঁচিশজন লোক এই পাহাড়ী লাল মাটির মেঠো পথের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে।

একটি দুটি গোরু, গোটাকত ছাগল আর জনকত অখ্যাত মানুষ এরা এ জগতে অতি তুচ্ছ ঘটনা। এটি সংবাদই নয়। ...তনাবরণ এই যে পাহাড়ী ভূমি এর মধ্যেও কোনো নতুনত্ব নেই। অথচ এই বিরাট পটভূমিতে একটি দুটি প্রাণী সমস্ত নিসর্গ দৃশ্যকে কি সুন্দরই না করেছে। সংবাদ হিসাবে মূল্যহীন, কিন্তু ছবি হিসাবে এর মূল্য ধারণাই করা যাবে না।

পেঁজা তুলোর মতো লঘু মেঘ আকাশময় ছড়ানো, পশ্চিম আকাশ থেকে পূর্ব আকাশের দিকে অতি ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। সূর্যের আলোয় মেঘ যত উজ্জ্বল আকাশ তত নীল দেখাচ্ছে। কাছের পাহাড়টির গায়ে নানা রঙের খেলা। সুরকি-রঙ পাহাড় ঘিরে হাল্কা সবুজ ঝোপের বেষ্টনী। বাঁশের ঝোপগুলো হাল্কা সবুজের সঙ্গে সোনালি মিলে আশ্চর্য সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বড় বড় শাদা পাথর খণ্ড গাঁথা। যেন শঙ্খের মালা পরে আছে কণ্ঠে, মেখলায়। ধাপে ধাপে ধাপচাষের দাগ কাটা। পাহাড়টির বাঁ পাশে দিগন্তরেখা পর্যন্ত অবাধ বিস্তৃত মাঠ। লাল সোনালী সবুজ হলুদ রং সব এলোমেলো ছড়ানো, অথচ কি সুষমামণ্ডিত। দূরে অস্পষ্ট ঘননীল পাহাড়ের বেষ্টনী, তারই সম্মুখে এই রঙের খেলা। এই হচ্ছে পটভূমি। এরই বুকে একখানা খালি গোরুর গাড়ি ডোবার ধার দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে কোন্ অজানা পল্লী থেকে বেরিয়ে কোন্ অজানা লক্ষ্যে চলেছে। এই যে ছবি, উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে ছোট্ট একখানি ভাঙা গোরুর গাড়ি, দুটো গোরুতে টেনে নিয়ে চলেছে, একটি অনাবৃতদেহ বৃদ্ধ গাড়িটি চালিয়ে নিয়ে চলেছে, এরই জন্য প্রকৃতির এতদিনের আয়োজন। এ ছবি দেখলে গোপাল ঘোষের তুলির কথা

মনে পড়ে। যে রঙের শুধু আভাস আছে, ইঙ্গিত আছে, তা শিল্পীর মনে সম্পূর্ণ ধরা দেয়। আমাদের শুধু অভিভূত করে।

এইখানে খবরের কাগজ ভাল্‌লাগবে। মনেও পড়ে না। আর সে জন্যই এমন জায়গায় আসতে ইচ্ছে করে। খবরের কাগজ-বহির্ভূত জগতের সঙ্গে এখানে মুখোমুখি পরিচয়।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। আবহাওয়া স্তব্ধ ছিল হঠাৎ পূব দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। গাছপালায় আনন্দ জাগল, শুকনো পাতা এক ধার থেকে আর এক ধারে ছুটে চলেছে, ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ উঠছে চারদিকে। পশ্চিম আকাশে সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে। দূরের পাহাড় বেষ্টনী হঠাৎ বেগুনী হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার আকাশে ফুটে উঠল আর এক রহস্যময় জগৎ। এখানে আকাশে এত তারা। সব স্পষ্ট। উত্তরে দিগন্তের দিকে পুচ্ছ হেলিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বলছে। ধ্রুবতারা নির্মল রূপে দেখা দিয়েছে। প্রায় মাথার উপরে কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে সিংহরাশি, কাছাকাছি কালপুরুষ। আরও কিছুক্ষণ পরে পূব আকাশে বিরাট বৃশ্চিকরাশি মাথা তুলছে। এত তারা এবং এত স্পষ্ট কলকাতার আকাশে দেখা যায় না।

হঠাৎ পশ্চিম আকাশে দিগন্ত ভেদ করে আর এক আলো ফুটে উঠল। আর এক জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব। সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোনালি আলোয়।

দূরের ? টা কারখানার গলিত ইস্পাতের আলো। উত্তর দিকেও আর এক আলোর খেলা। পাহাড়ের গলায় আলোর সাতনরী হার। পাহাড়ের জঙ্গল পুড়িয়ে চাষের জায়গা করা হ.? শুনল ম। স্তরে-স্তরে সুদীর্ঘ আগুনের বেষ্টনী।

সম্পূর্ণ একা বসে আছি খোলা বারান্দায়। মন নানা কল্পনায় মেতেছে। একবার মনে হল এই নির্জন অন্ধকারে যদি একদল ডাকাত এসে আক্রমণ করে তা হলে সে বেশ একটা রোমাণ্টিক ব্যাপার হবে। ডাকাতদল মশাল হাতে হা-রেরেরে করে পড়বে আমার ঘাড়ে। রোমান্সের কল্পনায় রোমাঞ্চ জাগল। বলা বাহুল্য সেটি ঠিক আনন্দজনিত রোমাঞ্চ নয়।

অনেক রাত্রে আমার সঙ্গীরা ফিরে এলো। তারা শুনে এসেছে কিছুদিন আগে অন্য বাসিন্দারা থাকতে এই বাড়িতে বড় রকমের একটা ডাক তি হয়ে গেছে।

পরদিনই সকালে রওনা হতে হবে ঠিক হয়ে গেল। তার আরও কারণ আমি এই প্রথম হাওয়া বদলাতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছি, যাকে বলে শয্যাশায়ী তাই। এসেছিলাম অবশ্য সুস্থ শরীরে। (১৯৫২)

গালুডিতে পুরো তিন দিন ছিলাম। চতুর্থ দিন সকাল ১০টায় রওনা হয়ে ৫টায় হাওড়া পৌঁছলাম।

গালুডি রচনাটি আমার 'ম্যাজিক লণ্ঠন' নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

স্বাস্থ্য কিছু ভাল থাকলে আর কষ্টকর কাজে বাধা বোধ করিনি।

যেমন ১৯৪৫ সনে যুগান্তরে যোগ দেবার পর আমার দুপুর বেলা একটি রেডিও কথিকার প্রোগ্রাম ছিল। তখন টেপ রেকর্ডিং প্রথা চলেনি, আবিষ্কারও হয়নি। দিনটি ছিল হরতালের। রিকশও চলেনি। হেঁটে গেলাম গারস্টিন প্লেসের রেডিও অফিসে। ব্রডকাস্টিংএর পর সেখান থেকে হেঁটে চিৎপুর রোড ধরে এলাম বাগবাজার, তখন আনন্দ চাটুজ্জে লেনে ছিল সম্পাদকীয় দপ্তর। কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে হেয়ার স্ট্রীট, সেখান থেকে বাগবাজার, পুনরায় বাগবাজার থেকে রাত্রে কৈলাস বসু স্ট্রীট—সবটাই হাঁটা, মোট বোধহয় দশ বারো মাইল। ১৯৪৬ সনে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের বছরে একদিন হ্যারিসন রোড থেকে কৈলাস বসু স্ট্রীট পর্যন্ত কারফিউ জারি হয়েছিল সমস্ত দিনের জন্য। ঘর থেকে বেরোলেই কৈলাস বসু স্ট্রীট, অথচ যুগান্তরে উপস্থিত হওয়ার জন্য মন ছটফট করছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল একটু একটু। তার মধ্যে যেমন করে হোক যেতেই হবে, মনে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। মহাকালী পাঠশালায় উঠনে আমার জানালা, অর্থাৎ স্কুলের প্রতিবেশী আমি, সেখানকার দারোয়ান ভাল মানুষ, পরিচিত। তাকে বললাম পশ্চিমের প্রাচারে মই লাগাও। প্রাচারের অপরপারে একটি গাছ ছিল। মই বেয়ে উঠে সেই গাছের সাহায্যে ওধারে নেমে পড়লাম। বলে গেলাম মই যেন ঐখানেই থাকে। উচ্চে উঠে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হল। সরু গলি পথে মদন মিত্র লেনে গিয়ে বিবেকানন্দ রোড। চলে গেলাম হেঁটে যুগান্তর অফিসে কারফিউ এলাকার বাইরের কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে।

কিন্তু আসবার সময় বৃষ্টি একটু বেশি হয়েছিল, এমন অবস্থায় জুতো পায়ে গাছে ওঠা কিছু কষ্টকর হবে ভেবে ভূষণচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এলাম গাছে ওঠার সময় যাতে আমাকে ঠেলে রাখতে পারে। (প্রসঙ্গত বলি, যুগান্তরে আমি যতদিন ছিলাম, ভূষণচন্দ্র এইভাবেই আমাকে উপরে উঠতে সাহায্য করেছিল)।

মই ঠিক স্থানেই ছিল, এবং ঘরে ফিরতে কোনো অসুবিধা হয়নি। এ শুধু অ্যাডভেনচারের উদ্দেশ্যেই। এ শহরে আর কোনো বিপজ্জনক অভিযান চালাইনি, একমাত্র বিশ্বযুদ্ধ ও ঘরোয়া স্বদেশী যুদ্ধের বিপজ্জনক অবস্থায় শহরেই থেকে যাওয়া ছাড়া। আর একটি দুঃসাহসিক কাজের কথাটা বলতে সঙ্কোচ হয়। সে হল যুদ্ধের সময় থেকে ট্রামে ও বাসে ওঠা। সঙ্কোচ

হয়, কারণ এ পথে আমার অপেক্ষা বেশি দুঃসাহসিক ছিলেন আর সবাই। তবে বিশেষ করে ১৯৬১ থেকে ৩০-এ পথের বাসে উঠেও বেঁচে আছি এটা বলবার মতো কথা। পর্বতের একাধিক অভিযাত্রীর নায়ক বিশ্বদেব বিশ্বাসও স্বীকার করেছিল, ৩০-এ বাসে ওঠার চেয়ে পর্বত অভিযান অনেক সহজ।

সাময়িকীতে ও পূজাসংখ্যাগুলিতে চিকিৎসা জগতের আধুনিকতম অগ্রগতি ও তার তাৎপর্য বিষয়ে নির্ভরযোগ্য লেখক ডাক্তার পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা মাঝে মাঝে ছেপেছি।

স্বাস্থ্যচর্চা বা দেহচর্চা বিষয়ে অনেক লেখা চেয়ে নিয়ে ছেপেছি। তার মধ্যে বিষ্ণুচরণ ঘোষ, বিষ্ণুচরণের কয়েকজন ছাত্র, মনোতোষ রায় ও মেয়েদের মধ্যে লাবণ্য পালিতের কথা আগেই বলেছি, রেবা রক্ষিতও লিখেছে। বিশ্বদেব বিশ্বাস তার প্রথম মাউনটেনিয়ারিং শিক্ষার সময়কার প্রায় সব ইতিহাস ছেপেছি, ফোটোগ্রাফ সহ। তার বোন তপতী বিশ্বাসও তেনজিং-এর ছাত্রী ছিল, তার পর্বতারোহণ অভিজ্ঞতাও ফোটোগ্রাফ সহ ছাপা হয়েছে।

যুগান্তরের মধ্যতায় এই জাতীয় শিক্ষামূলক নানা বিষয়ের জ্ঞান পাঠক মহলে প্রচারের চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প, স্বাস্থ্যচর্চা এবং এ সবের বাইরে প্রতারণার নানা কৌশলের কথাও প্রচার করা হয়েছে যাতে লোকে কিছু সতর্ক হতে পারে। এ পর্যায়ে লিখত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। শিল্প বিষয়ে আমিই মাঝে মাঝে লিখেছি, সঙ্গীত বিষয়ে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিজন ঘোষদস্তিদার প্রায় নিয়মিত। বিখ্যাত লোকদের স্মৃতিকথা হেমেন্দ্রকুমার রায়, নলিনীকান্ত সরকার ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে লিখিয়েছি। মেয়েদের বিভাগের কথা আগেই বলা হয়েছে। আসরে বাইরে থেকে আসা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, মণীশ ঘটককে মাঝে মাঝে দেখা যেত।

ম্যাগাজিন সেকশনের দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে যে সব বন্ধুরা এসে আসর জমাতেন তাঁদের কথা আগে বলেছি। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি ভারতী জাহ্নবী যমুনা যুগের লেখকেরা যুগান্তরে আসতেন, কিন্তু এঁরা আমার বাড়িতেই আসতেন

অধিকাংশ সময়। কালিদাস নাগ অনেক লেখা দিয়েছেন, কিন্তু সে সবই লোক মারফৎ, নিজে আসতে পারেননি। শান্তা দেবী লেখা পাঠিয়েছেন ঐ একই ভাবে।

দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্য হত মাঝে মাঝে দুএকজন পাগলের আবির্ভাবে। এই পাগলদের বিষয়ে আমার দ্বিতীয় স্মৃতিতে একটি পৃথক অধ্যায় লিখেছি। আশ্চর্য সব পাগল, এদের ব্যবহার বৈচিত্র্যও অদ্ভুত। একজন শ্রদ্ধেয় পাগল বেশ স্ফূর্তিযুক্ত অবস্থায় একদিন এসে আমার সামনে বসলেন। হাতে লাঠি, বয়স পঞ্চাশের বেশি মনে হল। কি চাই প্রশ্ন করাতে চেয়ারে বসে হাঁটু নাচাতে নাচাতে হাসি মুখে বললেন, আমি যুগান্তরের মালিক, আমাকে চা খাওয়ান। চা তখনই এসেছিল, তা খেয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, দিন, সিগারেট দিন। তাও দেওয়া হল। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি যুগান্তরের ষোল আনা মালিক? বললেন, ষোল আনা। আমি বললাম, তা হলে তো আপনার সঙ্গে এতদিন পরিচয় না হওয়ায় আমাদের বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, হাঁ হয়েছে।

এর পরেই তাঁকে বললাম আপনি মালিক, তা হলে সম্পাদকের কাছে যান। তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হওয়া দরকার।

তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল, তারপর কি হয়েছিল জানি না। ডাক্তার অশোক বাগচী ভিয়েনা থেকে মাঝে মাঝে লেখা পাঠাত। একবার একটি মেয়ের হার্টের ত্রুটি কিভাবে অস্ত্রোপচারের সংশোধন করা হয় সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিল। মেয়েটির নাম ছিল পামেলা—আর অশোকের প্রবন্ধের নাম ছিল পামেলার হৃদয়।

এক পাগল নানা রকম লেখা পাঠাত। ঐ প্রবন্ধ পড়ার পর সে লিখল—আমার অনুমতি ছাড়া পামেলার হৃদয় যেন ওখান থেকে কোথাও না সরান হয়।

অশোক বাগচী, কাজি নজরুল ইসলামকে ভিয়েনায় পরীক্ষা করেছিল। তার তোলা দুখানা ফোটোগ্রাফ সহ নজরুল বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছেপেছিলাম, এবং এ বিষয়ে সে আমাকে যে চিঠি লিখেছিল, তা আমার তৃতীয় স্মৃতিগ্রন্থ 'আমি যাঁদের দেখেছি'তে নজরুল অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি। অশোকের আর একটি রচনা নিয়ে যে মজা হয়েছিল তা এইখানে বলে রাখি।

যখন সম্পাদক ছিলাম

কলকাতা ফিরে এলে তার একটি প্রবন্ধ ছেপেছিলাম, নাম ডাক্তারের শখ (৩-৩-৬৩)। প্রবন্ধে বলা হয়েছিল কয়েকজন ডাক্তারের পেশাবহির্ভূত শখের কথা। কার কোন্ 'হবি'। সরস রচনা। আমি ছাপার আগে শেষ দিকে একটি লাইন জুড়ে দিয়েছিলাম—ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শখ ছিল কবিতা লেখা, এবং সেজন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ছাপা হওয়ার পরে নানা বাঙালী পাঠকপাঠিকা তার মধ্যে এম-এ উপাধিধারীও ছিলেন, তাঁরা তীব্র তিরস্কারপূর্ণ চিঠি দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলেন, হিউমার সবার জন্য নয়। আমার সংযোজিত ঐ কথাগুলিপড়ে তাঁরা হাসির বদলে লেখককে আক্রমণ করলেন। রবিবাবু 'রসিকতার ফলাফল' লিখেছিলেন সেই কতকাল আগে। জ্ঞানী ব্যক্তির ইঙ্গিতপূর্ণ সেই রচনা প্রত্যেকের পড়া উচিত। 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ'—কবি বররুচি এককালে আক্ষেপ করে বলে গেছেন। প্রমথ চৌধুরী ১৯৩৯ সনে একদিন একটি খুব মূল্যবান কথা বলেছিলেন—'রসিকতা না বুঝে চুপ করে যাওয়া ভাল, কিন্তু ভুল বুঝে তেড়ে এলে হয় মুশকিল।'

আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। এদেশে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ বা হিউমরএর তাৎপর্য বুঝতে পারার মতো পাঠক শিক্ষিত দেশের তুলনায় অনেক কম, এবং তা স্বভাবতই।

এ বিষয়ে আমার আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়ের ভূমিকায় প্রমাণ সহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছি। আরো দুএকটি ঘটনা বলি সংক্ষেপে। 'ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের শখ ছিল কবিতা লেখা'—এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সাংঘাতিক। এম-এ উপাধিধারী লিখেছিলেন "যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একজনও এরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দেয় সে জাতির রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী উৎসব নিষ্ফল হইয়াছে।" একবার হাল্কা সুরে লেখা কবিতার বইয়ের সমালোচনায় লিখেছিলাম 'কবিতাগুলির গিল্টিটা একটু ঘষলেই সোনা বেরিয়ে পড়বে।' আর যায় কোথা?—আক্রমণ এলো। চিঠি এলো 'কবিতাকে প্রশংসা করতে হয় করুন, কিন্তু তার জন্য এরূপ অসত্য তথ্যের আমদানি কেন?' কি ভীষণ সত্যনিষ্ঠা! হিউমর এই দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করে সাধ্য কি? আর একবার সত্য শিকার কাহিনী ধারাবাহিক ছাপছিলাম। তার সাধারণ নাম দিয়েছিলাম—'সত্য হলেও গল্প।' সাহিত্যেঃ

এ রকম অনাচার অনেকেই সহ্য করতে পারেননি। 'হরিনাথ দে স্মরণে' এই শিরোনামে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এক প্রবন্ধ ছেপেছিলাম। প্রবন্ধে হরিনাথ দে'র কথা ছিল না। ভাষাতত্ত্ববিদকে স্মরণ করে লেখা। বহু পাঠক প্রবন্ধে হরিনাথ দে'র কথা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

খুব সরল ভাষায় কোনো রকম ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা বাদ দিয়ে যদি কৌতুক রচনা সম্ভব হয়, তবে তা চলতে পারে—এই হল আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা। যদি লেখার মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম ইঙ্গিত থাকে বা সূক্ষ্ম কৌতুক থাকে, তবে তার পাশে বন্ধনীভুক্ত করে লিখে দিতে হবে—'এটা কিন্তু কৌতুক' অথবা 'এখানে হাসতে হবে' অবশ্য যদি জনপ্রিয় হাস্যরসাত্মক লেখক হবার বাসনা থাকে।

এসব কথা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। উপরে যে সব দৃষ্টান্ত দিলাম তার কোনোটাই কৌতুকের ব্যাপার ছিল না, শুধু ভাষা ইঙ্গিতধর্মী হওয়াতে এই বিপদ। ইঙ্গিতপ্রবণতা ইংরেজি সাহিত্য পড়ার ফলে। ইংরেজি ভাষার উইট, হিউমর, স্যাটায়ার, বাংলা ভাষার উপরে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে, তবে মনে হয় এ প্রভাব খুব বেশি দিন থাকবে না। কারণ ইংরেজি পড়াশোনা ক্রমে বাতিল হয়ে যাবে। এবং ভবিষ্যতে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি—গোপাল ভাঁড় পুনর্জীবিত হবেন। এবং পানে লঙ্কার গুঁড়ো পুরে জামাইকে দেওয়ার মতো কৌতুক রস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এইবার তা হলে মেয়েদের বয়স নিয়ে বিবাদের বাকি অংশটি দেখা যাক। আমি পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ মেণ্ডেল তত্ত্বের কথা তুলেছিলাম—তার তাৎপর্য এই যে, পূর্বের বিষয়টা দুই পুরুষ পরে আবার একই রকম চেহারায় দেখা দিল। ব্যাপারটা আসলে কি, তা এই চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যাবে—

প্রিয় এককলমী,

কিছুদিন থেকে যুগান্তরের 'মেয়েদের বয়স লুকানো' সম্বন্ধে আলোচনা ও সমালোচনার ঘটা খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। শ্রীমতী অমিতা গুপ্তর লেখা পড়ে মনে হয়েছিল, একটি অবহেলিত প্রসঙ্গের অবতারণা করে উনি ভালোই করেছেন। আমার বান্ধবী শ্রীমতী অতসী চৌধুরীকে তার স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অষ্টাদশী বান্ধবী লাভের সৌভাগ্যে অভিনন্দন জানিয়েছি এবং মেয়েদের এই মনোভাবের স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে যদি সে কোন আন্দোলন করতে চায়, তবে তাকে সাহায্য করব বলে কথা দিয়েছি। এক কথায় বলতে

গেলে লেখাটা উপভোগ করেছি। শ্রীমতী শ্যামলী সেনের লেখা পড়ে মনে হয়েছে—ভদ্রমহিলা একটু গুরুগম্ভীর বিষয়ের লেখা পছন্দ করেন। শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তীর মনস্তাত্ত্বিক আলোচনাও সঙ্গ হয়েছে। কিন্তু মূল আলোচনার জের এখন যে স্তরে এসে থেমেছে তাতে আপনি তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন—'মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া লাগলে তা ঐ রকমই হয়।' ভাগ্যিস, এঁরা পরস্পরের পরিচিত নন, অন্যথা কে বলতে পারে যে এই বাক্যদ্বন্দ্ব একদিন চুলোচুলিতে পর্যবসিত হবে না? আপনি অনুগ্রহ করে এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানুন—দোহাই আপনার, নারদের ভূমিকা সত্যি সত্যিই যেন নিয়ে বসবেন না!

এবারে আপনার মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আপনার মতে, পুরুষেরা বয়স কমায় দায়ে পড়ে, অর্থাৎ প্রয়োজনে; আর মেয়েরা কমায় অপ্রয়োজনে—কারণ এটা তাদের সহজাত। আমার আপত্তি এখানেই। অপ্রয়োজনে পুরুষের বয়স কমানো এবং মেয়েদের সত্যি বয়স স্বীকার করার মত সদিচ্ছার অনেক নজির দেখাতে পারি। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন সুরাহা হবে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ আপনি হয়ত বলবেন—**exception proves the law.**

অণিমা চক্রবর্তী (এম-এসসি)
কলিক ৭।-২৩

একলমী মহাশয়,

আপনার লেখা আমি বহুদিন ধরেই পড়ে আসছি। তখন থেকেই জানি কয়েকটা ক্ষেত্রে আপনার মতামত মোটেই নিরপেক্ষ নয়, পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। কিন্তু আপনার পক্ষপাতিত্ব (পুরুষদের প্রতি) এ পর্যন্ত কোন অশান্তি সৃষ্টি করেনি বলেই চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু ১২ই ফেব্রুয়ারির যুগান্তরে ইতস্ততঃ পর্যায়ে চোখ বুলিয়ে দেখলাম আপনার পক্ষপাতিত্ব সীমা অতিক্রম করে গেছে। এই পর্যায়ে দেখলাম কয়েকজন মহিলার কয়েকটি প্রতিবাদপূর্ণ চিঠির সঙ্গে আছে হাড় জ্বালাতন করা আপনার কয়েকটি মন্তব্য। বলা বাহুল্য মহিলারা পরস্পরকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাদের সর্বপ্রথম আক্রমণ করা উচিত ছিল আপনাকে। আমি সে ভুল করব না। এবং সেই জন্যেই আমি আপনারই মন্তব্য কঠিন প্রতিবাদ নয়, নিন্দে করতে চাই। শুধু এবারকার মন্তব্যেই নয়, আগেও আপনি বহুবার বহু জায়গায় বলে এসেছেন বয়েস কমানো ব্যাতিকটা কেবল মেয়েদেরই, পুরুষদের নয়। পুরুষেরা নাকি নিতান্ত দায়ে পড়েই বয়েস কমায়। মেয়েদের মত ওটা নাকি তাদের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। কিন্তু আমি বলতে চাই এরকম প্রথম শ্রেণীর বাজে কথা একমাত্র পুরুষ মানুষেই বলতে পারে মেয়েরা নয়। বাজে কথা বলতে পারে না বলেই মেয়েরা নিজেদের দোষ অকপটে স্বীকার করতে পারে। শ্রীমতী অমিতা গুপ্তের লেখা 'বয়স লুকানো' প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ। কিন্তু আপনি এখনও আপনার পূর্ব মতের জের টেনে চলেছেন। আমি বুঝতে পারি না আপনারা পুরুষ মানুষেরা নিজেদের সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করতে সাহস পান না কেন? আপনাদের এই সাহসের অভাব

থেকেই কি কাপুরুষ কথাটার উদ্ভব হয়েছে? কথাটার পুরুষ অথবা পুরুষ অংশটার জন্যেই ওটা কোনদিন মেয়েদের প্রতি প্রয়োগ করা চলবে না। এখন আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, বয়েস কমানো বাতিকটা শুধু মেয়েদেরই সহজাত প্রবৃত্তি নয়, ওটা পুরুষদেরও। তারা নিতান্ত দায়ে পড়ে মোটেই বয়েস কমান না। আমি এমন বহু পুরুষ মানুষের নাম ঠিকানা দিতে পারি যারা বিনা প্রয়োজনে নিজেদের বয়েস এমন অস্বাভাবিক রকম কমিয়ে ফেলতে পারেন যে হাসতে গিয়ে লোকের দম আটকাবার উপক্রম করে। এসব নজির আপনাদের চোখে পড়ে না কেন জানেন? আপনারা কাপুরুষ বলে তাই। চোখে আপনাদের ঠিকই পড়ে। কিন্তু সে চোখ আপনারা বুজিয়ে নেন। নিজেদের দোষ দেখবার বা বলবার সাহস যে আপনাদের নেই। কিন্তু মেয়েদের দোষ দেখবার চোখটাকে আপনারা সব সময়েই খুলে রেখেছেন। সেই জন্যে আপনাদের শুধু কাপুরুষ নয় একচোখোও বলা চলে। কিন্তু জানেন তো সভ্য সমাজে এক চোখ বন্ধ রেখে আর এক চোখ খোলা রাখাকে মোটেই ভদ্রতা বলে না। তাই বলি এবার থেকে অন্তত ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্যেও আপনি দুটো চোখই খুলবেন এবং বলবেন যে বয়েস কমানো অভ্যাসটা কেবল বিশ্বব্যাপী মেয়েদেরই সহজাত প্রবৃত্তি নয়, বিশ্বব্যাপী পুরুষদেরও সহজাত প্রবৃত্তি। এরপরও যদি আপনি মতামত না পালটান তবে বলতে বাধ্য হব যে, মেয়েদের মধ্যে যে ঝগড়াটা শুরু হয়েছে তা আপনিই বাধিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে এ যুদ্ধক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছেন আপনি। কেন করেছেন তাও বলি। কিছুদিন আগে আপনিই বলেছেন বর্তমানে দুপক্ষে যুদ্ধ বাধলে, কোন পক্ষেরই জয় হয় না, জয় হয় তৃতীয় পক্ষের। মেয়েদের যে বাক বিতণ্ডা শুরু হয়েছে তাতে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকাটি আপনিই নিয়েছেন। কিন্তু জেনে রাখুন তৃতীয় পক্ষ থাকা আপনার মোটেই হবে না। কি করে আপনাকে বিপক্ষে পরিণত করতে হবে তা জানি। আর সেই জন্যে প্রত্যক্ষ আক্রমণ আপনাকেই করা হবে। অতএব এখনও সতর্ক হন। মতামতের জন্যে কোনদিন আপনি দায়ী নন। কিন্তু মাঝে মাঝে বিনা কারণে মৃদু মৃদু হেসে, চোখ বুজে, বীণা হাতে স্বর্গ থেকে নামবার চেষ্টা করেন,— এটা ভাল নয়।

বিজয়া মৈত্র
শ্রীরামপুর

একলমী মহাশয়,

বিগত ১৫ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীঅমিতা গুপ্তের লেখা মেয়েদের 'বয়স লুকানো' প্রবন্ধের ব্যাপারে বহু তর্ক বিতর্কের সূচনা হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বয়স লুকানো ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা উভয়েই প্রকৃতপক্ষে যা সঠিক বয়স, তা থেকে কিছু কমিয়ে বলেন। এটি আমার মতেও, মনস্তাত্ত্বিক পথে দেখলে এর একটি কারণ আছে। সেই কারণটি হল এই যে, মানুষ চায় না প্রকৃতির বাঁধা ধরা নিয়মের গণ্ডীতে বুড়িয়ে যেতে। এতে যদি স্বল্প আয়ুর যুগে তার আয়ু বৃদ্ধি পায় তাতে ক্ষতি কি! তাই মনে হয়, এ ব্যাপারে অনর্থক তর্কের জাল না বুনে 'ইতি' দেওয়া উচিত। আপনাকে

আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি যে, এ ব্যাপারে ইতস্ততঃতে সমাপ্তি টেনে দিন। কলহ করে কোন কিছুতেই মীমাংসার পথে আসা যায় না। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে ইতি—

বিনীতা—শিপ্রা দত্ত

কলিকাতা-৩৩

শ্রদ্ধেয় এককলমী মহাশয়,

মঞ্জু রায়ের সঙ্গে আমি একমত। সব সময় শুধু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ও প্রয়োজন।

স্মৃতি ঠাকুর বলেছেন পুরুষরাও বয়স কমান। প্রমাণস্বরূপ তিনি চুলের কলপ ও নকল দাঁতএর কথা উল্লেখ করেছেন। পুরুষেরা একমাত্র চাকুরি ক্ষেত্রে বয়স কমিয়ে থাকেন, অকারণে নয়। আর চুলের কলপ ও নকল দাঁত বয়স কমানোর জন্য নয়, সুদর্শন হবার জন্যই ব্যবহার করা হয়। কলপ ও নকল দাঁত লাগানো অনেক পুরুষকেই দেখেছি নিজের প্রকৃত বয়সই বলে থাকেন (চাকুরির বয়স পর্যন্ত বলেন না)। কাজেই বয়স কমানোর ব্যাপারে পুরুষরা মেয়েদের ধারে কাছে আসতে পারবেন বলে মনে করি না।

জয়শ্রী চক্রবর্তী বয়স কমানোর একটা ভাল দিক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু বয়স লুকিয়ে 'অধিক বয়সের কালিমা (?)' দূর করতে পারা যায় কি? আমার তা মনে হয় না—বরং উলটো হয়। কি করে বয়স কমাব, পাঁচজনের কাছ থেকে প্রকৃত বয়স লুকিয়ে রাখব—সেই চিন্তা ও উদ্বেগ মনের তরুণোচিত উৎসাহ আনন্দ ও সতেজ ভাব নষ্ট করে দেয়। বেশি বয়সে যদি অল্পবয়সীদের মত উৎসাহ, আনন্দ স্ফূর্তি ও চাঞ্চল্য থাকে তো সেটা বরং অধিক বয়সের কালিমা দূর করতে পারে কিন্তু বয়স কমিয়ে তা হয় না। তার চেয়ে 'বয়সে আমি প্রৌঢ় কিন্তু উৎসাহ আনন্দ ও কর্মক্ষমতায় তরুণদের চেয়ে কিছু কম নই'—এই মনোভাবটিই আদর্শ, সুস্থ ও অনুকরণীয়। এই মনোভাবটিই মনের জরা দূর করতে পারে।

কুন্তলা দত্ত, বর্ধমান

শ্রদ্ধেয় এককলমী,

অমিতা গুপ্তের লেখাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের বয়স লুকানো সম্বন্ধে যে সরস আলোচনা চলছে খুব উপভোগ করছি। ঘরের শত্রু বিভীষণের ভূমিকা গ্রহণ করে আরও কিছু তথ্য যোগ দেবার বাসনা হচ্ছে, কিন্তু তার আগে এর আর একটা দিক আলোচনা করি।

মেয়েদের নিজেদের বয়স সম্বন্ধে দুর্বলতার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা বাদ দিয়ে এর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা সামাজিক প্রথাকে দায়ী করা চলে। গৌরীদান পর্বের পরেও একটা বিশেষ অল্প বয়সে কন্যাদায় থেকে নিষ্কৃতি না পেলে মা-বাবাদের নানা রকম সামাজিক শাস্তি টাস্তি পেতে হতো। এবং বিয়ের বাজারে মেয়েদের কনের পিঁড়িতে বসা ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা ছিল না। তাই মা-মাসীর দলই মেয়ের বয়স বারোর উর্ধ্বে কখনই উঠতে দিতেন না। কিন্তু আজ তো আর সে অবস্থা নেই। আজকাল তো বিয়ের ব্যাপারে মা বাবা দূরে থাক, বরও নয়, কনেই কর্তা। তবুও কেন যে বয়স কমানোর দুর্বলতা মেয়েরা

ছাড়ছেন না, তা বোঝা যায় না। দিল্লীর এক পার্টিতে অভিজ্ঞতা হয়েছিল একটি বিশেষ বয়সের কন্যাদের প্রতি সকলের সরব মনোযোগ। সামাজিক ভব্যতারও কমতি হচ্ছিল অধিক বয়স্কাদের প্রতি, বেচারীরা দৃশ্যমানভাবে অবহেলিত। পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণ? যৌবন সুন্দর। কিন্তু তা তো কোনক্রমেই চিরস্থায়ী নয়। শৈশব কৈশোরও তো চলে গেছে। বৃদ্ধি যার হয় সেই বৃদ্ধ। সময়ের সঙ্গে দেহে মনে বৃদ্ধি হচ্ছে, এর মধ্যে অসম্মান কোথায়? ফোটা ফুল বা পাকা ফল যদি প্রকৃতির শোভা বর্ধন করে, তখন যৌবনবতী নায়িকা বয়োবৃদ্ধা, প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাতে পরিবর্তিত হলে ক্ষতি কোথায়? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হবে, সেই তো জীবন! নয়তো কড়া মেকআপ আর চড়া রঙের শাড়ীতে বয়স আটকাবার প্রাণান্ত প্রয়াস হাসির খোরাকই জোগাবে!

পরিশেষে অতসী দেবীকে একটা কথা বলি। যাঁরা বিবাহিত নন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের বয়স বোঝাও খুব কঠিন। বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে বিরাট 'গ্যাপ' সকলেই চেপে যান! অকৃতকার্যতার তালিকাও অনুক্ত থাকে! তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপও বয়স বোঝবার পন্থা হিসাবে সব সময়ে 'ফুল প্রুফ্' নয়।

নমস্কারান্তে—শান্তা গুপ্ত, রাঁচী

মাননীয় এককলমী মহাশয়,

১২ তারিখের যুগান্তর পত্রিকার ইতস্ততঃয় প্রকাশিত পত্রগুলি পড়ে খুব খুশি হলাম, এবং আমার পক্ষেও যে কেউ কেউ আছেন তা জেনে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। শ্রীমতী স্মৃতি ঠাকুর লিখেছেন যে, বয়স কমিয়ে বলার অভ্যাস অনেক পুরুষেরও আছে, আমি বর্তমানে তাঁর বিপক্ষে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না, কারণ এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ জানি না। তবে আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরই আমার এক কাকা ঐ প্রবন্ধ পড়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, বয়স কমিয়ে বলা কেবল মেয়েদেরই স্বভাব নয়, ছেলেদেরও এ স্বভাব আছে। যখন আমি এ খবর জানলাম তখন আর আমার লেখার সংশোধন করবার সুযোগ ছিল না, সুতরাং শ্রীমতী স্মৃতি ঠাকুর আমার ঐ ভুল যে সংশোধন করে দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। স্মৃতি ঠাকুর আরও বলেছেন যে, অনেক মহিলা নাকি বয়স বাড়িয়েই বলেন, তা সেজন্য তো আমি শতকরা দশজনকে বাদ দিয়েই রেখেছি। তা ছাড়া যাঁরা বয়স বাড়িয়ে বলেন একটু খোঁজ করে দেখলে দেখা যাবে তাঁদের বয়স ৪০এর ঊর্ধ্বে, তার আগে বয়স বাড়িয়ে বলতে মন সায় দেয় না। শ্রীমতী মঞ্জু রায় যে আমার পক্ষে কিছু বলেছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

পত্রের শেষে আপনার কাছে আমার একান্তই অনুরোধ আপনি ইতস্ততঃয় আগে থেকে নারদ ঠাকুরকে একটু সরবার ব্যবস্থা করে আমাদের লেখনী-যুদ্ধ বন্ধ করুন। সামান্য কারণে মেয়েদের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব জেগে ওঠে তা আমি চাই না। সশ্রদ্ধ নমস্কার ও শুভেচ্ছা রইল—অমিতা গুপ্ত, কলিকাতা-১৪

লেখক সংখ্যা বৃদ্ধির কথা আগে বলেছি। সে বৃদ্ধি যে ক্রমে সমস্ত অনুমান এবং হিসাব ছাড়িয়ে আমার সম্পাদকীয় বিভাগের সবাইকে প্রায়

উন্মাদ করে তুলবে তা আগে কিছুমাত্র কল্পনা করা যায়নি। তা ছাড়া কবির সংখ্যাও যে এত হতে পারে তা আগে জানা ছিল না। ঘনবসতিপূর্ণ কলকাতা শহরের প্রতি বর্গমাইলে কত জনবসতি আছে জানি না, কিন্তু মনে হয়েছিল প্রতি বর্গমাইলে অন্তত ৩০০ কবি আছেন। তা বোঝা গেল কিছু কিছু কবিতা ছাপার কিছুদিন পর থেকেই, ডাকে অথবা হাতে অবিরাম কবিতা আসতে লাগল। মনে হল এক বাগবাজার এলাকাতেই অন্তত ৫০০ কবির বাস। 'ওর কবিতা বেরিয়েছে, আমারটা কেন ছাপা হবে না' এ রকম প্রশ্নের সংখ্যাও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। তাই শেষ পর্যন্ত কবিতা ছাপা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হল, শুধু বিশেষ উপলক্ষে দু একটি ছাড়া। কবিদের নিরাশ হতে হল। বললাম কবিতা আর ছাপা হবে না। এ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করতেই হল দায়ে পড়ে।

একদিন একটি ব্যাপারে স্তম্ভিত। বিদেশ থেকে কোনো নতুন কবির ছাপা একটি কবিতা ও কবির পরিচয় এলো ডাকে। তাতে অনুরোধ ছিল সেই কবির কথা ও কবিতা বিষয়ে সম্ভব হলে যেন ম্যাগাজিন সেকশনে কিছু বিরত করি। সেই বিদেশী চিঠিতে Magazine Editor, Jugantar, এই রকম ঠিকানা লেখা ছিল। পেলাম খোলা খাম, এবং তার ভিতরে সেই কবিতার বাংলা অনুবাদ। অফিসে যিনি চিঠি খুলেছিলেন তিনি কিছুমাত্র পরামর্শ না করেই সঙ্গে সঙ্গে কবিতার একটি অনুবাদ করে খামে পুরে দিয়েছিলেন। ফলে ঐ কবি বা কবিতা বিষয়ে কিছু ছাপাই সম্ভব হল না। সে বিদেশী কবি বা কবিতার নাম আজ আর আমার মনে নেই।

একবার পূজো সংখ্যা ছাপা হওয়ার পরে তৎকালীন সেক্রেটারি রতননাথ দত্ত আমাকে সেই সংখ্যায় ছাপা একটি গল্পের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এ গল্প আগে কোথাও পড়েছেন? আমি বললাম, না তিনি আমাকে একখানা বাংলা গল্পের বই দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন বইতে ছাপা গল্পটি কপি করে আপনাকে দেওয়া হয়েছে। কি করবেন এখন? আমার স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। লেখক পরিচিত ছিলেন। আমারও, তাঁদেরও। শেষ পর্যন্ত নীরবে, পূজা সংখ্যায় ছাপা অন্যান্য গল্পের মতোই, তিনি বরাদ্দ টাকার বিল পাস করে দিলেন। লেখকের সম্ভবত আজও ধারণা যে, তিনি সজ্ঞানে এই পাপ কার্যটি করেও

ধরা পড়েননি। ভূষণচন্দ্র দাসও ঘটনাটি ভালই জানে। রতনবাবুর দিক থেকে মহত্বই দেখানো হয়েছিল, এবং সেজন্য তাঁর ব্যবহারকে আমি মনে মনে প্রশংসা করেছি।

আরো বহু রকম অনাচার আমার জ্ঞাতসারে ঘটেছে যা প্রকাশ করলে রুচিহীনতার পরিচয় দেওয়া হবে, কারণ ঘুরিয়ে লিখলেও সংশ্লিষ্ট লোকদের চেনা যাবে।

আমার সময়ে যখন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন, তখন একমাত্র তিনিই, আমার ইতশ্চেতঃ যখনই তাঁর ভাল লেগেছে, আমাকে তাঁর ঘর থেকে দুচার ছত্র লিখে জানিয়েছেন। এটি তাঁর স্বতঃপ্রবৃত্ত কাজ এবং আমি এটি তাঁর মানসিক ঔদার্য বলে গ্রহণ করেছি। এমন প্রাণখোলা প্রশংসা বড়ই আনন্দ দেয়। এবং তা এই ভেবে যে, আমাদের দেশে কোনো লেখা ভাল লাগলে সহজে কেউ প্রশংসা করেন না, কিন্তু খারাপ লাগলে গাল দিতে সর্বদা উৎসুক।

প্রবীণদের মধ্যে রাজশেখর বসু এবং সাব-প্রবীণদের মধ্যে বনফুলের কাছ থেকে আমি ভাল লাগার যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছি। বনফুল মাঝে মাঝে দীর্ঘ চিঠি লেখার দায় এড়াবার জন্য কবিতায় লিখে জানাত। এ জিনিস তার সহজে আসে। এবং সাধারণ চিঠিও কবিতায় লেখে এবং এই ১৯৭৩ সনেও।

ব্যঙ্গ লেখক ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় আমাকে চিন্তাধারার দিক থেকে তাঁর সমগোত্রীয় বলে আমাকে যে প্রীতি জানিয়েছিলেন, তাতে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলাম। তিনি আমাকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন— 'ইদানীং তোমার লেখা পড়ে তোমাকে আমার সগোত্র বলে মনে হয়েছে। তোমার মতামতকে আমি অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করি।' (৯-১২-৫৭)

হেমেন্দ্রকুমার রায়ও আমাকে কবিতায় চিঠি লিখতেন। আর খুব উপভোগ্য চিঠি লিখতেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, যিনি দাদাঠাকুর নামে বেশি পরিচিত। এ সব কথা আমার 'দ্বিতীয় স্মৃতি' ও 'আমি যাঁদের দেখেছি' বইতে বিস্তারিত লেখা আছে।

আমার সম্পাদকীয় জীবনে আমি যেন প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে একটি সেতুর মতো অবস্থিত ছিলাম। একদিকে প্রবীণতম প্রমথ চৌধুরী, শশিশেখর

বসু, অন্যদিকে নবীনতম কার্তিক মজুমদার ও ল চংগী, মাঝখানে আমি: জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছি এবং নবীনদের মধ্যে ক্ষমতার সন্ধান পেলেই তাদের ডেকে এনেছি এবং লিখতে উৎসাহিত করেছি। কার্তিক মজুমদার নামক এক পূর্ব অপরিচিত যুবক যখন তার প্রথম গল্প পাঠায়, তখন তা এত ভাল লেগেছিল যে তাকে ডেকে এনে অনেক লিখিয়েছি। খুব সহজ একটা রসবোধ ছিল তার। কিন্তু এখন সে কোথায়? আর এক লেখককে আবিষ্কার করলাম, তার নাম ল চংগী। জাতিতে চীনা। বাংলা লেখা রচনা এলো একটি, রম্য রচনা। হাতের লেখা অতি পরিচ্ছন্ন। রচনাটি পড়ে অবাক লাগল। তাকে ডেকে এনে পরিচয় কবা গেল। শুনলাম সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে সংস্কৃত নিয়ে। তারপর ইনটারমীডিয়েট পাস করে তখন বঙ্গবাসী কলেজে স্পেশাল বেঙ্গলী নিয়ে বি-এ পড়ছে। এরপর তাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এবং যখন শোনা গেল ল চংগীরা তিনপুরুষ বাংলা দেশে আছে তখন তার প্রায়-বাঙালী-হয়ে-যাওয়ায় আর বিস্ময়ের কিছু ছিল না। সুপুরীর ব্যবসা বিষয়ে ল চংগীকে লিখতে বললাম, এবং লেখাটি কমার্শ্যাল এ'ডিটব রবি রায়চৌধুরীকে দিলাম। তিনি বলেছিলেন, এত ভাল লেখা কোনো বাঙালীর কাছ থেকে পাননি আগে। ল চংগীব পিতামহ সুপুরীর ব্যবসা উপলক্ষেই প্রথম এদেশে আসেন।

ল চংগীর পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গে আমি তার বাড়িতে গিয়ে আলাপ করেছি। তার বোন একদিন এসেছিল আমাদেব বাড়িতে, ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে লনড্রির ব্যবসা করছিল সে তখন। ল চংগী পরে লালবাজারে পুলিস সার্জেন্ট হয়েছিল, ১৯৫৭ সনে শেষ এসেছে সে আমাদের বাড়িতে। তাব সঙ্গে আমি চীনা অঞ্চলের প্রাচীন মন্দিরগুলি ও আধুনিক চীনা পরিবাবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। সে সব কাহিনী ফোটোগ্রাফ সহ প্রবাসীতে বেরিয়েছিল, পরে 'পথে পথে' বইতে। তার কাছ থেকে ১৯৫১ সনের ২৯শে মার্চ তারিখে লেখা যে প্রথম চিঠিখানা পাই তাব কিছু নমুনা দিচ্ছি—

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, আপনাদের প্রেরিত চেকখানা পেয়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি। কাবণ আপনাদেব কাছ থেকে পুরস্কৃত হব তা ছিল আমার কল্পনার বাইরে।...

আপনাকে আবো আগে চিঠি দেব বলে আশা করেছিলুম। কিন্তু আমার ঠিকানা বের

হবার পর থেকে আমার কাছে বোধহয় ৩০।৩৫ খানা চিঠি এসেছে। তার মধ্যে সবপেয়েছির আসর, ছাত্র, ইস্কুল শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক, ব্যায়ামাগার, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কিছুই বাদ যায়নি। একজন গল্পলেখক অথবা পুস্তক প্রকাশকও আছেন বলে মনে হয়। আমি এঁদের যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। তাই আপনাকে পত্র দিতে দেরী হয়ে গেল। আশা করি সেজন্য মনে কিছু করবেন না।...

ইতি, বিনীত—ল চংগী

প্রবন্ধের সঙ্গে ল চংগীর ঠিকানাও হয়তো ছেপে দিয়েছিলাম এ জন্য যে অনেকে হয় তো সন্দেহ করতে পারে ওটা আমাদেরই কারো ছদ্মনাম। ওকে দিয়ে আর কি লিখিয়েছিলাম এখন আর মনে পড়ে না।

আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। হরেন ঘটক ছিল পাততাড়ি বিভাগের সহকারী সম্পাদক। অকালপক্ক—অর্থাৎ কম বয়সে চুল প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছিল তার। ভাল লোক, সরল স্বভাব, দেহও দীর্ঘ এবং সরল। মানবেন্দ্র রায়ের মতবাদের ভক্ত, যদিও রাজনীতি সে করত না। কবিতা লেখার হাত ছিল, প্রতি সপ্তাহে শেয়াল পণ্ডিতের ছড়া লিখত যুগান্তরের পাততাড়িতে। তার সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক ছিল। একদিন এই হরেন ঘটক তাদের ঘরের ফেলে দেওয়া কাগজের ঝুড়ি থেকে আধছেঁড়া দুমড়ানো একখণ্ড কাগজ আমার কাছে এনে বলল, দেখুন তো এ কবিতাটা ভাল মনে হচ্ছে অথচ ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই লেখককে আপনি চেনেন?

আমি তো নাম দেখে অবাক। নাম শশিশেখর বসু—রাজশেখর বসুর বড়দা। তিনি তখনো আমার অপরিচিত। পাটনা থেকে মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিত বিহার হেরলডে প্রায় প্রতিসপ্তাহে তাঁর কৌতুক-রসাশ্রিত নানা রচনার আমি অনুরাগী পাঠক ছিলাম। তিনি ছদ্মনামে লিখতেন—নিজের নাম S. S. Boseকে উলটে লিখতেন ESOBSS। মণির কাছে তাঁর আসল নাম আগেই জানা ছিল।

হরেন ঘটককে বললাম সে কথা। কবি হরেনের সহজ কবিতা-বোধ আগেই বুঝতে পেরেছিল এটা ফেলে দেবার নয়, তাই সে আমাকে দেখাতে এনেছিল।

শশিশেখর যে দুচার লাইন বাংলা কবিতা লিখতে পারেন, এটি দেখেই আমিও বুঝতে পেরেছিলাম যে, তাঁকে দিয়ে বাংলা গদ্যে লেখাতে হবে।

ঠিকানা ঐ কবিতার সঙ্গেই ছিল। তারপর তাঁর কাছে গিয়ে পরিচয় করা গেল। আমার জন্য শেষে অনেক রচনা লিখেছেন—এবং বাংলায় তিনি আগে কখনো লেখেননি জানা গেল। আমাদের ম্যাগাজিন সেকশনে এবং পূজা সংখ্যায় তাঁকে দিয়ে অনেক লিখিয়েছি, এবং সে সব লেখা একত্র করে 'যা দেখেছি যা শুনেছি' (মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ)—এই নামে একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। ভারী চমৎকার সে পুস্তকখানা। রাজশেখর বসুর অনুরোধে আমি তার একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলাম। ১৯৫৫, ৯ই অগস্ট রাজশেখর বসু আমাকে যে চিঠি লেখেন তাতে অনুরোধ ছিল—"...আপনার উৎসাহেই দাদা বাংলা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে জন্য আমার ইচ্ছা—তাঁর বই-এর একটি ছোট ভূমিকা লিখে দেন।..."

শশিশেখরের মতো মানুষ আমি আর দেখিনি। আসলে তাঁর নাম হওয়া উচিত ছিল শিশুশেখর। তাঁর বিষয়ে আমার তিনখানি স্মৃতিগ্রন্থে সবিস্তার বর্ণনা আছে। পত্রস্মৃতিতে অনেক নতুন কথা আছে।

লেখক ও লেখিকা অনেকেই প্রথমে যুগান্তর ম্যাগাজিন সেকশনকে আশ্রয় করে পরে খ্যাতি লাভ করেছেন। যার মধ্যে সম্ভাবনা আছে, তাকে ডাকা হয়েছে এমনকি প্রথম লেখানো হয়েছে। মায়া বসুর ইতিহাস তাই। সেকথা পত্রস্মৃতিতে বলা হয়েছে সবটা। অঞ্জলি বসু (পরে অঞ্জলি ভদ্র) ডাকযোগে একটি গল্প পাঠায় প্রথমে। পড়ে খুব ভাল লেগেছিল। ব্যঙ্গ গল্প কোনো লেখিকার কাছ থেকে এই প্রথম। বৃক্ষরোপণ উৎসব—নাচ গান ইত্যাদি অনুষ্ঠান পুরো চলল। উৎসব কালে এক জোড়া চোখ কিছু দূরের অন্তরাল থেকে সবটা লক্ষ্য করছিল। উৎসব শেষে প্রাঙ্গণ খালি হওয়া মাত্র সেই দুটি লোলুপ চোখের মালিক এসে চারা গাছটি মুড়ে খেয়ে গেল। চোখের মালিক—একটি ছাগল। গল্পটি আজও ভুলিনি। জয়ন্তী সেনের কয়েকটি খুব ভাল গল্প আমি ছেপেছিলাম। আর এক দিন রেডিওতে (১৯৬২) এক নারী কণ্ঠে একটি কবিতা শুনি, ভাবের নূতনত্বে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কণ্ঠটি কবিতা সিংহের। আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত তখন। রেডিও থেকে ঠিকানা নিয়ে কবিতাটি সংগ্রহ করে ছেপেছিলাম। কবিতাটির নাম ছিল জনৈক কবির নিবেদন। লেখা ও বলার ভঙ্গিতে কবিতার বিষয়ানুগ এমন একটা মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ ছিল যার স্বাদ

নতুন মনে হয়েছিল। দিল্লীতে আকাশবাণীর জাতীয় কবি সম্মেলনে পঠিত এই সুদীর্ঘ কবিতাটি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে ছেপেছিলাম। আরম্ভটা ছিল এইরকম—

কোথাও মাটি নড়ছে!
গোলাবর্ষণে দীর্ণ পাথরের চাঁই সৈনিকটির কপালে লাগল,
আমার টেবিল নড়ে উঠল।
দেখুন, আমার টেবিল নড়ছে।
ছন্দ-মিল, কথা-সাজানো…আজ মাফ করবেন… সে অন্যদিন হবে…
অন্যদিন।
শান্তি আজ গুলিবিদ্ধ।
কেউ তাকে বলেছিল 'হু গোজ দেযার? হল্‌ট।'
চেনা মুখ দেখে, ফিরতেই…গুলিবিদ্ধ।

মুদ্রিত ৭২ লাইনের কবিতার আরম্ভটি মাত্র দেওয়া সম্ভব হল। যুদ্ধের পক্ষপাতহীন ধ্বংসলীলার পটভূমি-স্মরণে-বিচলিত কবিমনের কম্পিত অস্থির ভাষা, আগাগোড়া। ভারী সুন্দরভাবে প্রকাশিত খণ্ড খণ্ড কথার ভিতর দিয়ে উত্তেজিত হৃদয়ের ভাষা ও উচ্চারণ। কবিতা সিংহ বর্তমানে আকাশবাণীর 'শ্রবণী' সম্পাদিকা।

ধারাবাহিক শিকার বিষয়ে হাজারিবাগের বিজয়কান্ত সেনের লেখা ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচীর লেখা, ও মাঝে মাঝে রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ও অশোক মৈত্রের লেখা ছেপেছি। অশোক মৈত্রের লেখায় অনেক সময় ব্যঙ্গ কৌতুকের মিশ্রণ থাকত। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচীর প্রায় সবটাই কৌতুক মণ্ডিত শিকার কাহিনী।

কয়েকজন শিল্পী বিষয়ে আমি নিজে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অতুলচন্দ্র বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও সুভো ঠাকুরের শিল্প বিষয়ে। তা ছাড়া কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার ও গোপাল ঘোষ সম্পর্কে টুকরো ভাবে বহুবার লিখেছি। শানু মজুমদার সম্পর্কে লিখেছি। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত পারুল ঘোষ নামে এক মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। পারুল ঘোষ একবার অ্যাকাডেমি অভ ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনী নিয়ে বড় সমালোচনা লিখেছিলেন। শুনেছিলাম তিনি স্কুলের শিক্ষিকা।

প্রবীণদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী মাঝে মাঝে লিখতেন। খুব তীক্ষ্ণধী, স্মৃতিশক্তি যে বয়সে কমে যাবার কথা সেই বয়সে তা তাঁর মগজে ক্রমে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। এবং আজ এই ১৯৭৩ সনে যখন এই অধ্যায় লিখছি, সে সময়, তাঁর বয়স ৮০র দিকে যত এগিয়ে যাচ্ছে, তত তাঁর স্মৃতিশক্তি ধারালো হচ্ছে। স্মৃতিশক্তি যাঁদের প্রখর এমন লেখক বা লেখিকার কাছ থেকে স্মৃতিমূলক লেখা পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় (যদিও তাঁদের কাছ থেকে কিছু ধার নেওয়া বড়ই অসুবিধাজনক)।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৯৬৫ সনে মারা যান, তাঁর মৃত্যু সংবাদ কোনো কাগজে ছাপা হয়নি। স্টেটসম্যানে তিন লাইন ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল, এবং আমি তাঁর সম্পর্কে যুগান্তরে একটি ছোট রচনা লিখেছিলাম। তা পড়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর সম্পর্কিত ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা পাঠালেন একটি। ছাপতে সঙ্কোচ হল, কে এই বনবিহারী মুখুজ্জে যাঁর বিষয়ে এত লেখা ছাপা হচ্ছে? অতএব সে লেখাটি 'আমি যাঁদের দেখেছি' বইতে বনবিহারী সম্পর্কে যে বড একটি অধ্যায় লিখেছি তার অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। এবং এই বইতেই জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিষয়েও একটি অধ্যায় আছে। তাঁর যে লেখাটি আমার বইতে ছাপা আছে তার ভিতর থেকে দুএকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করছি—

..আজ (১৯৬৫) থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছব আগে বঙ্গবাণী, শনিবাবেব চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁব অনুবাগী পাঠক পাঠিকা কম ছিলেন না। যাঁবা মাসেব পব মাস বঙ্গবাণীতে দশচক্র পড়ার জন্য উৎসুক থাকতেন·· কোন এক সময 'নবকেব কীট' পডেছেন শনিবাবেব চিঠিতে। 'সিবাজিব পেয়ালা'ব কঠিন শাণিত ব্যঙ্গ পডে বিধবা-সধবা মেযেবা পাথব হযে গেছেন, ভাবনা আব বেশি এগোতে পাবেনি তাঁদেব ভীক মনে।···

আগেই বলেছি বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ বা কৌতুকরসাশ্রিত লেখার ঠিকমতো তাৎপর্য বা ইঙ্গিত বুঝতে পারে এমন পাঠক সংখ্যা এদেশে খুবই কম। সেই কথাটা বনবিহারীবাবু উপলক্ষে আর একবার স্মরণ করা গেল।

॥ ষোল ॥

কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাড়ি ছাড়বার পাঁচ মাস আগে, ২২শে জানুয়ারি : ৯৬১ তারিখে আমার দোতলার ঘরের উত্তর দিকের জানালা দিয়ে সহসা আকাশ পথে পঙ্গপালের এক অভিনব প্রবাহ দেখলাম। এ আমার চতুর্থ স্মরণীয় বিস্ময়। ১৯১০ সনে দেখেছি হ্যালির ধূমকেতু। তা প্রায় একমাস ধরে প্রতিদিনের দেখায় পুরানো হয়ে গিয়েছিল কিছু। তখন বয়স ছিল কম, কিন্তু তবু তার আকাশজোড়া আবির্ভাব, সেই অল্প বয়সের হলেও সেই প্রথম দেখার বিস্ময় আজও ভুলিনি। দ্বিতীয় বিস্ময়, প্রথম শিলিগুড়ি থেকে উষাকালে হিমালয় দর্শন। কিছু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম দেখে। ১৯১৩ সনে সেটা। হিমালয় দেখায় অভ্যস্ত সঙ্গীর সঙ্গে তর্ক করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, মেঘ। কারণ পর্বতচূড়ার তুষার আর মেঘ এক সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। এবং সে চূড়া এত ঊর্ধ্বে আকাশে উঠেছিল (শিলিগুড়ি থেকে ঐ রকমই মনে হয়েছিল) যে, তা আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। আমার প্রথম স্মৃতিকথায় এই দেখার সঙ্গে বিলিতি গল্পের একটি ছোট মেয়ের জিরাফ দেখার বিস্ময়ের তুলনা করেছি। ছোট্ট মেয়েটি পশুশালায় জিরাফ দেখে বেশ কিছুক্ষণ তার গলার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল,—নাঃ, এ অসম্ভব, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

আশৈশব সমতল ভূমির অভিজ্ঞতা, তাই হঠাৎ সামনে ভোরের অস্পষ্ট আলোয় দেখা দৃশ্যটি যে হিমালয়ের বরফ ঢাকা চূড়া এবং তা এত উঁচুতে এবং যেন প্রায় স্পর্শযোগ্য, এসব সেই মুহূর্তে মন মেনে নিতে চায়নি। আমিও তাই সঙ্গীকে বলেছিলাম, বিশ্বাস হয় না। সেই প্রথম দেখা বিরাটের স্মৃতি আজও মনের মধ্যে একই রকম বিস্ময় জাগায়। তার রোমাঞ্চ বর্ণনার ভাষা আমি আজও খুঁজে পাইনি।

এরপর ১৯২৯ সনে প্রথম সমুদ্র দেখার চমক। সে এক অসম্ভব উদার আবির্ভাব। ঘোড়া-গাড়িতে পুরী স্টেশন থেকে ভিকটোরিয়া ক্লাবের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ কোন্ এক মায়াজগতে এসে পড়লাম, আকাশের, জলের, এমন সীমাহীন বিস্তার—এমন উদার অভ্যর্থনা, স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

যখন সম্পাদক ছিলাম

কল্পনায় অনেক জিনিস সুন্দরতর হয়, বাস্তবের মুখোমুখি এলে কল্পনা ভেঙে যায়। কিন্তু এ ঠিক বিপরীত হল। বাস্তব কল্পনাকে যেন সে মুহূর্তে হাজার গুণ ছাড়িয়ে গেল। আমি ঠিক সেই হঠাৎ-দেখার আকস্মিক বিস্ময়ের কথাটি মাত্র বলছি। সেই মুহূর্তের বিস্ময় আর ফিরে পাইনি, সমুদ্রের ধারে বাস করেও।

তারপর ১৯৬১ সনে দেখলাম সকল আকাশ ব্যাপ্ত করা এক অদ্ভুত প্রাণপ্রবাহ। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। কয়েক সেকেণ্ড পরে বুঝলাম। লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ, একটানা আকাশছাওয়া এক অপরূপ ছবি এঁকে নীরব গতিতে পূব থেকে পশ্চিমের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অবিচ্ছিন্ন গতিধারা, অসীম তার বিস্তার। ছেদ নেই কোথাও। ঈষৎ গোলাপী আভার স্রোত। এ জিনিস কোনো দিন কল্পনা করিনি, এই লক্ষ লক্ষ 'জীবের' বলাকা—মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাদের সঙ্গী বানিয়ে। ঐ প্রবাহের সঙ্গে আমার সমস্ত কল্পনার গতি এক সুরে বাঁধা হয়ে গেল, এমনই এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ সেদিন অনুভব করেছিলাম বিছানায় শুয়ে শুয়ে—আকাশের দিকে স্তম্ভিতবৎ চেয়ে চেয়ে। পালের পঙ্গকে শেষে দুচারটে ক্লান্তভাবে মাটিতে পড়তে দেখেছি, ছাতে অনেক পড়েছিল, দেখতে সাধারণ একটি কীট, কিন্তু তবু সে আমার সেই বিরাট বিস্ময়ের উপকরণ। একক ভাবে কিছুই না, কিন্তু কোটি পঙ্গের সঙ্গে যখন সে চলন্ত ছায়াপথ রচনা করে সূর্যের আলো ঢেকে ফেলল, তখন তাব একক সত্তা কোথায় হারিয়ে গেল। অভিধানের শব্দের মতো। কবির হাতে একক শব্দগুলির ভাববন্ধন সম্পূর্ণ হলে তা যেমন মনকে মাতিয়ে তুলতে পারে, শূন্যপথে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে—যে-কোনো উপকরণের সঙ্গে সৃষ্টির সমগ্রতার সম্পর্কও তাই। কিন্তু মনে হচ্ছে আমাকে এখন সম্পাদকের চেয়ারে এসে অবিলম্বে বসা দরকার।

সম্পাদকরূপে আমার সম্পাদকীয়, অর্থাৎ ইতস্ততঃতে, বেশি কৌতুক থাকলে অনেকে পছন্দ করেন, সবাই নয় অবশ্য। কারণ আমি এমন চিঠি পেয়েছি যাতে শুধু কৌতুক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার প্রতিক্রিয়াজাত অভিযোগ। সারবান সাহিত্য না হলে অনেকে পছন্দ করেন না—একথা ভাবতেই রবীন্দ্রনাথের সারবান সাহিত্য মনে পড়ে :

যখন সম্পাদক ছিলাম

আজকাল বাংলা সাহিত্যে রাশি রাশি নাটক নভেলের আমদানি হইতেছে। কিন্তু তাহাতে সার পদার্থ কিছুমাত্র নাই। না আছে তত্ত্বজ্ঞান, না আছে উপদেশ। কী করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে ; গোজাতির রোগ নিবারণ কবিবার কী কী উপায় আছে ; দ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের মধ্যে কোন্ বাদ শ্রেষ্ঠ ..আমাদের অগণ্য কাব্য-নাটকের মধ্যে এ সকল সারগর্ভ বিশ্বহিতকর প্রসঙ্গের কোনো মীমাংসা পাওয়া যায় না।

এই সব কথা মনে পড়ে যায় যখন অসার সাহিত্য রচনা করি। তবে আমি দুরকমই রেখেছিলাম, অর্থাৎ রক্ষা করেছিলাম। কাজের কথাও ছিল, অকাজের কথাও ছিল, আমার সাপ্তাহিক লেখায়। কৌতুক করতে গেলে মাঝে মাঝে যে বিপদ ঘটে সে কথা আগে বলেছি।

যাই হোক, সাময়িক বিপদ কেটে গেলে পরে ইতশ্চেতঃর সমগ্র রূপকে অতিক্রম করে সমাজের একটা চেহারা—তা যতই আংশিক হোক, প্রকাশিত হবে এ আশা আমার দৃঢ় ছিল। এবং আমি আরো এমন অনেক দৃষ্টান্ত একটু পরেই দিচ্ছি যার উদ্দেশ্যও ঐ একই, অর্থাৎ সমাজের একটা অংশের চেহারা উদ্ঘাটন। বাইরে থেকে আসা নানা রকম চিঠি আমি সঞ্চয় করে রেখেছি, যার নমুনা দিচ্ছি—যা থেকে আমার কথা বোঝা যাবে। এর মধ্যে অনেক পাগলের চিঠিও আছে। আমি পূর্বের এক অধ্যায়ে বলেছি দেশে লেখক সংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের জানা নেই যে, অত্যন্ত অপরিপক্ব হাতের রচনাদি প্রতিদিন এত পাওয়া যায় যে তা দেখে হাসি পায়, কিন্তু করুণা হয় সব চেয়ে বেশি। লেখক হবার শখ যে-কোনো ছেলে বা বয়স্ক লোকের মধ্যে ভয়ানক রকম বেড়ে যাচ্ছে।

লেখার ইচ্ছা এবং কাগজে তা চাপা হোক, এমন ইচ্ছা পাগলদের মধ্যেও দেখা দেওয়াতে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেচে। নাম ছাপার অক্ষরে দেখার দুর্বলতা থেকেই মনে হয় পাগল অবস্থাতেও লেখা পাঠানো হয়ে থাকে। সুস্থ মনে যে আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল কিন্তু প্রকাশের সাহস ছিল না, পাগল অবস্থায় তার প্রকাশ ঘটে। কারণ পাগল অবস্থায় বিচারবুদ্ধি চাপা পড়ে যায়। এবং যা পাঠায় তা যে আদৌ কোনো রচনা তা নয়, যে-কোনো কথা লিখে পাঠায় এবং ছাপতে বলে। অনেকে শুধু লেখা বা চিঠি পাঠায় ছাপার কথা থাকে না। আমি লেখক বা লেখিকার নাম বা ঠিকানা উল্লেখ না করে তাদের পাঠানো চিঠিগুলির নমুনা দিচ্ছি।—প্রথম চিঠি একজন

যখন সম্পাদক ছিলাম

স্ত্রীলোকের লেখা, এবং ভূষণচন্দ্র দাস ও আমাকে উদ্দেশ করে। (১৯৬০ সনে লেখা)

১। শ্রীগোস্বামী, আপনি আপনাব সহকারীকে লইয়া বাহির হইয়া আসুন। আপনাদের জন্য আমার কাজের ক্ষতি হইতেছে। আশা করি আজকেই বাহির হইয়া যাইবেন। আমার প্রচুব ক্ষতি হয়ে গেল আপনাদের দুজনের জন্য। আশা করি আপনারা ভদ্র এবং ভদ্রজনোচিত ব্যবহার দেখাইবেন। আপনাদের বিদায় সম্ভাষণ এখন থেকে জানালাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পঞ্চ কল্যাণ পবিকল্পনায় আজ পর্যন্ত কোন কাজ অগ্রসব হয় নাই। যেমন বাজেট পবিকল্পনা, বাড়ি ভাড়া, ট্রাম ও বাস অতিবিক্ত পিছিয়ে আছে। তাহা হইলে কোন কাজেব জন্য আমবা নিযুক্ত হইযাছি এবং এত পিছিয়ে থাকাব জন্য দায়ী হবে কে। অবিলম্বে আপনাবা উক্ত কর্মীদ্বয় বিদায় হইযা আমাকে অগ্রসর হইতে দিন। আমি অল্প দিনে এগুলিব সুবন্দোবস্ত কবিব।

২। শ্রীনেহেরুব সঙ্কল্প। বৌদিকে এক দিন বলিযাছিলাম "কত বঙ্গ দেখালি"-
N.B. দৈনিকে ছাপিবাব জন্য (১২-৫-৫৮)

৩। প্রেম কবিলা স্বর্ণসুন্দবী
তোমাব প্রেমে পাগল হইল
মহেশ্বব চৌধুবী।
বাড়ি ছিল পাড়াব মাঝাবে
নতুন বাড়ী কবল এখন
পুষ্কবিণীব পাবে।
ঐ যে স্বর্ণ ছিল দীঘিব পাবে
সেইখানে মন মজল না,
বঙ্গবসে দিনও যাবে না। (১৯৫৬)

(ঠিকানা 'যোগান্তর' পত্রিকা, কলিকাতা ২৪ পবগণা।)

৪। ঐ একই লোকের পরবর্তী লেখা—
ছেড়ে দে মা বেশমী চুড়ি, ছেড়ে দে মা রেশমী চুড়ি
বঙ্গ নারী কভু হাতে আর লইব না।
ছেড়ে দে মা রেশমী চুড়ি। (১৯৫৬)

৫। আমাদেব বংশেব প্রত্যেকেই নামেব পূর্বে বাবু লিখে। যেমন বাবু '—' বাব-অ্যাট-ল। উপরোক্ত তিন ব্যক্তিব স্ত্রী কাযস্থ সমাজেব মেযে। পণ্ডিত জহববাল নেহরু নামের পূর্বে ব্যবহার করে পণ্ডিত। আমাব সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর কোন তুলনা হইতে পারে না। সুতবাং পুলিসের **suspension order illegal** কি না ? ৮ বৎসর যাবৎ কি কারণে বিনা কারণে বসাইযা রাখিবে তাহার কারণ থাকা চাই। আমার সঙ্গে '—'দের

তুলনা হয় না, তাহারা কায়স্থ বিবাহ করিলেও তাহারা হিন্দু আমি খ্রীষ্টান। পুলিস আমার উপর কি ক্ষমতা রাখে। বর্তমানে কোর্ট আমার obligationএ আছে সুতরাং পুলিস আমার ক্ষমতার উপর হাত দিতে পারে না। (১৯৫৬)

নিচের চিঠিখানা সরোজ আচার্যকে সম্বোধন করে লেখা। আমি এ জাতীয় চিঠি সংগ্রহ করি তাই সে চিঠিখানা আমাকে দিয়েছিল ১৯৬৪ সনে। পুরো চার পৃষ্ঠা ফুলস্ক্যাপ শীটের কোথাও ফাঁক নেই—মস্তবড় চিঠি। আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে চিঠিখানা এখানে উদ্ধৃত করছি। মনস্তাত্বিকদের অনুশীলন-যোগ্য অবশ্যই।

My dear Saroj Acharya and staff—

আমি আপনাকে দুঃখের সঙ্গে সত্য কথা স্পষ্টভাবে জানাইতে চাই যে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা মা কালী আমাকে ১৯৫২-৬৪ সাল পর্যন্ত ১৩ বৎসর গৃহে বন্দী করিয়া মারিতেছে—(১) অসংখ্য কাকের চিৎকার (২) কুকুরের ডাক ও টেপীর নাম দিয়া। পূর্ব দিকে ৪টি মহিলা এই কাজে লিপ্ত।...দু জোড়া মা ও মেয়ে। '—'র মা ১৮ ঘন্টা বিকট চিৎকার করে। ৪টি মহিলার ১২ বৎসর ২টি মহিলার ৯ বৎসর নষ্ট হইয়াছে। ৬টি মহিলার কপালের লেখা কেহ মুছাইতে পারিবে না। পশ্চিম দিকে '—' সরকারের স্ত্রী ও মেয়ে এই কাজে ১২ বৎসর লিপ্ত।...হোষ্টেলের ছেলেদের মুখ বন্ধ করিয়াছি। '—' হোষ্টেলের ছেলেদের সঙ্গে ১২ বৎসর যুদ্ধ করিতেছি। আমাকে বলার অধিকার কাহারও নাই। সমস্ত কথা ভগবানকে বলা উচিত...কারণ ভগবান ২৪ ঘন্টা টেপীর নাম করিতেছে।...যখন আমার চাকুরি করিবার আশা নাই তখন জেলে থাকা নিরাপদ মনে করি।...মানুষ একটা দম দেওয়া মটর গাড়ি মা কালী ড্রাইভার। প্রত্যেকটি কাজ মা কালীর দ্বারা পরিচালিত মানুষ স্রোতের ফুল। কলিযুগের শেষে পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে তাহা প্রত্যেকের পড়া উচিত...কারণ সৃষ্টিকর্তা বিধাতা মা কালী এখানে ডাইরেকটলি জড়িত। '—'র মামার কর্তব্য '—' মামীর ১৮ ঘন্টা চীৎকার ১২ বৎসর বন্ধ করা। '—'র বাবার কর্তব্য চাকুরি ৯ বৎসর বন্ধ করিয়া স্ত্রীর ১৮ বৎসর চীৎকার বন্ধ করা। '—' হোষ্টেলের সুপারিনটেনডেন্টের কর্তব্য চাকুরি ত্যাগ করিয়া ১৩ বৎসর চীৎকার বন্ধ করা। যখন অসংখ্য কাক ও কুকুর ডাকিতেছিল তখন হোষ্টেলের ছেলেরা বারান্দায় দাঁড়াইয়া ও পাড়ার মহিলারা আমাকে বিনা দোষে অসংখ্য কথা কেন বলিয়াছিল, তাহার উত্তর আপনাকে দিয়াছিল ও আমার বাড়িতে অনেক ইঁটপাটকেল ফেলিয়াছিল। কাক ও কুকুর ডাকিলে what can I do?...আমার মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান লোককে ঘরে বন্দী করিয়া রাখা ভগবানের উচিত কাজ হয় নাই। '—' সরকার, '—'র মামা, '—'র বাবা এবং হোষ্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট যখন তাহাদের কর্তব্য করে নাই তখন '—'র বাবাকে হত্যা করিয়া জেলে যাইব। গভর্নমেন্টকে জানান আমার কর্তব্য। খুনের মামলা চলুক। খবরের

কাগজে ছাপা হউক। সত্য চিরজয়ী। আমি বাড়িতে বাস করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমার জন্য শত্রুরূপী সর্বনাশা পাকিস্তানের সৃষ্টি।

আমি **miscellaneous, atmosphere, behind, between, syntax, clerical, criticism, orthodox, sabotage, proportion, cyclone, antibiotic, platinum, thrombosis, triangle, nationalisation, leisure**···এই রকম ১০,০০০ ইংরেজি শব্দ বলিতে পারি। আমার মত বুদ্ধিমান লোক যখন ১৩ বৎসর চাকুরি করিতে পারে নাই তখন আমি গভর্নমেন্টকে ১৩ বৎসরের সমস্ত ঘটনা জানাইতে চাই।...আমার জন্য ২০০ কোটি লোক মরিবে। ..সারা ভারতে আমার জন্য ২০ বৎসর ভেজাল চলিতেছে।···সৃষ্টিকর্তা বিধাতাকে প্রতিদিন ২০০০ ঘা লাথি মারিয়া প্রতিরোধ করিতেছি। ভগবান ১৩ বৎসর কাকের চীৎকার কুকুরের ডাক চালাইতেছে। ভগবান ১২ বৎসর টেপীর নাম করিতেছে। ১৯৫২।৫৩ সালে যখন অসংখ্য কাক ও কুকুর ডাকিতেছিল তখন আমার বাড়ীতে অনেক ইটপাটকেল ফেলিয়াছিল। মানুষ স্রোতের ফুল।·· ইতি

এ চিঠিতে পুরো নাম ও ঠিকানা দেওয়া আছে। বিকৃত মস্তিষ্ক হলেও অনেকগুলি বিষয় পাগলদের ভুল হয় না।

এদের লেখা-ছাপানোর আকাঙ্ক্ষা কিভাবে দমন করা যায় তা ভেবে পাওয়া যায় না। একজাতীয় চিঠি পাওয়া যায় যার লেখকদের প্রশ্ন—'লেখা ছাপলে তার জন্য আপনারা কত মজুরি চার্জ করেন?' এ রকম অসংখ্য চিঠি। একজনের চিঠির মাথায় সরস্বতীকে স্মরণ করা হয়েছে এই ভাবে—"শ্রীশ্রীস্বরস্বত্বয় নমঃ।"—নিজ শিক্ষার সীমা পত্রলেখক নিজেই এভাবে জানিয়ে দিয়েছে। এদের কথা পরে বলব।

এলোমেলো মগজের লেখা আর একখানি ছিল এই রকম—

মহাশয়, মিথ্যা যুগ চলিয়া গিয়াছে—আপনারা সকল প্রকার পত্রিকা বন্ধ করুন—অর্ডার শ্রীশ্রীরাধা দাসী

চিঠির ঠিকানা হিন্দিতে লেখা, এবং চিঠির নিচে লেখা আছে বৃন্দাবন ১।১।১০০—ডাকঘরের ছাপে, মথুরা। এবং এসেছে যুগান্তর ম্যানেজারের নামে। প্রেস বিভাগ থেকে অমল দেব চিঠিখানা আমার বিভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এর পরে একটি বড় লেখার প্রথম প্যারাগ্রাফটি মাত্র উদ্ধৃত করছি। লেখক স্কুলের শিক্ষক, তা তাঁর লেখায় বলা আছে। তিনি এইভাবে তাঁর পত্র-সাহিত্য আরম্ভ করছেন—(বানান যথাযথ)

মহাশয় আগামী বৃহস্পতী বাবেব পেপাব আমি ভাগাক্রমে লইতে পাবি নাই, তবে অন্য লোকেব পত্রিকা পড়িযা লইযাছি। আমি আপনাব হাতে পায়ে ধরিযা বলিতেছি আমার এই বাণীগুলি অতী যত্ন সহকারে ছাপাইয়া দিবেন—অন্যথা কবিলে যথাসময়ে নারায়ণের দণ্ডবিধি অনুযায়ী আপনাকে দণ্ডীত করিয়া দিব স্মবণ থাকে যেন।

যুগেব+অন্তর—যুগান্তব কলী সমাপ্ত—দ্বাপব আরম্ভ ব্রজলীলা চলিবে ইতি।

অদ্ভুত সব চিঠি ম্যাগাজিন সেকশনের উদ্দেশেই যে আসত তা নয়। অন্য বিভাগে এলেও তা আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হত। লেখক-সীমানা এক দিকে আসাম, অন্য দিকে রাজস্থান মথুরা-বৃন্দাবন প্রভৃতি দূর প্রদেশ। বিবাহ বিষয়ে আমি দুখানা ইংরেজি চিঠির নমুনা দিচ্ছি। পত্রলেখকেব ধারণা, যুগান্তরে যখন বিয়ের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তখন যুগান্তর নিশ্চয় একটি ঘটকালি বিভাগ পোষণ করে থাকে। চিঠিখানা পড়লেই বোঝা যাবে সে কথা। (ভাষা ও বানান যথাযথ) তাবিখ ১৬-৯-৬০

১। Dr. Rajendra Prasad—Jindabad

The Manager, Jugantar Marriage Section

Sir, Please send a photo of Kayastha girl who will give Rs. 51000 and another photo of Rs. 2000, Rs. 4000. Please reply very soon.

২। Dr. Rajendra Prasad—Jindabad

Manager, Jugantar Patrika

Honourable Sir, Please arrange an marriage between me self and a Kayastha girl.

এ চিঠিতে অবশ্য পণের উল্লেখ নেই। তারিখ ১২-১১-৬০। দুখানি একই বাঙালী ছেলের লেখা—মধ্যপ্রদেশ থেকে পাঠানো।

বিবাহের বিজ্ঞাপনের উত্তর কেমন আসে সে বিষয়ে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। এ দেশের একটা স্তরের মধ্যে লেখক হবার আকাঙ্ক্ষার যেমন একটা অস্বাভাবিক লোলুপতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বিবাহের ব্যাপারেও। সে এক অদ্ভুত লোলুপতা। কয়েকখানি এমন চিঠি আমাকে এক লেখিকা অনেক দিন আগে—১৯৬২ সনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। নমুনা—

১। আমি এক পত্রিকায় দেখিলাম আপনাব একটি কন্যা বিবাহের উপযুক্ত আছে। দাবি কিছুই নাই, চাকুরি বিনিময়ে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

২। প্রথমেই আমাব শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। পর সমাচার এই যে আপনি নিউজ পেপারে নিউজ দিয়াছেন যে পাত্রর আবশ্যক। তা আমি ২৭শে তারিখেব খবর কাগজ দ্বারা জানিতে পারিলাম এই খবব। সুতরাং আমি এতে বাজি। কিন্তু আমার বাসস্থান আমার কাকার বাড়িতে যোগ্যতা হায়ার সেকেণ্ডারি পাস। তবে এখন পর্যন্ত সার্ভিস করি নাই।...আমার একটি কথা যে, যদি মত করেন তা হলে আপনার কন্যাকে জবাব লিখিতে বলিবেন।...আব really ঠিক যদি মত কবেন তবে ফটো আমাকে দিবেন। আর আমিও যদি চান ফটো পাঠাইব। আচ্ছা ঘোষবাবু এখন তবে ৮০। ইতি ..

৩। মহাশয় আপনার ৯ তারিখেব যুগান্তবে বিজ্ঞাপন দেখে লিখিতেছি যে, আমি মেট্রিক পাশ, আমাকে দয়া কবিযা যদি একটা চাকরি দেন তবে আমি আপনার অনুগত হইতে পাবি। বডলোকেব দয়া হইলে সবই হয়। দযাই মানুষের মহৎ কাজ। এই জগতে একজন অন্য একজনের সাহায্য ছাড়া দাঁড়াইতে পাবে না। কাজেই সেই দয়াপববশ হইযা রেল কোম্পানীতে কাজ দিলে আমি আপনাব আশা পূর্ণ কবিতে পাবি...। আমি শুধু চাই চাকরি, অন্য কোন দাবিদাওযা আমাব নাই।...আমি অসমর্থ। ইতি

এ জাতীয় সব আবেদনকে হয় তো ঠিক লোপুপতা বলা চলে না অভাবগ্রস্ত ছেলেদের নিরুপায আবেদন। কেউ এমন প্লট নিয়ে গল্প লিখতে পারেন। যথা, চিঠি মেয়ের হাতে পডেছে। তার দয়া হয়েছে এবং সকল বাধা তুচ্ছ করে গরিব ছেলেকেই বিয়ে করেছে। বাস্তব জীবনে অথবা গল্পে হয় তো ইতিমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটে থাকবে।

লেখক-যশঃপ্রার্থীর চিঠির ভাষা থেকে তাদেব পবিচয় সহজে পাওয়া যায়। এদের সংখ্যা যে কত তার হিসাব করা হয় নি। সব কাগজের অফিসেই নিশ্চয় একই ধরনের চিঠি পৌছায়। আমি সামান্য দুচারটি নমুনা দিচ্ছি আমার সংগৃহীত চিঠির তাড়া থেকে। একজন লিখছেন—

১। সবিনয় নিবেদন, আপনার নিকট পত্র দেবাব মূলে আমাব যে আবেদনটুকু বযেছে তা হল এই যে আমা কর্তৃক লিখিত প্রগতিশীল articalকে যুগান্তবেব পাতায় স্থান দান কবা। (বানান যথাযথ)—১৯৫১।

২। Dear Sir, With due respect I beg to inform that I have a short story...I hope that you have been get another story...(ভাষা যথাযথ)

৩। আমি গত ইং ২৬-১১-৫৯ তাবিখে আপনাব নামে আমাব প্রাণেব নূতন উদ্দিপনাব সামান্য কযেক টুকবো লেখা পাঠিযেছিলাম—(বানান যথাযথ)

৪। I have the honour to inform you that I sand one

story. I shall be highly oblige if it is successful. Then I will sand another story. Hope you will be grand me the same. (ভাষা, বানান, যথাযথ)

৫। আমি আপনাদেব কাছে এই অনুগ্রহ করিতেছি যে আমার এই ক্ষুদ্র ছন্দখানা চালিয়ে দেবার জন্য। এই আমার অনুরুধ। (বানান যথাযথ)—১৯৫৬।

৬। With due respect I beg to bring to your kind notice that I am a great writer author and critic with important outlook in Bengal…(১৯৬২)

বড় চিঠি, সঙ্গে এক কলেজের প্রিনসিপ্যালের সার্টিফিকেট, তাতে তার সচ্চরিত্রের কথাও আছে। যেমন সাধারণত থাকে—He bears a good moral character—। আর একজন রচনা পাঠাতে চায়, সেই উদ্দেশ্যে এই রকম আবেদন পাঠিয়েছে—

৭। Most respectfully I beg to state that I came to know that you had been going to recruit some hands to place the essays in your newspaper before I wrote the letter. So I beg to offer myself as a candidate for sending essays in your office…I have been got energy for writing persuaded by… (১৯৫৮)

অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেলে লেখকেরা সাধারণত খুশি হন। অনেকে সেজন্য স্ট্যাম্প পাঠান। কিন্তু এমন লেখকের পরিচয় কেউ কি পেয়েছেন যিনি লেখা ফেরৎ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ? সংসারে সব রকম মানুষই আছে। এই রকম এক লেখকের চিঠির অংশ তুলে দিচ্ছি—

৮। কিছুদিন পূর্বে আমি একটি লেখা পাঠাইয়াছিলাম, তাহা দিনকয়েক আগে ফিরে এসেছে।…লেখাটি যদি টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতেন তাহা হইলে সেইখানেই ভদ্রতার পরিচয় পাওয়া যাইত। এ যেন যেচে জুতো মারা গোছের করেছেন। ফেরৎ পাঠিয়ে যে কি ভদ্রতার পরিচয় মুষ্টিমেয় কয়েকটি গতানুগতিক ছাপার অক্ষরে দিয়েছেন বুঝলাম না। …আমার গল্পের ভিতর দিয়ে নীতি শিক্ষাই ছিল—প্রেমে ভর্তি ছিল না, সেই জন্যই বোধ হয় ফেরৎ এসেছে।…(১৯৫৬)

সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতার একটি অপ্রকাশিত দিক, এবং সাধারণের অজানা দিকটিতে কিছু আলোক পাত করা গেল। আরো কত রকম যে

বাদ দিতে হল, তার সংখ্যা নেই। আমার সংগ্রহে সে সব রক্ষিত রইল। বাঙলার সমাজের এদিকের চেহারা বাইরে থেকে জানবার উপায় খুবই কম। লক্ষণীয় এই যে, লেখক হওয়ার জন্য আবেদনপত্র, আর জামাই হওয়ার জন্য আবেদনপত্র, একই রকম করুণ।

আজ যখন লিখতে আরম্ভ করেছি বেলা ১০টায়—আজ অর্থাৎ ১৪ই জুলাই ১৯৭৩, আজ প্রায় সাড়ে দশটায় একটি ফোন এলো, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী মারা গেছেন। লেখা বন্ধ হল। অবিশ্বাস্য মনে হল প্রথম। টেলিফোন যিনি করেছেন তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি অপেক্ষা করলাম, এবং অফিস টাইমে 'ইওর হেলথ' নামক ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মাসিক অফিসে ফোন করে জানলাম মৃত্যু সংবাদ সত্য। ইওর হেলথ-এর সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে সুধাংশু অবসর গ্রহণ করেছিল কিছু দিন হল।

১৯৩২ থেকে তার সঙ্গে আমার গভীর প্রীতির সম্পর্ক। তার বহু বিষয়ে নির্ভুল স্মৃতিশক্তি এবং পাণ্ডিত্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে তার সমান অধিকার ছিল। আমি আমার 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' তার নামে উৎসর্গ করেছিলাম। সে আমার চারটি ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিল সে সব কথা পূর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে বলা আছে।

বর্তমান বইখানার প্রুফ দেখার ভার তার উপর দিয়েছিলাম এবং প্রথম ১১টি ফর্মার প্রুফ সে দেখেছে। তার সঙ্গে শেষ দেখা গত ২৭শে জুন, মৃত্যুর ১৭ দিন আগে। সে এসেছিল আমার কাছে, মাঝে মাঝে আসত। শুনলাম সকালে বাজার করে ফিরে এসে বুকে ব্যথা অনুভব করছিল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। পর পর তিন জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ এই বই রচনা করতে করতে লিখলাম—তারা কিরণকুমার রায়, কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার এবং সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। আমাদের দলের অধিকাংশই গত হল। মৃতের তালিকা বাড়ছে, জীবিতের তালিকা সঙ্কীর্ণতর হচ্ছে।

সুধাংশু ইউরোপীয় প্রায় সকল ভাষার নিখুঁত উচ্চারণ জানত। ইংরেজি ও বাংলা দুইই অতি চমৎকার লিখত। বঙ্গশ্রী মাসিকের ও ইংরেজী বঙ্গশ্রী সাপ্তাহিকের সম্পাদনায় কিরণ ও সুধাংশু কয়েকবছর নিযুক্ত ছিল।

সুশীল গুপ্তর প্রকাশনীতে প্রাচীন ইংরেজি বইয়ের নতুন সংস্করণ সমূহ অনেক দিন সে সম্পাদনা করেছে। ক্যালকাটা এনজিনিয়ারিং কলেজের প্রিনসিপ্যাল ছিল কিছুদিন ও অন্যত্র অধ্যাপনার কাজ করেছে। আমার কয়েকটি বাংলা গল্প সে ইওর হেলথ মাসিকে অনুবাদ করে ছাপিয়েছিল—স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যঙ্গ গল্প। ১৯৪২ সনে ঘোর যুদ্ধের সময় ওয়াটারলু স্ট্রীটে একটি প্রকাশনীর উদ্বোধন করা হয়, করেন ডক্টর কালিদাস নাগ। আমাদের অনেকের বই সেখানে ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে সুধাংশুর বই, নাম নব্য বিজ্ঞান কথা, খুব সুন্দর হয়েছিল। আধুনিক পরমাণু তত্ত্ব রাদারফোর্ড পর্যন্ত যেখানে এসে শেষ হয়েছিল, সেই পর্যন্ত বিবরণ। কিন্তু শুধু বিবরণ বললে বইয়ের পরিচয় দেওয়া হয় না। এবং বইয়ের নামেও তার সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। তার ভাষা থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি, তা থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

গল্প শুরু হল: তোমরা অর্থাৎ যারা হিন্দুশাস্ত্রের খবর রাখ, নিশ্চয়ই জান যে পুরাকালে বিশ্বামিত্র একবার বিশ্ব সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে, সে কাজ তাঁর শেষ হয়নি। বিশ্ব সৃষ্টির কাজে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও (মানে যদি তিনি থাকেন) বোধ হয় আজও শেষ করে উঠতে পারেননি, হয় তো কোনো দিনই এর শেষ হবে না। আমার গল্পের বিষয় হচ্ছে কলির বিশ্বামিত্রের। তোমাদের বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করেন রাগে, আমার রূপকথার নায়ক অনুরাগে, তবে অনুরাগটা অবশ্য ব্যক্তিক নয় নিছক বৈজ্ঞানিক।

এ বইয়ের নায়ক রাদারফোর্ড। বইতে তিনটি অধ্যায় (১) একটি অসম্ভব রূপকথা (২) একটি আজগবি নাটক (৩) বুদ্বুদ বিদারণ কাহিনী। ভারী সুন্দর ভাষায় লেখা। এমন আর দেখিনি।

১৯৬০ সনে সুধাংশু দিল্লীর পাবলিকেশনস ডিভিশনের তরফ থেকে সি. ভি. রামনের Aspects of Scienceএর একটি উৎকৃষ্ট অনুবাদ করে দিয়েছিল, ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত বই এখানি। নাম হয়েছিল বিজ্ঞান বিচিত্রা।

সুধাংশুকে একটি প্রবল নেশা (যা ১৯৪০ সন নাগাদ) আমি ধরিয়েছিলাম—সেটি স্টেটসম্যান কাগজের ক্রসওয়ার্ড নিয়ে বসা। সুধাংশু অল্পদিনেই আমাকে ছাড়িয়ে গেল। আমি অবশ্য অনেক দিন আগেই এটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। দশ বারো বছরে একবারমাত্র স্টেটসম্যানের

ক্রসওয়ার্ডের সমস্ত ঘর পূরণ করেছি, সেও রবিবারেরটা, যার জন্য একসপ্তাহ সময় পাওয়া যায়। গত পাঁচ ছ'মাস আগেও সুধাংশু সমস্তগুলি ঘর পূরণ করে উল্লাসে আমাকে পোস্টকার্ডে সমাধানগুলি লিখে পাঠিয়েছে। এ কাজে ওর নৈপুণ্য আয়ত্ত হয়েছিল অল্পদিনেই। খাঁটি লোক ছিল, বন্ধুবৎসল ছিল, এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনলস ছিল। ভীষণ ডিটেকটিভ উপন্যাসের ভক্ত ছিল। আমার সকল বই একে একে শেষ করে নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে পড়ত।

যুগান্তর শারদীয় সংখ্যায় তাকে দিয়ে প্রতিবছর লিখিয়েছি। সে ম্যাগাজিন সেকশনের সবারই অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তার অকালমৃত্যুতে হঠাৎ অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করছি। আলাপ করে আন্তরিক তৃপ্তি লাভ করেছি যাদের সঙ্গে, সে তাদের মধ্যে বেশি কাছাকাছি ছিল। অতুলানন্দ চক্রবর্তী, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, এরা দূরের মানুষ এখন। ট্রামে ব'সে সবারই এখন চলা অসম্ভব। ট্যাকসি ভাড়া (দুই এক ঘণ্টা আলাপের জন্য পনেরো-কুড়ি টাকা খরচ) সাধ্যাতীত। একমাত্র যোগসূত্র, প্রায়-সর্বদা-ক্রস-কানেকশন-বিঘ্নিত টেলিফোন। কিন্তু কলকাতা ভ্রমণের কথা থাক। অন্য ভ্রমণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিই।

সম্পাদনাকালের মধ্যে মোট ১৩টি ভ্রমণ শেষ করেছি—ব্যক্তিগত ভ্রমণ বাদে। ভ্রমণ-দৈর্ঘ্য চার মাইল থেকে হাজার মাইল পর্যন্ত। সেগুলির পরিচয় দিচ্ছি। সমুদ্রযাত্রা করিনি, আকাশযাত্রা করিনি, ধর্মের দুটি নিষিদ্ধ জিনিসই (প্রথমটি বিশেষ করে) অমান্য করিনি।

১৯৩৩

১। বিক্রমখোল, উড়িষ্যা: সঙ্গী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণকুমার রায় ও প্রমোদ দাশগুপ্ত। উদ্দেশ্য প্রাচীন একটি শিলালিপি দর্শন।

২। লিলুয়া: সঙ্গী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, সজনীকান্ত দাস, কিরণকুমার রায়, কৃষ্ণধন দে, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। উদ্দেশ্য: রেলওয়ে ইনস্টিটুটের সম্মিলনে যোগ দেওয়া ও দর্শক ও শ্রোতাদের তৃপ্তি দেওয়া—রচনা পাঠে, গানে ও চেহারা দেখিয়ে। উদ্যোক্তা—ভূপেন্দ্র নন্দী।

যখন সম্পাদক ছিলাম

১৯৩৪

ডানকুনী: সঙ্গী—সজনীকান্ত দাস, নলিনীকান্ত সরকার, কিরণকুমার রায় এবং আর কে কে ছিলেন, মনে নেই। উদ্দেশ্য শ. চিঠির দল ও তথাকথিত বিরোধী দল একত্র মিলে বক্তৃতাদি দেওয়া। স্থান—ভূপেন্দ্র নন্দীর বাড়ি। কিন্তু সেখানে গিয়ে সজনীকান্তের খেয়াল হল দুদল একসঙ্গে মেশা হবে না। অন্যদলে অচিন্ত্যকুমার ইত্যাদি ছিলেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য বললেন একে একে। আমরা দূর থেকে জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে তা দেখলাম। এটা একটা খেয়ালি ব্যাপার।

১৯৩৬

ব্যারাকপুর: সঙ্গী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু ও সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থান—মোহিতলাল মজুমদারের বাড়ি। উদ্দেশ্য: তাঁর সদ্য প্রকাশিত স্মরগরল কাব্যগ্রন্থখানি তাঁকে পৌঁছে দেওয়া। ছেপেছিলেন সজনীকান্ত।

১৯৩৭

১। পাটনা: সঙ্গী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী। স্থান—পাটনা কলেজ। উপলক্ষ: প্রভাতী সঙ্ঘের আয়োজনে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সভা। মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার প্রধান উদ্যোক্তা। সভাপতি—নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

২। চন্দননগর: সঙ্গী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নলিনীকান্ত সরকার। উপলক্ষ: বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী। এটি আমার পক্ষে ছিল একটি তীর্থযাত্রা। এবং সেদিন যেসব মনীষী এ সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই নিজ নিজ দিকের পাল ছিলেন। আমার 'আমি যাঁদের দেখেছি'তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নৌকায় কিভাবে গিয়ে জুটেছিলাম, তার বিবরণ আছে। কিন্তু সম্মিলনটি উল্লেখযোগ্য কেন তা বলা হয়নি। কয়েকজন মনীষীর নাম করছি তাঁদের নাম, ঐ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তার বাইরে আর কোথাও জানবার উপায় নেই, অথচ, বর্তমান পাঠকদের তা জানা দরকার মনে করি। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হরিহর শেঠ

ও চন্দননগরের যাবতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি। উদ্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চন্দননগরের স্মৃতিমূলক একটি ভাষণে।

হরিহর শেঠ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাহিত্য শাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরী, ইতিহাস শাখার সভাপতি সার যদুনাথ সরকার, দর্শন শাখায় ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, কথাসাহিত্য শাখায় অনুরূপা দেবী, কাব্যশাখায় মানকুমারী বসু, সাংবাদিক সাহিত্য শাখায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞান শাখায় ডঃ প্রফুল্লকুমার মিত্র, চিকিৎসা শাখায় ডঃ সুন্দরীমোহন দাস। আরো বাকি রইল, সে অনেক বিভাগ ও আয়োজন। সেই ইতিহাসের একটি অংশমাত্র এখানে চিহ্নিত করে রাখা গেল।

১৯৩৯

১। পাবনা : সঙ্গী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাবনা অন্নদা-গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরিব বার্ষিক উৎসব (৩০-৭-৩৯) উপলক্ষ : তৎকালীন পাবনা অ্যাঃ পাবলিক প্রসিকিউটার কবি ফণীন্দ্রনাথ রায়ের আহ্বানে। ফণী আমার সহপাঠি।

২। দারজিলিং : সঙ্গী—কিরণকুমার রায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী ও অতুলানন্দ চক্রবর্তী। উদ্দেশ্য : বিশুদ্ধ ভ্রমণ।

১৩৪৬

হাজারিবাগ, রাজরপ্পা : সঙ্গী—কিরণকুমার বায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উদ্দেশ্য : বিশুদ্ধ ভ্রমণ।

২। জলপাইগুড়ি, জয়ন্তী খুকলঝোরা : সঙ্গী—সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, উদ্দেশ্য : হাতীখেদা দেখা, অশোক মৈত্রের আমন্ত্রণে।

১৯৪৯

ল্যানসডাউন ও সিমলা : সঙ্গী—কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার। উদ্দেশ্য : বিশুদ্ধ ভ্রমণ।

১৯৫২

গালুডি : সঙ্গী—সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অমল দেব। উদ্দেশ্য : বিশুদ্ধ ভ্রমণ। সুধাংশুর সঙ্গে এই ভ্রমণই শেষ।

বারাসত : ১৯৬১—সজনীকান্ত দাস, বিধায়ক ভট্টাচার্য। ১৯৬২—স্টেশন ওয়াগনে অনেকে। সুকমলকান্তি ঘোষের আমন্ত্রণে, তার বাগান বাড়িতে। দ্বিতীয় বারের আয়োজন ব্যাপক। লেখক, চিত্রশিল্পী, সম্পাদক প্রভৃতিকে সংগ্রহ করে আনায় সুকমলের যথেষ্ট সাহিত্যিক শিল্পী প্রীতি প্রমাণ করছে। এঁদের মধ্যে আমি গিয়েছি এক মুভি ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে। সেখানে পত্রিকা-যুগান্তরের ফোটোগ্রাফারকে অনুরোধ জানিয়ে এবং অতিথিবর্গের অনেককে জড়ো করে একখানা গ্রুপ ফোটোগ্রাফ তোলার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেখানা আমার কাছে আছে।

লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, সজনীকান্ত দাস, চারু চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) আশু মুখুজ্জে, প্রবোধ সান্যাল, রমেন মল্লিক, বাণী রায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, চিত্রিতা দেবী প্রভৃতি।

শিল্পীদের মধ্যে—অতুলচন্দ্র বসু, চিন্তামণি কর, ইন্দ্র ডুগার, রথীন মৈত্র, কিশোরী রায়।

সম্পাদক ও অন্যান্য—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (ভি-এম), প্রাণতোষ ঘটক, শৈবালকুমার গুপ্ত, অশোক সেন, আরতি সেন, বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, সন্তোষ বসু, ডাক্তার যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, মদন দত্ত, ইত্যাদি। খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল কাফে-টারিয়া রীতিতে—যার যার ডিশ সে তুলে নিয়ে খাবে যত ইচ্ছা। অন্যের পরিবেশনের অপেক্ষা এ রীতি বেশি উপাদেয়।

তারিখটা ছিল ২৮শে জানুয়ারি ১৯৬২। এই মিলনের গ্রুপ-ছবির দিকে চেয়ে দেখছি—এর পর আট নয় বছরের মধ্যে সাতজন মারা গেছেন—সজনীকান্ত, তারাশঙ্কর, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাণতোষ ঘটক, রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও শিল্পী কিশোরী রায়।

সুকমল ঘোষকে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। ছবির মতো ছোট্ট বাড়িটি নানা ফুলের বাগান বেষ্টিত। এই সৌন্দর্যপ্রীতি তার নিজস্ব, কিন্তু সৌন্দর্য ভোগের দিক দিয়ে সে সমাজতান্ত্রিক। সবার সঙ্গে উপভোগে তৃপ্তি। এবং সবার তৃপ্তির মধ্যে আত্মতৃপ্তি, জিনিসটি ভাল লেগেছিল খুবই।

সুকমল পেন্টার হলে বোধ হয় সৃষ্টির আনন্দটা আরো বেশি পেতে পারত। এর আগে, আমার লেখা ইতস্ততঃ ভাল লাগামাত্র তৎকালীন যুগান্তর সম্পাদক ভি-এম-এর কাছ থেকে চিঠি পেতাম আগে বলেছি। বর্তমান ব্যস্ত সম্পাদক সুকমল আমার লেখা পড়ার সময় পায় না। কিন্তু যদি পেত তা হলে তার কাছ থেকেও, তার ভাল লাগলে তা জানতে পারতাম। তার প্রমাণ ১৯৭২ সনে সুকমল আমার পত্রস্মৃতি বইখানা পড়ে ফোন করেও তৃপ্তি না পেয়ে কাছে এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। শিল্পরসিক সুকমলের মনে এখনো কোমল সেন্টিমেন্টের কিছু trace অবশিষ্ট আছে বলেই সন্দেহ হয়।

॥ সতেরো ॥

পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে আমার ইতশ্চেতঃ বিভাগে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব সমস্যা মীমাংসার অনুরোধ আসত। এই রকম একখানা চিঠি আমতা থেকে ১৫।১০।৬২ তারিখে লেখা—আমি সেটি প্রকাশ করে একটা মীমাংসার চেষ্টা করলাম। চিঠিখানা এই—

প্রিয় এককলমী, প্রথমেই আমি আপনাকে আমার বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। ...একটি অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে।—যদি সম্ভব হয় তবে এর কারণটা আমাকে জানাবেন। প্রশ্নটা হলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে ডাকবার জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ আছে—কিন্তু স্বামীকে সবার মাঝে ডাকা যায় এমন কোন সম্বোধন করার মত শব্দ নেই কেন?

শ্রীসোনালি সরকার

আমি এ প্রশ্ন নিয়ে যে আলোচনা করেছিলাম, তার নমুনা দিচ্ছি। আমি বলেছিলাম—সবার মাঝখানে স্বামীকে ডাকা যায় এমন সম্বোধন বাংলা ভাষায় অনেকগুলি আছে, শুধু অভ্যাস আর সাহসের অভাবে সেগুলি কেবলমাত্র ঘরের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলির মধ্যে দু একটিমাত্র দরজার বাইরে উঁকিঝুঁকি মারে। অন্যগুলির বাইরে আসবার সাহস নেই। স্ত্রীদের মুখে একটি চমৎকার সম্বোধন, 'ওগো!' মাত্র এই একটিই সবার সামনে বেরিয়েছে। কিন্তু আরো যে সম্বোধনগুলি একটু উস্কানি পেলে বেরিয়ে আসতে পারে, সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে মিনষে, অন্যটি মুখপোড়া। মিনষে কথাটি খারাপ নয়। মনুষ্য, মনিষ্যি, মিনষে এক গোত্র। কিন্তু মুখপোড়া আমার মতে সবচেয়ে মুখরোচক।

মনে করুন কোনো উৎসবে স্বামীস্ত্রী দুজনেই গিয়েছে। উৎসব দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু কোনো দম্পতির আগেই বাড়ি ফেরা দরকার। স্ত্রী মেয়েদের মহলে। তখন স্ত্রী বেরিয়ে এসে স্বামীকে অনায়াসে বলতে পারে, 'মুখপোড়া, এখন বাড়ি চল।' অনেক স্বামীই হয় তো বুঝতে পারবে না কাকে ডাকছে। ফিরে তাকাবে সকল স্বামী। তখন সেই বিশেষ স্ত্রী বলবে, 'ওগো অমুক ঠিকানার মুখপোড়া, এখন বাড়ি চল।' শুধু প্রথা সৃষ্টির ব্যাপার। এসব

স্বদেশী সম্বোধন থাকতে অন্য কোনো দেশের অনুকরণের দরকার নেই।

এই আলোচনার কয়েক বছর পরে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আবার আলোচনা করেছিলাম। তার ভুমিকায় বলেছিলাম, আমাদের নিজস্ব ভাষায় স্বামীকে সম্বোধন করতে 'ওগো' ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বিদেশীরা এমন সম্বোধন শুনলে ভাববে ওগো মানে স্বামী। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের গানে বা কবিতায় যেখানেই ওগো আছে, সেখানেই ইংরেজিতে 'হাজব্যাণ্ড' করা বিচিত্র নয়। 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে'—এর অনুবাদ এরকম হবে—My husband, what foreign lands are you going to visit? অথবা ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর হবে—My husband, the god of my life! অথবা Tagore of my life! এবং ওগো কর্ণধার My hubby, my ear holder (অথবা ear puller)।

আরো বলেছিলাম—স্বামীকে তার নিজ নামেই অথবা নামের সঙ্গে দা জুড়ে ডাকা উচিত। বলেছিলাম—'উনি' একটি সর্বনাম শব্দ বা প্রোনাউন, কিন্তু স্বামীর বিষয়ে কিছু বলতে গেলে নামের একবারও উল্লেখ না করে প্রথমেই উনি ব্যবহার আমি অনেক দেখেছি। পূর্ণকুম্ভ বইতে অনেকবার। 'পত্রস্মৃতি'তে দেখা যাবে অমিয়া চৌধুরাণী সর্বত্র 'উনি' লিখেছেন। অন্য একটি রম্য রচনার (লেখিকা : এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়) নামই ছিল 'আমাদের উনি ও সিগারেট।' সেজন্য আমার কাছে 'মুখপোড়া' সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ মনে হয়েছিল। আমি একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম—'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে। তার নানা রূপান্তর ঘটিয়ে দেখিয়েছিলাম কোন্টা ভাল শোনায়। এতে সম্বোধন ও সর্বনাম দুরকমই নমুনা দেওয়া হয়েছে। স্বামী শব্দটিতে স্বত্বাধিকারী বোঝায়, তাই ওতে যাঁদের আপত্তি, তাঁরা আমার তালিকা থেকে অন্য শব্দ বাছাই করতে পারবেন।

মূল রচনা

মনে আছে ভোরের বেলা উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধূলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কী বিমল, করছ কী? আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না।...কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে।...আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই।

যখন সম্পাদক ছিলাম

প্রথম রূপান্তর

মনে আছে ভোরের বেলা উঠে অতি সাবধানে যখন উনির পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুর যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন উনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কী বিমল, ও করছ কী? আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না।...কিন্তু আমার উনি একেবারে একেলে।...আমার উনি মদ খান না, উনির চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই।

দ্বিতীয় রূপান্তর

মনে আছে ভোরের বেলা উঠে অতি সাবধানে যখন নিখিলদার পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুর যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন নিখিলদা হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কী বিমল, ও করছ কী? আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না।...কিন্তু আমার নিখিলদা একেবারে একেলে।...আমার নিখিলদা মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই। (ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে সংক্ষেপে নিখিলদা বললে আরো ভাল শোনায়)।

তৃতীয় রূপান্তর

মনে আছে ভোরের বেলা উঠে অতি সাবধানে যখন মিনষের পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুর যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন মিনষে হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কী বিমল, ও করছ কী? আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। ...কিন্তু আমার মিনষে একেবারে একেলে।.. আমার মিনষে মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই।

চতুর্থ রূপান্তর

মনে আছে ভোরের বেলা উঠে অতি সাবধানে যখন মুখপোড়ার পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুর যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন মুখপোড়া হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কী বিমল, ও করছ কী? আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না।...কিন্তু আমার মুখপোড়া একেবারে একেলে।.. আমার মুখপোড়া মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই।

স্বামীর প্রতিশব্দ রূপে আর একটি তৎভব শব্দ আগে প্রচলিত ছিল, সেটি 'ভাতার'। সংস্কৃত ভর্তৃ থেকে ভর্তা এবং তা থেকে ভাতার। এ শব্দ অপ্রচলিত হয়েছে কেন বোঝা যায় না, কারণ এর ধ্বনিতে বা চেহারায় কোনো ইতরতার ইঙ্গিত নেই। গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে এর বিশেষ চলন ছিল। প্রাচীন সাহিত্যেও ব্যবহৃত হত। গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাটকেও পেয়েছি। একটি তৈরি শব্দ অকারণ এখন বাংলা ভাষা থেকে দূর করে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এর পুনঃপ্রচলন কামনা করি। পূর্ব উদ্ধৃত

ঘরে-বাইরে উপন্যাসের অনুচ্ছেদটি এই নতুন রূপান্তরে কেমন সুন্দর শোনায় তার প্রমাণ দিচ্ছি। এটিকে পরবর্তী রূপান্তর হিসাবে যোগ করছি, অর্থাৎ এটি—

পঞ্চম রূপান্তর

মনে আছে ভোরের বেলা উঠে অতি সাবধানে যখন ভাতাবের পায়েব ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমাব সিঁথেব সিঁদুবটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন ভাতাব হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কী বিমল, কবছ কী? আমাব সে লজ্জা ভুলতে পারব না।···কিন্তু আমার ভাতাব একেবাবে একেলে।···আমাব ভাতাব মদ খান না, তাঁব চরিত্রে কোনো দুবলতা নেই।

এর মধ্যে কোন্‌টা কার পছন্দ তা আমি বলতে পারব না। তবে এটি এর একটি দিক মাত্র। নিখিলেশের দিক থেকে সত্যিই একেলে হওয়া উচিত ছিল, এবং তা হলে তার পক্ষে বিমলাকে বিমল না বলে বিমলাদি বললে খারাপ শোনাত না কিছু।

এখানে অবশ্য আমি দুটি রূপান্তর বাড়িয়ে দিয়েছি, ইতশ্চেতঃতে তিনটি ছিল। তবে এর পরে আর কোনো চিঠি পাইনি—প্রতিবাদেও না, সমর্থনেও না।

ম্যাগাজিন সেকশনের দিকে বহু নতুন লেখকেব লক্ষ্য, এবং পাগলদেবও, সে কথা আগে বলেছি। আর এক জাতীয় পত্র লেখক আছে, তারা সাময়িকী বিভাগকে খুব প্রশংসা করে তার সঙ্গে লেখা পাঠায়। লেখা ফেরৎ গেলে চিঠি লিখে জানায় কিছুই হচ্ছে না, যতসব বাজে লেখা। কেউ লেখে অমুকের লেখা প্রায়ই দেখি, আমার লেখা কি তার চেয়ে খারাপ? আবার অনেকে কর্তৃপক্ষের কাছে বেনামা চিঠি পাঠায় নানা কল্পিত অভিযোগ জানিয়ে। এ রকম অভিজ্ঞতা খবরের কাগজের ম্যাগাজিন সেকশনের সকল সম্পাদকেরই সম্ভবত আছে। লেখা ছাপানোর জন্য এই জাতীয় লোলুপতা আমার বিশ্বাস কেবলমাত্র বাঙালী ছেলেদের মধ্যেই বেশি। এরা অনভিজ্ঞ, এবং অপরিপক, তাই কোন্‌টা প্রকাশযোগ্য লেখা এবং কোন্‌টা নয় তা বুঝতে পারে না বলেই এই বিভ্রাট ঘটে।

কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকেও এমন ব্যবহার পেয়েছি। ১৯৪৬ বা ৪৭ সনে এক অধ্যাপক আমার বাড়িতে এসে হাজির তাঁর কবিতা, এবং তা পূজা সংখ্যায় ছাপানোর, অনুরোধ সহ। আমি তাঁকে বুঝিয়ে

বলেছিলাম, এ রকম আসা আপনাদের পদমর্যাদার পক্ষে হানিকর। ছাপানোর জন্য ভিক্ষাবৃত্তি কেন? এমন আপনাদের মর্যাদা হোক, যাতে আমরা যাব আপনাদের কাছে লেখা ভিক্ষা করতে। লেখা ছাপাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল আত্মসম্মান।

তবু আমি তাঁকে বলেছিলাম পূজাসংখ্যার জন্য নতুন কোনো লেখাই আর এখন বিবেচনা করার সময় নেই, আপনি দেরিতে এসেছেন। তখন তিনি এমন একটি আপত্তিকর কথা বললেন, যা একমাত্র যারা লেখা ছাপার জন্য অতি লোলুপ, এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন, তারাই বলতে পারে। তিনি বললেন, আপনারই তো হাত। আমি এ কথায় অত্যন্ত বিস্মিত এবং কিছু উত্তেজিত হয়ে বললাম, হ্যাঁ আমারই হাত, কিন্তু আমি আপনার লেখা ছাপব না।

এ রকম আরো এক লেখক এসে প্রায় পায়ে ধরার উপক্রম। আমি তখন লেখক তালিকা তাঁর সামনে দিয়ে বললাম, আপনিই ঠিক করে দিন কার লেখা এ থেকে বাদ দিয়ে আপনার লেখাটি দেব। তিনি বলতে লজ্জা বোধ করলেন। একজন প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, ভালমানুষ, তিনিও লেখা নিয়ে নানা কাগজে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর লেখা মাঝে মাঝে ছেপেছি। অনেকবার আমার কাছে এসেছেন, আমি তাঁকে খুব বিনীতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, আপনার পক্ষে এ রকম লেখা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো অসম্মানজনক। লেখা পাঠিয়ে দেবেন ডাকে, নিজে বয়ে আনবেন না। আবার কেউ চিঠিতে লিখেছে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন আছি, আমার লেখাটি কবে ছাপা হবে?

এই শেষোক্ত পত্রলেখক হয় তো সত্যই উদ্বিগ্ন আমার স্বাস্থ্যের জন্য। কিন্তু ঐ একই চিঠিতে একই সঙ্গে লেখা-বিষয়ে সন্ধান নেওয়া যে কিছু অসঙ্গত সে বোধ নেই। একদিন এক পরিচিত প্রবীণ পূজনীয় কবির আমার অপরিচিত পুত্র তার সঙ্গীত বিষয়ের একটি লেখার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কি হল জানতে এসেছিল। সে লেখাটি আমি আগেই সঙ্গীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে দেখিয়ে নিয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন, ছাপার অযোগ্য। আমি লেখাটি ফেরৎ দিয়ে বললাম, তথ্যে ভুল আছে তাই ফেরৎ দিচ্ছি। বাবড়িমাথা ছেলেটি লেখা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে আমাকে লক্ষ্য

করে বলল, নিজেরা ভারি তো লেখেন তা আবার অন্যের লেখা বিচার। কবিকে লিখে জানানোর ইচ্ছে ছিল, আপনার পুত্র পরিচয়ে একটি প্রতারক ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সাবধানে থাকবেন। তিনি দুঃখ পাবেন বলে লিখিনি। লেখক যশঃপ্রার্থীদের এই সব কাণ্ড দেখে বিরক্ত হয়ে, কবি রমেন মল্লিক (বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার সম্পাদক) যখন একবার তাদের সাহিত্য তীর্থের স্টীমার পার্টিতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানায়, তখন চিঠিতে তাকে জানিয়েছিলাম, যদি অন্তত ২০০ লেখককে ডুবিয়ে মারার গ্যারাণ্টি দাও, তা হলে তোমার স্টীমার পার্টিতে যোগ দিতে রাজি আছি।

একবার এক লেখক গল্প পাঠিয়েছিল, গল্পটি অচল। ফেরৎ পেয়ে লিখেছিল, "বুঝেছি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (গল্প মনোনয়ন তখন তার হাতেই ছিল) প্রতিষ্ঠার হানি হবে আমার গল্প ছাপালে, তাই ফেরৎ দিয়েছেন।" নিজের বিষয়ে এরকম ধারণা পূর্বের এক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ঐ যে লিখেছিল I am a great writer ! এক লেখক ভালুকের মতো পোশাকে সেজে লিখছে আমি একা চলেছি একটি শৃঙ্গ বিজয়ে। এখন ২০ হাজার ফুট উঁচু থেকে লিখছি ইত্যাদি। সঙ্গে ফোটোগ্রাফ। সবটাই সাজানো। ও পোশাকে কেউ পর্বতারোহণ করে না। এবং ২০ হাজার ফুট উচ্চতায় কেউ ঘাসের উপর বসে ছবি তোলায় না। ছবিটি দেখামাত্র তা বুঝেছিলাম। একজন লেখক 'বনফুল' ভাগলপুব এই নাম ঠিকানার এক লেখা পাঠিয়েছিল। সবটাই ধাপ্পা। তাব বোঝা উচিত ছিল, হাতের লেখায় ধরা পড়বে। একবার এক যুবক ভিতরে এসেই জিজ্ঞাসা করল ইতশ্চেত: কে লেখেন ? আমি তার চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝেছিলাম সে সুস্থ মগজের নয়। মনে হল বেশ উত্তেজিত হয়ে এসেছে। বললাম, ও তো একজন লেখেন না, পালা করে একসপ্তাহে বিষ্ণু ঘোষ ও আর এক সপ্তাহে পঞ্চানন ঘোষাল (তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার অভ পুলিস) লেখেন। একটু কি ভেবে সে চলে গেল, কোনো কথা না বলে। এই দুজনের নাম করলাম সবার পরিচিত বলে, এবং তাকে শান্ত করার জন্য। বিষ্ণু ঘোষ আমাকে দাদা বলে ডাকতেন, পঞ্চানন ঘোষালও তাই। প্রথম জন মৃত, দ্বিতীয় জনের খবর অনেক দিন পাইনি, কিন্তু তিনি আমাকে বিশেষ ভালবাসতেন, এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক উপকার করেছেন নিজে থেকেই।

আর একখানা মজার চিঠি পেয়েছিলাম কোনো অটোগ্রাফ সংগ্রহকারী ছাত্রের কাছ থেকে। ইংরেজি চিঠি। আমার স্বাক্ষর করা ফোটোগ্রাফ চায়। সে জন্য আমাকে কি কি করতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছিল। দুটি ঠিকানা দিয়েছিল, কোন্ ঠিকানায় সে কতক্ষণ থাকে তা জানিয়ে লিখেছিল ঐ সময়ের মধ্যে যে কোনো দিন ঐ দুই ঠিকানার একটিতে আমি যেন তার কাছে উপস্থিত হয়ে সইকরা একখানা ফোটোগ্রাফ দিয়ে আসি। মাত্র পনেরো দিন সে কলকাতা থাকবে অতএব—।

এমন চিঠি আর কোনো ব্যক্তি কখনো পেয়েছেন বলে মনে হয় না। এবং এই বাংলা দেশে হওয়া সত্ত্বেও এটি অতুলনীয় বলেই মনে হয়। ইংরেজি চিঠি, সে ইংরেজির নমুনা আর দেবার ইচ্ছা নেই, ইতিপূর্বে অনেকগুলি দিয়েছি।

ছাপার ভুল অনেক সময় কি রকম কৌতুককর হয়ে ওঠে তারও কিছু সংগ্রহ আছে আমার। বিলেতের কোনো কোনো কাগজে এ জাতীয় ছাপার ভুলের নমুনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তা পড়ে আমার খুব উৎসাহ হয়েছিল সংগ্রহ করার। আমাদের দেশে প্রকাশিত কাগজে এত ভুল থাকে যে, যে সব ভুলে স্বভাবতই কৌতুক সৃষ্টি হয় তা অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সাধারণ ছাপার ভুলের কথা বলছি না। যে ভুল বিষম কৌতুক সৃষ্টি করে তার কথা বলছি। এ রকম ভুল সাময়িক অন্যমনস্কতা বশত ঘটে ছাপাখানায়। প্রথমে একটি অদ্ভুত ভুলের কথা বলি। এটি এক ভুল থেকে আর এক ভুল এবং তা থেকে আর এক ভুলে গিয়ে শেষ হল। কেমন করে হল বলছি। আগে যুগান্তরে রবিবারের সাময়িকীতে যা ছাপা হবে, পূর্বদিন শনিবার তার সূচিপত্র ছাপা হত, এবং তার আগে কি কি লেখা কম্পোজ হল এবং কোন্‌টার আকার কত ইঞ্চি তা প্রেস থেকে আমার কাছে পাঠানো হত। একটা রচনা ছিল নীলিমা মুখোপাধ্যায়ের লেখা, নাম, 'আসুন না কোট পরি।' মহিলা বিভাগের জন্য লেখা। লেখিকা, অফিসে বা অন্যত্র চাকরীজীবী মেয়েদের উদ্দেশে ঐ নির্দেশটি দিয়েছিল। কোট পরলে মেয়েদের অনেক সুবিধা—এই সব ছিল সে লেখায়। প্রেস থেকে যে প্রস্তাবিত লেখাগুলির তালিকাটি ২৫-২-৬২তে এলো, তার ২১ সংখ্যক আইটেম এটি, মাপ সওয়া কলম। তাতে ঐ প্রবন্ধের নাম লেখা হয়েছে

'আসুন না কোর্ট পরিদর্শনে।' কোথায় আসুন না কোট পরি—আর কোথায় বা আসুন না কোর্ট পরিদর্শনে। তারপর পূর্বদিন অর্থাৎ ২৪-২-৬২ শনিবারে যে সূচিপত্রটি ছাপা হল, তাতে ঐ নাম আবার বদল হয়ে দাঁড়াল —আসুন না কেটে পড়ি। খুবই কৌতূহল সৃষ্টিকারী শিরোনাম—একটি মেয়ে লিখছে আসুন না কেটে পড়ি! অবশ্য ভুলটা শুধু বিজ্ঞাপনেই ছাপা হয়েছিল।

১৯-৬-৬০ তারিখে একটি খেলার মাঠের ফোটোগ্রাফ ছাপা হল। দর্শকদের দেখা যায় না, প্রবলবর্ষণে হাজার হাজার ছাতা শুধু দেখা যাচ্ছে। যিনি ছবির নিচে পরিচয় লিখলেন, তিনি লিখেছিলেন বেশ ভালই। লিখেছিলেন—'ছত্র সমাবেশ। হাজার হাজার দর্শক হাজার হাজার ছত্র সমাবেশ।...' কিন্তু ছাপা হয়ে এলো 'ছাত্র-সমাবেশ। হাজার হাজার দর্শক হাজার হাজার ছাত্র-সমাবেশ।...' সমস্ত রসিকতাটাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

২৮-৮-৫৪ তারিখে অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় (পরে ডঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী) লিখছে, বিজ্ঞাপনে দেখলাম আমার লেখা বেরোচ্ছে। কিন্তু আমার ছদ্মনাম ছিল প্রসৃতি দেবী—ছাপা হয়েছে প্রসূতি দেবী। (এটাও শুধু পূর্বদিনের বিজ্ঞাপনের ভুল)।

২৬-৯-৫৯ তারিখে, মাঠে-দাঁড়ানো একটি হাসিভরা মুখ কৃষক-যুবকের ফোটো ছাপা হল, নিচে পরিচয় লেখা হল, শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর কলকাতা সঙ্গীত সম্মেলনে সেতার বাজাইতেছেন।

৫-১-৫২ তারিখের একটি মুদ্রিত সংবাদ, শিরোনাম—শ্রীথাটের নাম প্রত্যাহার।...মিঃ খাটে তাঁহার নাম প্রত্যাহার করায়...। শ্রীআটের এই নাম প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান যে শ্রীমাটে ব্রহ্মচারীকে পূর্ণ সমর্থনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (একই থাটের নাম, অথচ দাঁড়াল এই রকম—থাটে. খাটে, আটে ও মাটে এবং মাত্র কয়েক লাইনের মধ্যে)।

৩-৬-৫৩ তারিখে, হিলারি মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে যখন স্বদেশে (নিউ জীল্যাণ্ডে) ফিরলেন, তখন তাঁকে নিয়ে যে আনন্দ উৎসব হয় তার খবরের একটি অংশ ছাপা হল এই রকম—'এক জন রিপোর্টার মিস্টার হিলারির মাগ পারসি হিলারিকে সংবাদটি জানাইলে তিনি অবিলম্বে তাঁহার স্বামীকে

সংবাদটি জানাইবার জন্য ছুটিয়া যান। কুড়ি বৎসর আগে হিলারি বলিয়াছিলেন যে, তিনি একদিন এভাবেস্টে আরোহণ করিবেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মাগ বলিয়া উঠেন 'ইহা কি বিস্ময়কর নয়?' (মাতার স্থলে মাগ! —হাতের লেখা 'তা' কপিতে অনেক সময় 'গ'-এর মতো দেখায়, তবু অর্থটি যে মাথায় ঢোকেনি তা সম্ভবত বেশি রাত্রে কমপোজিংএর সময় ঘুমের ঝোঁকে)।

৮-৮-৫৫ তারিখে রবীন্দ্র তিরোধান দিবস উপলক্ষে বিশেষ বেতার সূচি ছাপা হল, তার একটি লাইন দাঁড়াল এই রকম "ইহার পর ঐ একই মিটারে গান্ধীজির আবেদন-এর নাট্যরূপ প্রচারিত হইবে।" (রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান্ধারীর আবেদন ছাপাখানা-রচিত গান্ধীজির আবেদনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো সেটি নাট্যরূপেই লিখেছিলেন, তার উপরে আবার "নাট্যরূপে" কেন? এটি রেডিও স্টেশনের বিজ্ঞপ্তি লেখার কৃতিত্ব বলেই মনে হয়)।

১৭-৭ ৫৩ তারিখের সংবাদের শিরোনাম 'অল্পের জন্য দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা।' এবং সংবাদ: ৩৬ জন যাত্রী ও ৭ জন 'স্ক্রু' জুহু বিমান ঘাঁটিতে নামিবার পর অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়াছে। (৭ জন বিমান স্ক্রু, না '৭টি স্ক্রু অথবা '৭ জন ক্রু?' সাতটি স্ক্রু বেঁচে গেছে তার কত্তই বা দাম? তা বোধ হয় নয়। বোধ হয় ক্রু)। ঐ সংবাদেরই এক অংশে আছে "অবতরণের পর বিমানটি যখন রানঅ্যাওয়ে দিয়া ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছিল, তখন পাইলট ব্রেক কষিয়া রানঅ্যাওয়ের শেষ প্রান্তে বিমানটি থামাইতে পারিয়াছিলেন।" (বিমানটিই তাহলে 'রানঅ্যাওয়ে' বিমান? —নইলে রানওয়েতে ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে ছোটে?)

২২-২-৬২ তারিখের খবর। শিরোনাম—শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও সজনীকান্ত দাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। এবং সংবাদ: "সভায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং সজনীকান্ত দাসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁহাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতি সমালোচনা করিয়া দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।" (মৃতদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও জীবিত পরিবারবর্গের প্রতি সমালোচনা, এই দুরকম ব্যবহার—ছাপার ভুলের ব্যাপার। সমবেদনার স্থলে সমালোচনা।)

এই মুদ্রণ-কৌতুকগুলি যুগান্তর থেকে সংকলিত। অন্য কাগজ থেকে বেশি সংগ্রহ করিনি—দুচারটি তুলে দিচ্ছি।

২৪-১-১৯৬১ তারিখের দৈনিক বসুমতীর সংবাদ শিরোনাম—শ্রীশৈলজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ (৩৭ তম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন)। কথা সাহিত্যের উদ্বোধন করিয়া শ্রীশৈলজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— ইত্যাদি। (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গোত্রান্তর ঘটানো হয়েছে। সম্ভবত ভুলটা এ কারণে যে, যিনি সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি শৈলজানন্দের পুরো নাম জানেন না)।

খুব সম্প্রতি ১৪-৯-৭২ তারিখের দৈনিক বসুমতীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের ফোটোগ্রাফ ছেপে নিচে লিখে দেওয়া হয়েছে 'অমর কথা-শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।' এবং ১-৬-৭৩ তারিখে দৈনিক বসুমতীতে একটি ঘনকৃষ্ণ দাড়িগোঁফ সম্বলিত লোকের চেহারা ছেপে তার নিচে লেখা হয়েছে—ছন্দপতন-এর নায়িকা নন্দিনী মালিয়া।

১২-১-৭২ তারিখের দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত একটি খবর—'সারা জীবনের জন্য ১১ জন পাকিস্তানী খেলোয়াড়কে অলিম্পিক ক্রীড়া থেকে বাতিল করে দেওয়ায় প্রেসিডেন্ট ভুট্টো খুবই মুগ্ধ।'

১৫-৮-৭২—আনন্দবাজার পত্রিকা : পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে মধ্যবিত্ত বাড়িতে গ্যাস-ফ্রীজ ছোট হাইফেন রেডিও ছিল বড়লোকি ব্যাপার। (সম্ভবত গ্যাস-ফ্রীজ-রেডিওই উদ্দেশ্য ছিল, 'ছোট হাইফেন' প্রেসের প্রতি নির্দেশ, কিন্তু ঐ নির্দেশ সমেত ছাপা হয়ে গেছে)। ২২-৫-৭৩—আনন্দবাজার পত্রিকা : পরলোকে কবি নিশিকান্ত, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ড্রক্ষ।

১২-১১-৭১—অমৃতবাজার পত্রিকা—যোগেশচন্দ্র বাগলের অসুস্থতার খবর মুদ্রণ সময়ে Mr. Bagal হতে হতে শেষে একস্থানে হয়েছে—Acute financial difficulties faced Mr. Bengal during the last few years. ৩০-৩-৭২ তারিখের পত্রিকায় সরোজকুমার রায়চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদের এক স্থানে ছাপা হয়েছে He was seventy and left behind three sons and four daughters besides his life. ১১-৯-৭২ তারিখের পত্রিকায়—He (Mujib) referred to a poem of Rabindranath Tagore in which the poet said that 'God has

created seven crores of people, but they were not made human beings. (রবীন্দ্রনাথের—সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী/ রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করোনি-র অনুবাদ।)

১০-৯-৭২ তারিখের স্টেটসম্যান—Meanwhile, the Government has asked those ration ship owners who observed a day's token strike on Sept. 7 to show cause...(পশ্চিমবঙ্গে র‍্যাশন জাহাজ কজনের আছে ?)

ইতিপূর্বে লেখা প্রকাশের জন্য ইংরেজিতে চিঠি লেখার কয়েকটি নমুনা দিয়েছি। চাকরির জন্য দরখাস্ত করার মনোভাব অনেকগুলিতেই প্রকট। এই হচ্ছে গড় বাঙালী যুবকদের চরিত্র। একটা দীন ভাব প্রকাশ না করলে অনুগ্রহ পাওয়া যায় না, এ রকম একটা ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল। এ রকম কেন হল বোঝা যায় না। যে লেখক হতে যাচ্ছে তার যথেষ্ট আত্মসম্মান বোধ থাকা উচিত। লেখা কখনো দয়া করে বা করুণা করে ছাপা হয় না। কাজেই দয়া ভিক্ষা অবান্তর। প্রত্যেক সম্পাদকেরই নিজের প্রয়োজন হিসাবে লেখা ছাপা হয়। সেজন্য খুব উচ্চাঙ্গের লেখা ছাপা না হতে পারে এবং ছাপার যোগ্য সাধারণ লেখা সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করলে ছাপেন। এবং তাঁকে বাইরের থেকে আসা লেখার উপরেই প্রায় সব সময় ভরসা করতে হয়। সেজন্য যেসব লেখা আসে তা পড়ে তার ভালমন্দ বা প্রয়োজনীয়তা বিচার করতে হয়। খবরের কাগজের ম্যাগাজিন সেকশনে সেজন্য সবরকম লেখা ছাপা চলে না। কাজেই যারা লেখা পাঠায় সে লেখার সঙ্গে তাদের অনুরোধ উপরোধ এবং দয়াভিক্ষা কোনো কাজেই লাগে না। লেখার সঙ্গে শুধু নাম ঠিকানা স্পষ্ট লেখা থাকলেই যথেষ্ট। উপরন্তু ডাকটিকিট পাঠানো ভাল। লেখা অমনোনীত হলে তা নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে তর্ক করা আরো খারাপ।

দেখা গেছে অনভিজ্ঞ লেখকদের ইংরেজিতে চিঠি লেখার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে হীনতাভাব প্রকাশ পায়, তাতেও প্রেরিত রচনার উৎকর্ষ কতখানি বোঝা যায়। তা ছাড়া অল্প কিছু ইংরেজি শিখেই মনের ভাব প্রকাশ করার অপচেষ্টা থেকে লেখকের শিক্ষা বা বিদ্যার পরিচয় ফুটে ওঠে। তাতেও লেখার মর্যাদা নষ্ট হয় সম্পাদকের চোখে। সেজন্য রচনার সঙ্গে

চিঠি পাঠানোর কোনো দরকারই নেই। আমি আর একখানি মাত্র ইংরেজি চিঠির নমুনা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করে এ জাতীয় চিঠি প্রসঙ্গ শেষ করছি। চিঠিখানি এই—(ভাষা বানান যথাযথ)

Respected

To The Editor···Dated 19-6-62

Subject: Prayer for puting articles (lessons) of 'Solar' and 'Philosophy' (dwelt with existance of God made by Philosophers.)

Sir, Wishing to invite your kind notice that the undersigned belcngs to them who speak in favour of cultivation of science but in the same time are always hankering to search the spiritual guide through unseen passage of human life which is a dead against openion to some of the learned men of this world in seperate arguments, point by point although the above later depends upon developed thought, the attached paper sheet possessing some questions made and thought by the appli-eant, is sent to you for puting articles in your paper in connection 'Existance of God, dwelt with world noted Philosophers, with a hope that you will kindly take it simply an earnest prayer although the follow-ing signatory has no educational qualification but yet, he is thirsty to know. Thanking you, Sir.

Yours faithfully etc.

আশা করি পূর্ব অধ্যায়ের চিঠিগুলি এবং এ চিঠিখা৽া পড়ার পরে ভবিষ্যৎ লেখকেরা আর এ জাতীয় সব চিঠি পাঠাবে না সম্পাদকের কাছে। এতে নিজেকে অকারণ ছোট করা হয়। প্রথমেই অশিক্ষিত প্রমাণ করা হয় এতে।

আজ যখন এ অধ্যায় আরম্ভ করেছি তখন বাংলা বন্ধের আয়োজন এবং তা ভাঙার আয়োজন চলছে। বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে প্রধানত দ্রব্যমূল্য অতিবৃদ্ধির জন্য। তাই আগের দিনের- এবং বর্তমান বাজার দরের কথা ভাবছিলাম আজ ২৬শে জুলাই ১৯৭৩। ভাবছিলাম আরো একটি কারণে। সামনে একখানা ক্যাশ মেমো খোলা আছে ২২শে জুলাই (১৯৭৩) তারিখের। ইলিশ মাছের দরুন ক্যাশমেমো, দর ৭ টাকা ৮০ পয়সা কিলো। সেনট্রাল ফিশারিজ করপোরেশনের খুচরো বিক্রির দোকান থেকে পাওয়া। খোলা

বাজারের চেয়ে অবশ্যই শস্তা। স্মৃতি পিছু হটে চলে গেল অনেক দূর কালে। ভাবছিলাম আমি নিজ হাতে ইলিশ কিনেছি নিয়মিত, সে সময় ৭ টাকা ৮০ পয়সার ইলিশ কিনলে প্রায় ২০০ জন নিমন্ত্রিত অতিথিকে তৃপ্ত করা যেত খাইয়ে। বলছি ১৯০৫-১৯৩০ সনের কথা। এখন খুব বেশি হলেও ১০ জনকে কোনো মতে খাওয়ানো চলে। সেকালের একটি বিশেষ বছরে বোধ হয় ১৯০৮ হবে—ঐ টাকায় ১২৫টি ইলিশ বিক্রি হয়েছে। পাবনা জেলার দক্ষিণ প্রান্তের কথা বলছি। ৪০০ লোক ঐ টাকায় পেট ভরে খেতে পারত ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে।

ভাবছিলাম আরো দূরকালের কথা। সাহিত্য পরিষদে গিয়ে একবার ১৮৫৪ সনে প্রকাশিত সম্বাদ ভাস্কর থেকে সেই সময়ের দরবৃদ্ধিতে কি ক্ষোভ জেগেছিল তা টুকে এনেছিলাম। মানুষের কি দুর্দশা ঘটেছিল খাদ্যবস্তুর মহার্ঘতায়। ক্ষোভের কারণ—

কলিকাতা নগরে সকল বস্তুই মহার্ঘ্য। তবে দরিদ্র লোকদিগের উপায় কি? শারদীয়া পূজা নিকট হইয়াছে, দোকানি পসারিরাও দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যম প্রকার মুগের মোন আড়াই টাকা, অড়হরের মোন দুই টাকা সাত আনা•• আতপ তণ্ডুল যাহা দুর্গা নৈবেদ্যে ব্যবহার হয় তাহার মোন আড়াই টাকা, মধ্যম প্রকার ঘৃত সের এক টাকা।

আতপ চালের দাম ৪০ সের আড়াই টাকা (এক সের চার পয়সা)—ক্ষোভের বিশেষ কারণ এটাই। আর এখন ৪০ সেরের দাম সম্ভবত ১৫০ টাকা। সেকালের বাজার দর প্রথমে বলেছি। একালেও কয়েকটি সেকাল এসেছিল প্রাণমন উদ্দীপ্ত করতে—যেমন এ পৃথিবীতে কয়েকটি তুষার যুগ এসেছিল প্রাণ বিনাশ করতে। একটা সেকাল আমি এই কলকাতা শহরেই দেখেছি। তার স্থায়িত্ব কাল ছিল ১৯৩৮ সন পর্যন্ত। তখন আট টাকায় ১৬ সের ইলিশ পাওয়া যেত, এবং ৮০ সের চাল।

আমার জীবনে ইলিশ মাছের সর্বনিম্ন দাম (১৯০৮) দেখেছি এক পয়সায় আটটা, আর সর্বোচ্চ দাম দেখলাম (১৯৭৩) একটার দাম ৪০ টাকা। পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, সব বাড়ছে—দাম এবং মানুষ। ২৭শে জুলাই-এর জন্য হরতালের ডাকে এসব স্মৃতি মনে জেগে উঠল।

যুগান্তরে বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ও বিনয় চৌধুরীর কথা বলি। বিনয়কৃষ্ণের মতো উৎসাহদাতা বন্ধু বিরল। সাময়িকী বিভাগে তার একটিমাত্র লেখা

বোধ হয় ছেপেছি, লেখার দিকে খুব ঝোঁক ছিল না, কিন্তু পাণ্ডিত্যে সে বড় ছিল, আর ছিল প্রকৃত বন্ধুবৎসল। মন ছিল উদার—শত শত টাকার বই বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। এখন সে কিছু পঙ্গু হয়ে পড়েছে, তবু বেঁচে আছে এটাই বড় কথা। বিনয় চৌধুরী খুব ভাল গল্প লিখত। তার অনেক গল্প আমি ছেপেছি। কিরণকুমার রায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত এরা যেন একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল। বিনয় 'প্রবাহ' পত্রিকা প্রকাশ করল, বিনয়কৃষ্ণ ছিল উপদেষ্টা, কিরণ ছিল সম্পাদক। এই পত্রিকাতেই ডকটর অমূল্যচন্দ্র সেনের ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে। কিরণ ও সুধাংশু অকালমৃত্যু বরণ করল, এ দুটি মৃত্যু আমাকে কম আঘাত দেয়নি। কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের অকালমৃত্যুও তাই। আমাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে গেছে এরা। সেজন্য বার বার মনে পড়ে।

ফণীন্দ্রনাথ রায় লিখেছে তার প্রেসিডেন্সি কলেজের স্মৃতি ধারাবাহিক ভাবে। অতি চমৎকার তার ভাষাভঙ্গি, অনেক তথ্যপূর্ণ ছিল সেগুলি। সুভাষচন্দ্রের হাতে ওটেন যে প্রহৃত হননি তার সাক্ষী ছিল সে।

অন্নপূর্ণা গোস্বামী খুব উৎসাহী লেখিকা ছিলেন এবং ক্যামেরা কিনে ফোটোগ্রাফ তোলা অভ্যাস করেছিলেন। অন্নপূর্ণা আর ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী দুই বোনই লেখায় ভীষণ উৎসাহী। অন্নপূর্ণার ইনটেস্টিনাল ক্যানসারে অকালমৃত্যু ঘটল কয়েক বছর আগে। অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। যখন কলকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক প্রীতি বিনিময় চলছিল পরস্পর গলাকাটার সাহায্যে, তখন অন্নপূর্ণা ছিলেন বনগাঁয়ে। তিনি একটা গুজব শুনেছিলেন, কলকাতার বাজারে যে সব তরিতরকারী বিক্রি হয় তাতে বিষ মেশানো হচ্ছে। তাই তিনি নিজেদের বাগান থেকে আমাকে অনেক শাকসবজী তরকারি পাঠিয়েছিলেন। তাতে আর কিছু না হোক, আমার একটি গল্পের প্লট পেয়ে গিয়েছিলাম। সেটি বিষ নামে আমার 'মারকে লেঙ্গে' নামক বইতে স্থান পেয়েছিল। অন্নপূর্ণার সেই চিঠিখানা এখনো আমার কাছে আছে। প্রসিদ্ধ লেখিকা সীতা দেবী একবার মাত্র লিখেছিলেন মনে পড়ে। প্রাচীন লেখকদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির কয়েকটি লেখা ছেপেছি। তাঁর লেখা একখানি চিঠি তাঁর মৃত্যুর একদিন পরে আমি

পেয়েছিলাম মনে আছে। এবং সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর আবির্ভাব কি প্রীতিপ্রদই না ছিল আমার কাছে। তাঁর অনেক চিঠি আমি পত্রস্মৃতিতে ছেপেছি। ভারী চিত্তাকর্ষক সেসব চিঠি।

প্রতারণা বিষয়ে লেখার কথা আগে বলেছি। কিন্তু রাম-প্রতারণা কাকে বলে, তা আমাদের লেখিকা সবিতা সেনগুপ্ত যখন পরিবর্তিত জলন্ধরের ঠিকানা থেকে লেখা পাঠালেন, তখন সেই ঠিকানা দেখে মুগ্ধ হলাম। কারণ ওটা প্রতারণার একটি বিখ্যাত পীঠস্থান। তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়ে সুফল লাভ করেছিলাম। প্রচুর তথ্যপূর্ণ একটি বড প্রবন্ধ পেয়েছিলাম, এবং আমার 'পত্রস্মৃতি'তে তার অনেকখানি উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু যাঁরা প্রতারিত হতে ভালবাসেন তাঁবা ওটা পডে সম্ভবত চটে গিয়েছিলেন। ঠিক যেমন আমার 'অধর সরকার নামক ভূতের গল্প পডে ভারতবর্ষের সমালোচক উত্তেজিত হয়েছিলেন।

মৈত্রেয়ী দেবীর অনেক রচনা ছেপেছি, তিনি আসতেন মাঝে মাঝে। অধ্যাপিকা ডকটর রমা নিয়োগী (ইতিহাস) ভাল লিখত, তাকে দিয়ে ইতিহাসের বিষয়ে কয়েকটি লেখা লিখিয়েছিলাম। সেও ক্যামেরার কাজ ভাল জানে, নানা স্থানে ঘুরে প্রাচীন মন্দির ইত্যাদির অনেক ভাল ছবি তুলেছে। সুনন্দা দাশগুপ্ত চমৎকার কবিতা লিখেছে, করবী বসুর লেখাও ছেপেছি। (এরা সবাই বেথুনের অধ্যাপিকা।) এই সঙ্গে ডকটর উমা রায়ের নাম করছি পুনরায়। সেও তখন বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা। সে লেখিকারূপে, বিশেষ করে কবিরূপে, প্রসিদ্ধিলাভ করেছে অনেক দিন আগে থেকেই। সে স্কুল ফাইনালের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের প্রধান পরীক্ষক থাকা কালে আমি তার অধীন পরীক্ষক ছিলাম ১৯৬০ সনে। এ বিষয়ে একটি স্মৃতি মনে এলো। দ্বারেশ শর্মাচার্য তখন স্কুল ফাইনালের পরীক্ষক (এখন বি-এ'র পরীক্ষক) তাকে অথরিটি লেটার দিয়ে পর্ষৎ ভবনে পাঠিয়েছিলাম তাব খাতার সঙ্গে আমার খাতাগুলিও যাতে নিয়ে আসে। পর্ষৎ তাকে আমার খাতা দিতে অস্বীকার করলে আমি চিঠি লিখলাম আমার পরীক্ষকের কাজ থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। সে চিঠি উমাকে পাঠিয়েছিলাম। উমা জানাল, এমন কাজ করবেন না, আমি খাতা এনে দিচ্ছি।

জনসেবায় উমার খুব সুনাম ছিল।

যখন সম্পাদক ছিলাম

সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো জটিল প্রশ্ন থাকলে এখনো মাঝে মাঝে উমাকে ফোন করে জেনে নিই। আগে যেমন বিজ্ঞান বিষয়ে কোনো প্রশ্নের সমাধানের জন্য সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীকে ফোন করতাম। সুধাংশুর অকাল মৃত্যু যাদের ক্ষতির কারণ ঘটাল, তাদের মধ্যে আমিও আছি। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে কদাচিৎ টেলিফোনে আলোচনা করি। শব্দের উচ্চারণ, বানান, শব্দের অপপ্রয়োগ বিষয়ে মনে বিক্ষোভ জাগলে সুধীরকুমার চৌধুরীকে ফোন করে ক্ষোভ বিনিময় করি। এসব বিষয়ে তাঁরও লেখার বিরাম নেই, তাই তাঁরও মনে প্রবল ক্ষোভ। বিশ্বভারতী পত্রিকা ও প্রবাসীতে তিনি এ বিষয়ে অনেকদিন ধরে লিখে আসছেন। শনিবারের চিঠির স্পিরিট আর কারো মধ্যে অবশিষ্ট নেই এখন। বিজ্ঞান বিষয়ে এখন মাঝে মাঝে ডকটর শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করতে হয়। স্বাস্থ্য বিষয়ে সঙ্কট উপস্থিত হলে ডকটর পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করি।

এ সবই আমার কনফেশনের অঙ্গ।

শেষ অধ্যায়

এক ইটালিয়ান শিল্পী এমন সুন্দর আঙুরের ছবি এঁকেছিলেন এবং তা এমন বাস্তব হয়েছিল যে, পাখীও তা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে সেই আঙুর খেতে এসে চঞ্চ্বাঘাতে ছবিখানা নষ্ট করে দিয়েছিল। কলকাতার কোনো থিয়েটারে নিষ্ঠুর একটি চরিত্রের অভিনয় এমন বাস্তবের ভ্রান্তি ঘটিয়েছিল যে কোনো বিশিষ্ট দর্শক তা যে অভিনয় সে কথা ভুলে গিয়ে অভিনেতাকে লক্ষ্য করে পায়ের জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

এ সবই আমার শোনা কথা। কিন্তু আমি নিজে বাস্তবে এমন একটি মাত্র ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার বিভাগে তা নিয়ে কিছু মজা সৃষ্টিও করা গিয়েছিল। শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় পাত্রী নামে একটি গল্প লেখে সাময়িকী বিভাগে। বিবাহ ব্যঙ্গকারী সেই 'পাত্রী' এমন বাস্তব হয়েছিল যে, কয়েকজন পাঠক লেখিকার নামে চিঠি দিয়ে জানান তাঁরা ঐ পাত্রীকে বিবাহ করতে রাজি আছেন। বিপন্ন লেখিকা সেই চিঠিগুলি আমাকে পাঠায়। আমি সেই চিঠিগুলি থেকে একটি গল্পের প্লট পেয়ে যাই এবং ১২।৮।৬৬ তারিখের ইতস্ততঃতে সেটি লিখি। গল্পটি এই—

দুতিনদিন আগের ঘটনা, সকালে কেবল লিখতে বসেছি, এমন সময় একটি মেয়ে এসে উপস্থিত। সাধারণ শাড়ী পরা, হাতে সরু তাবের দুটি চুড়ি, গলায় তেমনি সরু চেন, পায়ে শস্তা স্যাণ্ডাল জাতীয় জুতো। বয়স কত দেখে অনুমান করা শক্ত, তবে পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে যে-কোনো একটা হতে পারে—আমি আবার মেয়েদের বয়স ঠিক বুঝতে পারি না, এবং বয়সের কথা শুধু জিজ্ঞাসা করা নয়, চিন্তা করাও পাপ মনে করি। তাই মনে হয়েছিল পঞ্চাশও হতে পারে এবং অনুমান করার চেষ্টা করে এই পাপ কার্যটি করলাম।

মেয়েটির চেহারায় বেশ বুদ্ধির ছাপ, নাক ধারালো, চোখ দুটি বেশ বড়···উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হবে। চলন ক্ষিপ্র কিন্তু সহজ। হঠাৎ দেখে মনে হল অনেক দুঃখ সহ্য করেছে জীবনে, কিন্তু সে দুঃখ তাকে দুর্বল করেনি।···চোখেমুখে একটা বিষণ্ণতার ছাপ, কিন্তু তা উগ্র নয়, প্রশান্ত।

আমাকে প্রণাম করে বলল,···আমার কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। এবং জানি

এতে আপনার সময় নষ্ট হবে, কিন্তু সেজন্য মাপ চাইব না, সময় নষ্ট হয় তো হবে, জীবনে কিছুই মেপে করা যায় না, একথা আপনার মতো বয়স্ক লোককে বলা বৃথা।...

আমি একটি অপরিচিত মেয়ের মুখে এমন কথা শুনে তার দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হলাম। আমার কাছে তার কি ধরনের কথা থাকতে পারে অনুমান করতে চেষ্টা করছিলাম। কোনো লেখা শুনিয়ে আমার মতামত চায়? সে আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে একটু হেসে বলল, আমার কথা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত কথা আপনাকে তা আমি শোনাতে চাই।

হাসবার সময় তাব সেই হাসির সঙ্গে কিছু বেদনা জড়িয়ে ছিল, কিন্তু তবু তার মুখখানা কলঙ্কহীন দাঁতগুলিতে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল। বললাম, তোমার পরিচয় বল আগে, তোমার নামটাও তো জানতে পারিনি এখনো। সে বলল, আমার নাম না জানলেও আমার পরিচয় আপনি জানেন, অবশ্য যদি ১লা মে তারিখের পাত্রী গল্পটি পড়ে থাকেন। বিশ্বসুদ্ধ লোক জেনে ফেলেছে আমার পরিচয়।—বল কি? তুমিই পাত্রী?...সে তো আমি পড়েছি। কিন্তু পড়ে আমার মনে হয়েছিল সেটা গল্প। আর সে গল্পে তোমার নাম দেখেছি মিস রায়। হাঁ, আমিই—স্বাগতা রায়। কিন্তু ওটাকে আপনার গল্প মনে হল কেন? সবাই এটাকে সত্য মনে করেছে, আর সেজন্য আমি বিপদে পড়েছি, আপনি তাকে গল্প মনে করলেন? মায়াদিকে যা বলেছিলাম কনকর্দি তাঁর কাছ থেকে শুনে নিয়ে তার সবখানিই লিখে দিলেন, তা পড়ে আপনার গল্প মনে হল? তা হলে এই দেখুন—

স্বাগতা তার হাতের ব্যাগ খুলে তা থেকে ডজন খানেক চিঠি বার করে আমার সামনে রাখল। বললাম, চিঠি আমি দেখতে চাই না, কি ব্যাপার বল। স্বাগতা বলল, ঐ 'পাত্রী' পড়ে এঁরা আমাকে বিয়ে করবেন ইচ্ছা প্রকাশ করে এই সব চিঠি দিয়েছেন।

বল কি, এ তো বেশ ভাল কথা। একটাকে বেছে নাও, বিয়ে কর।...পাত্রী গল্পটিতে তোমার বিয়ের ব্যাপারে কিছু উদাসীনতা লক্ষ্য করেছি, বিয়ে যে করনি এত দিন তার জন্য তোমার স্বভাবই দায়ী মনে হয়েছে।

স্বাগতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। মুখে একটুখানি ব্যঙ্গের হাসি। তারপর বলল, দেখুন, আমার সব দোষ আমি স্বীকার করছি—আমি বিয়ের ব্যাপারে উদাসীন, আমি কাউকে পছন্দ করি না, যারা বিয়ে করতে চেয়েছে সবাইকে হটিয়ে দিয়েছি—সব মানছি।...কিন্তু আপনি আমার জীবনের বড় ট্র্যাজিডিকে গল্প বলে মনে করলেন কেন?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না,...তাই পালটা প্রশ্ন করলাম, তুমি শুধু এইটুকু জানবার জন্য কষ্ট করে এখানে এক অপরিচিতের কাছে এসেছ?

আমার প্রশ্নে সপ্রতিভ স্বাগতা সপ্রতিভ উত্তরই দিল। বলল আমি আপনার পরিচিত স্বীকার করেছেন। তেমনি আপনিও আমার পরিচিত আপনার নানা বিষয়ে চিন্তাশীল লেখার জন্য।...

ওটা চিন্তাশীলতার ধাপ্পা...কিন্তু তুমি কি শুধু চিঠি দেখাতে এসেছ, না কাউকে পছন্দ করে আমার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছ?

ওর কোনোটাই সত্য নয়। আমি যে জন্য এসেছি সেটা তর্কের ব্যাপার নয়।... আমার আসল ট্র্যাজিডি সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে, এবং তার পরিণাম ভাবতেও শিউরে উঠছি।...

নির্ভয়ে বল সব।

একটি যুবক আমাকে ভালবাসে।

সে তো আগেও অনেকে বেসেছে ঐ রচনা থেকে জানতে পেরেছি।

কিন্তু এবারে আমি তাকে ভালবেসেছি।

বিবাহের উপযুক্ত যোগাযোগ ঘটেছে তোমার জীবনে।...

কিন্তু আমার এত ত্রুটি, তা জেনেও তাকে কি করে ঠকাব এই প্রশ্নটা আমাকে এখন পাগল করে তুলেছে। আগে এতটা ভাবিনি।

সব তাকে খুলে বল।...

আমার ট্র্যাজিডিটা তো সেইখানে। সব খুলে বলতে পারছি না।

সাহসী হও।

যদি জানতেন, সে কি।

আমাকে অন্তত বল।

তা কাউকে প্রকাশ করতে পারছি না, এমনি ভীরু আমি। মনে হয় প্রকাশ করলে সেইখানেই সব শেষ হয়ে যাবে।

না, যাবে না। খুলে বল।

খুলেই বলি তবে।

স্বাগতা খুলেই বলল। মুখের ভিতর হাত দিয়ে সে দুপাটি দাঁতই খুলল এবং আমার টেবিলের উপর রেখে দুহাতে মাথা ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তারপর সে কোনো উপদেশ না নিয়েই দাঁত দুপাটি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি স্তম্ভিত। ওর ট্র্যাজিডিটা হৃদয়ঙ্গম করলাম। এরপর উপদেশ চাইলেও আর দিতে পারতাম না।

আমার এই লেখাটি ছাপা হওয়ার পরে কনকের নামে আর কোনো 'অফার' আসেনি পাত্রীটির জন্য। ভয় ছিল, আগে যেমন একটি বিবাহের বিজ্ঞাপনে বিবাহপ্রার্থী অনেকে চাকুরি প্রার্থীদের মতো দরখাস্ত পাঠিয়েছিল তার উল্লেখ করেছি, ভেবেছিলাম এ ক্ষেত্রেও তাই হবে, কিন্তু তা হয়নি। তার কারণ বোধহয় এই যে, 'পাত্রী' যে উচ্চশিক্ষিতা এমন আভাস ছিল ঐ গল্পে। তাই 'চাকুরির বিনিময়ে' বিয়ে করতে রাজি

অথবা ঘর জামাই হওয়ার শর্তে বিয়ে করতে রাজি, এমন আবেদন আসেনি।

এইভাবে এক একটা উপলক্ষ উপস্থিত হলে তা নিয়ে কৌতুক করা গেছে। কিন্তু তা যে সাধারণ পাঠকের গ্রহণযোগ্য হয়নি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সেই সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা অত্যন্ত শিথিল হয়ে পডাতে আমাদের পূর্বশিক্ষাজাত ব্যঙ্গকৌতুক ক্রমে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে, প্রাণ খুলে হাসির ক্ষমতা এবং প্রকৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এর জন্য দুঃখ করা বৃথা। তবে ইংরেজি ভাষায় যে ডিসিপলিন আছে, শব্দের ব্যবহারে, ইডিয়মের ব্যবহারে, বানানে, তার অনুকরণে, এবং সংস্কৃত শিক্ষার সহযোগে বাংলা ভাষায় যে শৃঙ্খলা গড়ে উঠছিল তা এখন সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। এখনকার ভাষা দুর্বোধ্য হচ্ছে আমাদের কাছে।

যখন ইংরেজি পডতাম তখন ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি বানান ও শব্দ বা ইডিয়মের ভুল ব্যবহারে সবাই লজ্জিত হয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করার পর তবে উদ্বেগ দূর হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। বাংলা ভাষার স্থান তখন দ্বিতীয় হলেও তার ভুল ব্যবহার ঘটতে দেওয়া হত না। তখন কোনো জিনিস বাতিল করে নতুন করে আরম্ভ করাকে কখনো "ঢেলে সাজানো" লেখা হত না, "ঢেলে সাজা" লেখা হত। ঢেলে সাজানো আমরা কখনো শুনিনি। ওটা কল্কের নিঃশেষিত-রস তামাকটুকু ঢেলে নতুন করে তামাক সাজার ব্যাপার। সকল বাড়িতেই তাই হত। 'ওরে তামাক সাজ' এই ছিল আদেশের ভাষা। কিংবা 'তামাক সাজি, বাবু?' ভৃত্যের কথা। ভৃত্যেরাও "তামাক সাজাই, বাবু" বলত না। এখন হঠাৎ দেখি "ঢেলে সাজানো" কথাটা চলতে আরম্ভ করেছে, এর পর 'পান সাজাও' বা পান 'সাজিয়ে দাও এলো বলে। কেউ একবার লিখলেই হয়। "প্রশ্ন রাখা" বাংলা নয়। অথচ সবাই লিখছেন বা বলছেন 'আমি একটি প্রশ্ন রাখছি', কিংবা 'আমি একটি প্রস্তাব রাখছি'। এ ভাষা ব্যবহারকারীরা প্রশ্ন-রক্ষক বা প্রস্তাব-রক্ষক হয়েছেন এখন। কিন্তু এতে ভাষাটাই শুধু রক্ষা করা যাচ্ছে না। সবাই এখন question keeper অথবা proposal keeper হয়েছেন কিনা?

যখন সম্পাদক ছিলাম

ফলশ্রুতি যে ফল নয় তা পাঁচ বছর আগেও পণ্ডিত বা মূর্খ সবাই জানত। হঠাৎ, কথাটা বেশ শোনায় ভেবে, কে ঐ অর্থে, অর্থাৎ ফল অর্থে ফলশ্রুতি প্রথম লিখলেন, এখন অনেকেই তার অনুকরণ করছেন। অভিধান দেখার দরকার নেই এখন। তৃতীয় শ্রেণীর অজ্ঞ গ্রাম্য যাত্রীদের দেখেছি ট্রেন এসে থামল, কোনো কামরা খুলে যাত্রী নামল. সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে তৃতীয় শ্রেণীর যত যাত্রী ছিল সবাই হুটোপুটি করে সেই কামরায় উঠতে লাগল, পাশের কামরা খালি, সে দিকে কারো লক্ষ্য নেই। ভাষার ব্যাপারে এখন যারা ঐ একজনের ভুল ব্যবহার দেখা মাত্র দরজা খোলা পাওয়া গেল মনে করে মত্ত হয়ে উঠছে, তারাও ভাষার ক্ষেত্রে ঐ তৃতীয় শ্রেণীর অজ্ঞ গ্রাম্য যাত্রী। এরা বোঝালে বোঝে না।

আগের দিনে ভুল দেখিয়ে দিলে ভ্রান্ত লজ্জিত হয়ে সংশোধন করত, এখন ভুল দেখিয়ে দিলে বলে "বেশ করেছি আরো করব।" আকাশবাণীর এ বিষয়ে অপরাধ সবচেয়ে বেশি। একেবারে নিরঙ্কুশ, কাউকে এঁরা গ্রাহ্য করেন না। যুগান্তরের 'বৈতারিক' রমেন মজুমদার বৈজ্ঞানিক চিন্তায় অভ্যস্ত, তথ্য, ভাষা বা উচ্চারণ বিষয়ে যথার্থ সত্যাগ্রহী।—বেতার সমালোচনা তিনি অনেক দিন করছেন, ছাপার অক্ষরে সব রয়ে গেছে। কিন্তু ফল কি হচ্ছে? 'ফলশ্রুতি' তো আজও ঘুচল না আকাশবাণীর। 'অবদান' শব্দের অপব্যবহারেও শ্রুতি নষ্ট হবার উপক্রম।

আকাশবাণীর বাংলা বিভাগ থেকে যে দুঃসাহসী ব্যক্তি প্রেরণা অর্থে অবদানের ব্যবহার, ফল অর্থে ফলশ্রুতির ব্যবহার এবং পারমাণবিক অর্থে আণবিক শব্দের ব্যবহার বন্ধ করতে পারবেন, তিনি জাতির নমস্য হবেন, ইতিহাসে তাঁর নাম থাকবে, এ কথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি। এই শুভ কাজের আরম্ভ কে করবেন জানি না। তবে শুনেছি অপপ্রচার-কারীদের 'একটা ভ্যানিটি' আছে তাই তাঁরা অন্যের কথা শোনেন না। হতে পারে, কিন্তু ভ্যানিটিটা আমাদের টাকায় না প্রদর্শন করলেই আমরা বাঁচি।

ডিসিপলিন হারিয়ে এই দুর্দশা। বাঙালী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় চতুর্থ শ্রেণীতে নেমেছে কেন অনুমান করা কঠিন নয়। অন্য রাজ্যের ভাষায় এই নৈরাজ্য নেই। হিন্দি ইউনিফর্ম—সংবাদ বলা

অনেক উচ্চাঙ্গের। বাংলা সংবাদ নিম্ন শ্রেণীর। উচ্চারণ, শব্দ প্রয়োগ অশুদ্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এটি দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিন্তু অনিবার্য, কারণ ডিসিপলিন নেই। ও জিনিস আর ফিরে আসবে বলে বিশ্বাস করি না।

দুঃখটা অবশ্য অভ্যাসবশত। এবং তা এ যুগের বাঙালী হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে। এমন আত্মধ্বংস এই ভারতবর্ষেরই অন্য রাজ্যে বিরল।

পিছন ফিরে চাইলে আর একটি বিষণ্ণ মূর্তি মনে পড়ে। জগদীশচন্দ্র গুপ্তের সেই ম্লান চাহনি, চরম দুঃখ সহ্য করেও সে বিষয়ে একটি অভিযোগ না করা। লেখা চাওয়া মাত্র নিজে আমার বাড়িতে এসে দিয়ে গেছেন। দরিদ্র অবস্থাতেই তিনি প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়ে গেছেন, শেষ জীবনে দারিদ্র্য আরো কঠোর হয়ে উঠেছিল, আর সে জন্য স্বাস্থ্যও তাঁর অপটু দেখেছি খুবই। এমন একটি মানুষ সাহিত্য ক্ষেত্রে বিরল বলেই আমার মনে হয়েছে। তাঁর একখানি গল্প সংকলনের বইতে তিনি যে ভূমিকাটি লিখেছিলেন তার মধ্যেই তাঁর চরিত্র অনেকখানি প্রকাশিত। তাঁর প্রথম বই 'বিনোদিনী' প্রকাশ নিয়ে যে সব কথা বলেছেন তা একমাত্র তাঁর মতো মানুষের পক্ষেই বলা সম্ভব। তিনি বই প্রকাশ করেন নি শুনে এক সদাশয় ব্যক্তি জগদীশবাবুর হিসাব মতো ২৫০ টাকা দান করেছিলেন। জগদীশবাবু সে বিষয়ে লিখছেন বিনোদিনী ছাপা হওয়ার পর ৩০-৩৫ খানা বই নানা জনকে দিলেন, অবশিষ্ট হাজার খানেক বই প্যাকিং বাক্সের মধ্যে রয়ে গেল, পরে কীটেরা ধ্বংস করল সেগুলি। (স্বনির্বাচিত গল্প, ইণ্ডিয়ান অ্যাঃ পাবলিশিং।)

তিনি নিজের কথা বলতে গিয়ে একটিমাত্র অনুশোচনা করেছেন এই—

> লেখক এবং সামাজিক মানুষ হিসাবে আমার আর কোনো অনুশোচনা নাই, কেবল মানসিক এই গ্লানিটা আছে যে, কানুবাবুর শ আড়াই টাকা নষ্ট করিয়াছি।

কথাগুলি কান্নার মতো শোনায়। জগদীশ গুপ্ত আমার অপেক্ষা ১১ বছরের বড় ছিলেন, তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৮৬ সনে। তাঁর চেহারার মধ্যে একটা অতি শান্ত সমাহিত ভাব ছিল। সেই মূর্তিটিকে যথার্থ শ্রদ্ধেয় রূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য আমি তাঁর অনেকগুলি ফোটোগ্রাফ তুলেছিলাম, এবং যেখানা আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল সেখানা তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৫৭তে বিশ্বভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। আমার ধারণা তাঁর চেহারার

উপযুক্ত মর্যাদা আমি দিতে পেরেছিলাম। সে ফোটোগ্রাফের অনুকরণে আঁকা একটি লাইন-ড্রইং দেখলাম তাঁর স্বনির্বাচিত গল্পের সংকলন গ্রন্থে।

জগদীশবাবু একটি ছন্দে লেখা গল্প আমাকে ছাপতে দিয়েছিলেন, সে গল্পটি আমি ভুলব না, অন্যত্রও উল্লেখ করেছি। বর্তমান ধনিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ। এবং তা এমনই বাস্তব যে ব্যঙ্গ সাহিত্যে এ গল্পের একটি বড় স্থান অধিকার করার ক্ষমতা আছে। আমার 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' নামক বইতে সেটি উল্লেখ করেছি। মূল গল্পটা ছিল এই রকম: অভাবে পীড়িত হয়ে যারা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছে তাদের একজনের কাছে গিয়ে দুস্থ আবেগপূর্ণ ভাষায় তাকে ধিক্কার দিল। বহুক্ষণ বলার পরে তার মনে হল তার ধিক্কারে কাজ হয়েছে। সে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যাকে সে তার কথা শোনাল, সে তার গালে এক চড় মেরে তার শেষ সম্বল পরনের কাপড়খানিও কেড়ে নিল।

অভাবের কথায় মনে পড়ল ১৯৫৭ সনে এক কবির অনাহারে আত্মহত্যার কথা কাগজে পড়ে আধুনিক কবিতা নিয়ে তখন কিছু আলোচনা করেছিলাম। খবরটা ছিল—বীরভূমের আজিবর রহমান নামক কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন, এবং আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয় এই কথাগুলি কবিতায় লিখে রেখে গেছেন। আত্মহত্যার কারণ, অভাব। আমি লিখেছিলাম—

> বীরভূমের আর এক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শেষের কবিতায় একটি ট্র্যাজিডি রচনা করেছেন, তা উপভোগ্য, সাহিত্য হিসাবে। কিন্তু বীরভূমের এই কবির শেষের কবিতাটি মর্মান্তিক।...
>
> সাধারণভাবে কবিদের এই দুর্দশা কেন, তা ভেবে পাওয়া যায় না। কবি সাধারণ মানুষের রসবোধ তৃপ্ত করার জন্যই কবিতা লেখেন। যে আনন্দ বেদনা তাঁদের মনকে নাড়া দেয় তা তাঁরা আর সবার সঙ্গে ভোগ করতে চান বলেই তো কবিতা লেখেন। মানুষের রসক্ষুধা এতে তৃপ্ত হয়। দেহের ক্ষুধার মতো মনেরও ক্ষুধা আছে, দুইয়েরই খাদ্য দরকার। তাই সংসারে আটা আর চালের সঙ্গে সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পের আবির্ভাব ঘটেছে। এর কোনোটাই তুচ্ছ নয়।
>
> কথা উঠতে পারে যে যুগে পেটে খাওয়ার অন্ন নেই, সে যুগে মনের খাদ্যের কথা চিন্তা করা ভাববিলাসীর কাজ। কিন্তু এটা কাজের কথা নয়। মানুষ যখন খায়...তখন কি সে কেবলই খেতে থাকে? কিংবা কবি বা শিল্পী তাঁদের কাজে মেতে বহুকাল খাওয়ার কথা একেবারেই ভুলে থাকেন? কাব্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে কবিকে খেতে হয়, শিল্পীকে

খেতে হয়। তেমনি যাঁরা খাদ্যই একমাত্র সত্য জ্ঞান করেন, তাঁদেরও নিয়মিত মনের খাদ্যের ব্যবস্থাও করতে হয়।

·একমাত্র কাব্যেরই এ সবের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিছু বা কবিদের দোষে, কিছু বা পাঠকের রুচি বিকারে, আমাদের কাব্য আজ তার অনেকখানি মর্যাদা হারিয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক অনেক কাব্য। আধুনিক এইসব কাব্য অনেক সময়েই দুর্বোধ্য। দুর্বোধ্যতা অবশ্য অনেক কাব্য স্বভাবতই হয়। রবীন্দ্র-কাব্যও অনেক স্থানে সহজবোধ্য নয়। এই দুর্বোধ্যতা কাব্য বা চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটি অনিবার্য ঘটনা, একে অস্বীকার করবাব উপায় নেই। অনিবার্য এ কারণে যে, শিল্পী বা কবি আত্মপ্রকাশে যথেষ্ট নিপুণ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অনেক সময় সম্পূর্ণ প্রকাশ কবতে পারেন না। এবং তাব মধ্যেও যে ইঙ্গিতটুকু রেখে যান তাও অনেক সময় ধবা যায় না। নানা জনে নানাভাবে তার ব্যাখ্যা করেন।···

কিন্তু যেহেতু কাব্যে এই দুর্বোধ্যতা কাব্যেব একটি অনিবার্য অংশ, সেইহেতু দুর্বোধ্যতাই কাব্য এমন ধারণা অনেকেব মনে বদ্ধমূল হয়েছে। তাই অনেক কবি স্বেচ্ছায দুর্বোধ্য করেই কাব্য বচনা কবেন এলোমেলো কতগুলি কথা সাজিয়ে।

এই ভাবে কাব্য মিউজিক হারাচ্ছে এবং তা ক্রমে দুর্বোধ্য গদ্য হয়ে উঠছে। অন্য দেশে আধুনিক কবিতার মান অনেক উঁচু হওয়া সত্ত্বেও সেখানেও এ জাতীয় কবিতা নিন্দিত। আধুনিক শক্তিশালী কবিদের কথা বলছি না, অক্ষমদের কথা বলছি। ১৯৫৭ সনের ২৭শে অকটোবরের ইতস্ততঃতে একটি ইংরেজি মন্তব্য (সেও কবিতায় লেখা!) উদ্ধৃত করেছিলাম, সেটি এখানে পুনরায় উদ্ধৃত করছি—এক শতাব্দীর ইংরেজি কাব্য সমালোচনা, অদ্ভূত বিশ্লেষণ (ট্রোকেইক ও আয়াম্বিক ছন্দে পঠিতব্য)।

THE LAST HUNDRED YEARS

So much poetry	Such bad poetry
Of their time	Dolled up in verse.
Was bad prose	But our age
Dolled up in rhyme.	Who could suppose !—
The nineties went	Such bad prose
From bad to worse,	Dolled up in prose.

R. Batas

(Times Literary Supplement, June 18, '954)

কথাগুলি সবারই ভেবে দেখা উচিত।

যখন সম্পাদক ছিলাম—এ পুস্তকের নাম। অভিজ্ঞতা সবই কিছু

কিছু বলা গেল। বর্তমান সাময়িকী সম্পাদক—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আমি অবসর গ্রহণের পর, আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিবশত আমার ছেড়ে-আসা চেয়ারখানায় সে বসেনি—তার একটি স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেল (১৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

আমার তা পড়ে মনে হয়েছে আমি তা হলে তো অদ্যাবধি সেই চেয়ারেই বসে আছি, এবং সেইখানে বসেই ইতস্ততঃ নামক সম্পাদকীয় লিখে চলেছি সবাইকে নিয়ে বসে। আমার মন থেকে তারা কেউ দূরে সরে যায় নি। সেই ভূষণচন্দ্র দাস, দ্বারেশ শর্মাচার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সবাই কাছে বসে আছে। এমন কি পাশের ঘরে সিনেমা সমালোচনা লেখায় রত মহেন্দ্র সরকারকেও মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ভূত অনেক সময় ছেড়ে আসা বাড়িতে হন্ট করে, মায়া ছাড়তে পারে না, আমি ভূত-পূর্ব অবস্থাতেই তাই করছি, পোস্ট-ভূত অবস্থায় কি করব জানি না। তবে অনেকের ঘাড় মটকাবার ইচ্ছা আছে, এইটুকু মাত্র পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব।

সংশোধন

১৩ পৃঃ ১৩ সংখ্যক লাইনে—'আর. জি. কর'-এর স্থলে 'ন্যাশন্যাল' পড়তে হবে।

১০৬ পৃঃ শেষ লাইনের আগের লাইনে—'এই অর্থ ও ভঙ্গি'র স্থলে 'এই কর্ম ও ভঙ্গি' পড়তে হবে।

১৩৮ পৃঃ ৯ সংখ্যক লাইনে—'পালিশ কথা'র স্থলে 'পালিশ করা' পড়তে হবে।

১৭১ পৃঃ চিঠির নিচের ঠিকানায় 'দরদরেন' আছে, ওটা দরদয়েন হবে।

(পূর্বেই এইগুলি বইতে সংশোধন করে রাখলে ভাল হয়। অন্যান্য কয়েকটি ভুল উল্লেখযোগ্য নয়)।

সংযোজন

২৬৬ পৃষ্ঠা : 'পঞ্চম রূপান্তর' নামক অনুচ্ছেদের সঙ্গে এই মন্তব্যটি পড়া যেতে পারে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা নামক গল্পের একস্থানে রামকানাইয়ের স্ত্রীর চিন্তাকে ভাষা দিয়ে লিখেছেন, 'কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী. অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া আসিয়া' ইত্যাদি। আসল কথাগুলি হতে পারত : 'কোথা হইতে এক চোখখাকী ভাতারখাকী আঁটকুড়ির বেটি' ইত্যাদি। তবে আসলের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের এই ভদ্রভাষায় অনুবাদ, মনে হয় কৌতুককর হয়েছে আরো বেশি। ভাতার লিখতে সঙ্কোচ হওয়াতেই সবগুলি গ্রাম্য প্রচলিত শব্দই সাধুভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

২৭১ পৃষ্ঠার শেষে এটি পড়া যেতে পারে : ২৮-৪-৭২ তারিখের খবর—হিন্দু হস্টেলের বার্থ রুমে শর্ট গান পাওয়া গেছে।

পরিমল গোস্বামী রচিত চতুর্থ স্মৃতিগ্রন্থ

প ত্র স্মৃ তি

৭৫ জন পত্র লেখকের ৩৫০ পত্র বা পত্রাংশ ঘিরে লেখকের বিচিত্র স্মৃতি ৩৬ খানা পূর্ণ পৃষ্ঠা ফোটোগ্রাফ সহ মূল্য ২২ টাকা

"পরিচয়ের কী বিরাট পরিধিতে হৃদয়ের সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ!"



"আগের তিনখানা স্মৃতিমূলক বই নিলে...এদের মিলিত রূপ আমার মতে রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজের চেয়েও বেশী।"



"অজস্র টুকরো খবর ছড়িয়ে আছে বইয়ের পাতায় পাতায়, আর সে সব টুকরো মিলিয়ে বিচিত্র এক মোজেইক।"



"এ কালের পাঠক অনেক নতুন তথ্য পাবেন। চিঠিপত্র, ছবি, দলিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রবৃত্তি বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে দুর্লভ। এই দুর্লভ গুণের অধিকারী হিসাবে গবেষক মাত্রেই পরিমলবাবুকে ধন্যবাদ জানাবেন।"



"অননুকরণীয় ভঙ্গীতে, কলমের দু একটি আঁচড়ে এক একটি চরিত্রের অন্তরঙ্গ দিক...অনেক ক্ষেত্রেই যে সব দিক অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যেত। এই সমস্ত তথ্য ও ইতিহাসকে অতিক্রম করে মনকে প্রসন্ন করার ক্ষমতা রাখে।"



"বিচিত্র ধরনের স্মৃতি মেলে ধরতে ধরতে লেখক আপন কথায় পাঠককে আবিষ্ট করে রাখেন।"

RUPA & CO.  **CALCUTTA-12**

প্রমথনাথ বিশী (যুগান্তর, ২৬-৯-৭১)

এমন সুমুদ্রিত, সুসজ্জিত, সুচিত্রিত (অর্থাৎ সুন্দর চিত্রযুক্ত) বাংলা বই বিরল। এ বই স্থায়ী হবে এবং ভাবীকালের ঐতিহাসিকগণ ঋণ স্বীকার করে (কিংবা না করে) এ বই থেকে উপাদান সংগ্রহ করবেন। লেখক অতি সাংঘাতিক লোক। দীর্ঘ, হ্রস্ব, এমনকি একটি-ছত্র-মাত্র-সম্বল চিঠিও সযত্নে রক্ষা করেছেন। গ্রন্থকার এমনিভাবে কতজনের অনিচ্ছাকৃত স্বীকৃতি যে সংগ্রহ করে রেখেছেন কে জানে? পত্রলেখকেরা জানলে সতর্ক হয়ে লিখতেন। এদের অনেকে নিজ গৌরবে স্থায়ী, অনেককে লেখক স্থায়িত্ব দিয়েছেন। পত্রের সঙ্গে মন্তব্য থাকাতে প্রত্যেক পত্র-লেখক সজীব হয়ে উঠেছেন। আগের আরও তিনখানা স্মৃতিমূলক বই নিলে চারখানা বইএ একটি দীর্ঘ যুগের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এদের মিলিত রূপ আমার মতে রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজের চেয়েও বেশী। শিবনাথ শাস্ত্রীর মুনশিয়ানা আছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ইতিহাস লিখেছেন, অথচ তাতে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের নাম নেই। প্রথম দুজন না হয় ব্রাহ্ম নন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সন্তান, পরিমলবাবু সে রকম বাছবিচার করেন নি। আদ্বিজ-চণ্ডাল সকলকে কোল দিয়েছেন।...

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (চিঠি, ১৩-১০-৭১)

আপনার বই পড়তে সুরু ক'রে সাধ্য কী একটি লাইন থেকেও মনোযোগ স্খলিত হয়। পরিচয়ের কী বিরাট পরিধিতে আপনি আপনার হৃদয়ের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন! সুখে-দুঃখে মেশানো কত বিচিত্র তথ্য আর কী স্নিগ্ধ সুন্দর প্রীতিপূর্ণ পরিহাস। পড়ছি আর আপশোস হচ্ছে প্রথম বয়সে কেন আপনার সন্নিহিত হইনি। হলে আর যাই না হোক আপনার হাতে হয়তো উজ্জ্বল একটা ছবি হতে পারতাম।...

শ্রীপান্থ ('বিশেষ বই' আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই মার্চ ১৯৭২)

পত্রলেখকেরা সকলেই সমান মাপের নন, চিঠির বাণ্ডিলের ওজনেও সকলে সমান ওজনদার নন। বিখ্যাতরা যেমন আছেন, আছেন তেমনই অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাতরাও। কেউ চিঠি লিখছেন এই কলকাতারই অন্য পাড়া থেকে, কেউ বিদেশ থেকে, কেউ বা পাহাড়-শীর্ষ থেকে। সবাইকে নিয়ে আশ্চর্য এক সমাজ। কলকাতার প্রকাশ্য সাহিত্য-জগতের নেপথ্যে এক আণ্ডারগ্রাউণ্ড আড্ডা যেন, কত কথায় কত ভাবের লেনদেন সেখানে। পরিমলবাবুর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, সেই আড্ডার সবাইকে তিনি একবার উঁকি মেরে দেখার সুযোগ দিলেন।

তা না হলে আমরা কেমন করে জানতে পারতাম বড়মা হেমলতা দেবী, এক সময় একটি বার্ষিক সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন—সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের চটি জোড়া চুরি করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সমালোচনামূলক একটি চিঠি না ছাপার দক্ষিণা হিসাবে লেডি অবলা বসুর কাছ থেকে নগদ কুড়ি টাকা আদায় করেছিলেন। কিংবা বাসব ঠাকুর বিয়ের দু' এক বছরের মধ্যে স্ত্রীর নাম ভুলে গিয়েছিলেন।

এ-জাতীয় অজস্র টুকরো খবর ছড়িয়ে আছে বইটির পাতায় পাতায়। আর সে সব টুকরো মিলিয়েই বিচিত্র এক মোজেইক। এই নক্‌শার প্রধান শিল্পী, বলা নিষ্প্রয়োজন, শ্রীপরিমল গোস্বামী স্বয়ং। এই বইয়ে যে শিল্পী সাহিত্যিক সমাজ, তিনি তার সমাজপতি। তবে স্মৃতিচিত্রণের মত এবারও অলক্ষ্যে থাকার চেষ্টা করেছেন যথাসাধ্য। কিন্তু ধরা পড়ে যাচ্ছেন যথাপূর্ব।

'ফ্রম দি হেড মাস্টার' মার্কা কাগজে বিভূতিভূষণ তাঁকে চিঠি লিখলেন—'আপনার চিঠিখানা আমার কাছে রাখবো না, মনে কষ্ট হয় তাই চিঠিখানাই ফেরৎ দিলুম। বন্ধুর দক্ষিণ মুখই দেখতে চাই কিনা, তাই।' পরক্ষণেই মান অভিমানের পালা শেষ। বিভূতিভূষণের আর এক চিঠি—'বিশ্বাস করুন, একখানা চিঠিও পাইনি। মাইরি বলছি।' অপ্রতিরোধ্য শশিশেখর বসুর কথা—'আপনি ব্রাহ্মণ আমাদের প্রণম্য। আরও কিছু দিন ইয়ারকি দিয়ে তবে তুমি বলবো।' 'মতিলাল' গল্প প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের উক্তি—'ফলে এখন মতিলালের গাঁজার খরচ জোগাতে হচ্ছে।' সুখ্যাত ভারতীয় নীরদচন্দ্র চৌধুরীর চিঠির পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী অমিয়া দেবীরও চিঠি আছে কয়েকখানা। অতিশয় অন্তরঙ্গ, উপাদেয় চিঠি। একটিতে তিনি লিখছেন—'অত করে বিলিতি কাগজে লেখা চিঠিখানাই হারিয়ে গেল। অবশ্য আপনার বন্ধুরই ইচ্ছায় ঐ কাগজে লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম...হাজার হলেও ১২ বছরের বড় পণ্ডিত মানুষ, গুরুজনও বটে, তাই আর অবাধ্য হতে পারলাম না।'

পত্রলেখকদের মানসিকতার ধারাটি যেমন বোঝা যায়, তেমনই স্পষ্ট হয়ে ওঠেন শ্রীপরিমল গোস্বামী নিজেও। শরদিন্দু তাঁকে বলেছেন—স্মৃতিদিগ্‌গজ। বনফুল তাঁকে নিয়মিত স্নেহ চুম্বন পাঠাচ্ছেন। 'মুরগি-পুষ্ট ছুটি',...'নু'য়ে ভাজা খাস্তা কয়েকটা'...'ঈষৎ বৃষ্টিসিক্ত খরাচুম্বন এক লক্ষ টন।' ইত্যাদি। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁকে ফাঁকি দিতে গিয়ে ব্যর্থ। রাজশেখর

বস্তুর সঙ্গে লেখক আণবিক পারমাণবিক নিয়ে আলোচনা করেন, ব্যাসিলাস, ব্যাকটিরিয়াম নিয়ে তর্ক করেন। বানান এবং শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে তিনি যেমন আপসহীন ঠিক তেমনই অযুক্তি কুযুক্তির বিরুদ্ধেও তাঁর বেপরোয়া লড়াই। বইটিতে তারও নমুনা আছে কিছু। যথা: বারীন ঘোষের বিবাহ কিংবা ভারতীয় চিত্রের ভাষা প্রসঙ্গ অথবা মুজতবা আলির একটি ভাষণের সপক্ষে সওয়াল। পরিমলবাবু প্রমাণ করেছেন... তিনি সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী।...

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯)

পরিমল গোস্বামী তাঁর লেখক ও সম্পাদক-জীবনের চিত্তাকর্ষক স্মৃতিকথা লিখেছেন চার খণ্ডে। পত্রস্মৃতি চতুর্থ এবং এ পর্যন্ত প্রকাশিত শেষ খণ্ড। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি যথাক্রমে স্মৃতিচিত্রণ, দ্বিতীয় স্মৃতি এবং আমি যাঁদের দেখেছি।

স্মৃতি-সাহিত্যে পত্রস্মৃতি এক অভিনব সৃষ্টি। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে যে-সব চিঠি পেয়েছেন, তাদের কেন্দ্র করে কতকগুলি উপভোগ্য স্মৃতিচিত্র রচনা করেছেন লেখক। এই সব চিত্রের পরিবেশ কোথাও কৌতুকের, কোথাও বৈদগ্ধ্যের, কোথাও-বা সাহিত্যরসের। মালার সুতোর মতো লেখক নিজে প্রায় অদৃশ্য থেকে এই বিচ্ছিন্ন স্মৃতিচিত্রের মিছিলের মধ্যে একটি সংহত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রিয়জনের কাছে চিঠি লেখবার সময় মনের মুখোশটা খুলে রাখি; যে লেখা ছাপা হবে, অনেকের হাতে পৌঁছবে, তা লিখতে বসে মুখোষটা পরে নিতে হয়। চিঠিপত্রে নির্বাধ মনের প্রকাশ পাওয়া যায় বলেই জীবনীকারের নিকট এদের বিশেষ মূল্য। চিঠিপত্রে এমন পরিচয় ধরা পড়ে যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। আলোচ্য গ্রন্থে এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও অমিয়া চৌধুরানীর পত্রাচার থেকে। নীরদবাবুর ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনা থেকে পাঠকের মনে তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণার সৃষ্টি হয়, এই কটি চিঠি তা বদ্‌লে দেয়। এখানে তাঁর অন্য পরিচয়। চিঠির মধ্যে ধরা পড়েছে তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব, আমাদের অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন তিনি।...

পত্রস্মৃতির লেখকও নিশ্চয় এমন এক স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী যার আকর্ষণে বহু লেখক, সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী, নাট্যশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, জাদুকর, পর্বতারোহী, শিকারী প্রভৃতি বিচিত্র শ্রেণীর মানুষ তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। বিখ্যাত, স্বল্পখ্যাত, অখ্যাত—সকল

পত্রলেখকের প্রতিই লেখকের সমান দৃষ্টি, সকলকেই সমান মর্যাদা দিয়েছেন তিনি।

পত্রচারীর লেখকসত্তা বা শিল্পীসত্তা উদ্‌ঘাটনের অথবা তাঁর জীবনের ঘটনাপঞ্জী বিবৃত করার কোনো চেষ্টা এখানে নেই। বড় বড় সমালোচনা ও জীবনীগ্রন্থ থেকেই তা পাওয়া যাবে। অন্যত্র যা পাওয়া যাবে না এমন দু-একটি কথার সাহায্যে পত্রলেখকের চরিত্রের কোনো-একটি দিক উদ্ভাসিত করা হয়েছে। সুতরাং এদিক থেকে পত্রস্মৃতিকে চরিত্রচিত্রশালা বলা যেতে পারে।

পরিমলবাবু হাস্যরসাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত। সুতরাং স্বাভাবিকরূপেই এ বইয়ের সর্বত্র অনেকগুলি ছোট ছোট হাসির কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁদের কোনো দান আছে তাঁদের অনেকেই কোনো-না-কোনো রূপে পত্রস্মৃতিতে উপস্থিত আছেন। এই পঞ্চাশ বছরে বাংলার শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তার টুকরো টুকরো পরিচয় পাওয়া যাবে পত্রস্মৃতি থেকে। এ কালের পাঠক অনেক নতুন তথ্য পাবেন।

কারো জীবন সম্বন্ধে লিখতে হলে বাঙালি লেখকেরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। সত্য হলেও অপ্রিয় হবার আশঙ্কায় অনেক কথাই এড়িয়ে যান। পরিমলবাবু তা করেননি। যা জেনেছেন তা বলেছেন। অথচ সেই বলার মধ্যে কোথাও শ্রদ্ধাহীনতার প্রকাশ নেই। বরং যেভাবে বলেছেন তাতে চরিত্রচিত্রণ উজ্জ্বলতর হয়েছে। ব্যক্তিকে ঋষি বা অতিমানব করে দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় জীবনীকারদের মধ্যে এবং সেইজন্যই হয়তো পাশ্চাত্য সাহিত্যের জীবনীগ্রন্থের মতো বাংলা জীবনীগ্রন্থের আবেদন গভীর হতে পারে না। কোনো দ্বিধা না করে পরিমলবাবু নামী লোকের জীবনের সহজ সত্য কথা সুন্দরভাবে বলেছেন দেখে ভালো লাগলো।

উপন্যাস নয়, রহস্যকাহিনী নয়, তথাপি প্রায় সাড়ে চার শো পৃষ্ঠার বইটি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আগ্রহ নিয়ে পড়া যায়। লেখক নিজের জীবনকে প্রাধান্য দিলে একঘেয়েমি এসে যাবার আশঙ্কা ছিল। এ জাতীয় রচনায় নিজেকে যতটা পশ্চাতে রাখা যায় লেখক তাই করেছেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা পত্রালাপ করেছেন তাঁদের বৃত্তিগত ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের বিচিত্রতার জন্য পাঠক নতুনত্বের স্বাদ পান প্রতি পরিচ্ছেদে। তথ্য, কৌতুক ও গল্পরসে সমৃদ্ধ এই রচনা পাঠকের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে।

লেখকের ভাষা সাবলীল, বলবার ভঙ্গিটিও মনোরম। মনে হয় যেন

আড্ডা দিতে বসে গল্প শুনছি। রচনার এই বৈশিষ্ট্যও পাঠককে কম আকৃষ্ট করে না।

চিঠিপত্র, ছবি, দলিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রবৃত্তি বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে দুর্লভ। এই দুর্লভ গুণের অধিকারী হিসাবে গবেষক-মাত্রেই পরিমলবাবুকে ধন্যবাদ জানাবেন।

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় (মাসিক বসুমতী, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৭৯)

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে এঁকে যায় কেউ জানে না কিন্তু স্মৃতির পটে যে সব চিঠি এসে জড়ো হয়, হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের নাম-ঠিকানা-সন-তারিখ সমস্ত জানা থাকে এই একটি মস্ত সুবিধে। সত্য ঘটনা গল্পের চেয়ে সব সময়ে রোমাঞ্চকর নাও হতে পারে, কিন্তু কিছু কিছু চিঠির মধ্যে একই সঙ্গে পাওয়া যেতে পারে সত্য ও কল্পনার স্বাদ, উপন্যাসের চেয়েও তার আবেদন অনেক অংশে বেশি।...অকথিত ঘটনা ও তথ্য ছাড়াও চিঠির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে সমকালের ইতিহাস। এ ছাড়া আর একটি কারণে চিঠির আবেদন উপন্যাসের চেয়েও বেশি হতে বাধ্য। অন্যের কথা আড়ি পেতে শোনার যে দুর্বলতা আমাদের মজ্জাগত তাতে ইন্ধন দেবার এর থেকে ভাল উপায় আর কিছু নেই।

পরিমল গোস্বামীর স্মৃতি পর্যায়েব চতুর্থ বই হলেও আগের তিনটি বইয়ের সঙ্গে পত্রস্মৃতির একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। এখানে...৩৫০ খানি পত্রের কাঠামোর উপর তিনি রচনা করেছেন তাঁর স্মৃতি-সাহিত্য। অননুকরণীয় ভঙ্গীতে, কলমের দুএকটি আঁচড়ে এক একটি চরিত্রের অন্তরঙ্গ দিক আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই যে সব দিক অনুদ্ঘাটিত থেকে যেত, সে দিক দিয়ে পরিমল গোস্বামী ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হলেন।...

চিঠির সূত্র ধরে যেমন কৌতুককর অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে, তেমনি সিরিয়াস প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি। আজ থেকে ৬০ বছর আগে জাতিভেদ নামক বই লিখে দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য যে প্রবল চাঞ্চল্য তুলেছিলেন তাকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে টেনে তুলে আনা, ভুল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ব্যবহার...ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেকটি চিঠি এক একটি হিমশৈলের সঙ্গে তুলনীয়। যে অংশটি উপরে আছে, তার থেকে অনেক বেশি আছে দৃষ্টির অগোচরে।...বিভিন্ন চরিত্রের এই সব চিঠিগুলির একটি যোগসূত্র বইটির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা দিয়েছে—সেই যোগসূত্র হল পরিমল গোস্বামীর ব্যক্তিত্ব।...এই জাতীয় বই বাংলায় পড়তে পাওয়া বিরল সৌভাগ্য বলা যেতে পারে।...

সমালোচনার ভাষা বহু ব্যবহারে জীর্ণ, সুতরাং এই বইটিকে 'উল্লেখযোগ্য' বললে কিছুই বলা হয় না। যাঁরা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রেমী, কিন্তু পড়বার মত বইয়ের অভাবে বুভুক্ষু হয়ে আছেন তাঁরা এই বই পেলে সঞ্জীবিত হবেন। এই বই সমস্ত তথ্য ঘটনা ও ইতিহাসকে অতিক্রম করে মনকে প্রসন্ন করার ক্ষমতা রাখে।···

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক (রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৯)

পরিমল গোস্বামী মহাশয় ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন এটি তাঁর স্মৃতি পর্যায়ের চতুর্থ পুস্তক। পূর্বের তিনটি হচ্ছে—'স্মৃতিচিত্রণ', 'দ্বিতীয় স্মৃতি' ও 'আমি যাঁদের দেখেছি'। তিনি লিখেছেন—'বর্তমান পত্রস্মৃতি অন্যগুলির থেকে স্বতন্ত্র। আমি যে ভাবে এ পুস্তকের পরিকল্পনা করেছি, সে রকম পুস্তক বাংলা ভাষায় সম্ভবত আর নেই।' তিনি কথাটি বলেছেন এই হিসাবে যে বাংলায় এ পর্যন্ত যে সব সংকলন যেমন রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র তা কেবল তাঁর লেখা চিঠিগুলিরই চয়নিকা। কিন্তু পরিমলবাবুর কাছে লেখা নানাজনের পত্র যেমন আছে তেমনি রয়েছে পত্রপ্রাপকের সেই পত্রলেখক সম্পর্কে রেখাচিত্র সরস বর্ণনায়। সব থেকে যা আশ্চর্য লাগছে তা হচ্ছে এই—তিনি কেবল নামীদের চিঠিই দামী বলে চয়ন করেননি অনামীদেরও অমূল্য স্মৃতিকণা উপস্থাপিত করেছেন। সেই হিসাবে যেমন বরেণ্য সাহিত্যরথী বা চিত্রকর-ভাস্কর্যশিল্পী রয়েছেন তেমনি যন্ত্রী বা জীবন-বীমার কারবারীও আছেন, বিশিষ্ট সম্পাদকও আছেন আবার অতি সাধারণ লেখকও রয়েছেন। এইসব মিলিয়ে একটা বৈঠকমজী নিয়ে পরিমলবাবু যেন চিঠির ঝাঁপি খুলে বসে এক-একটি চিঠি পড়ে চলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাসঙ্গিক স্মৃতিচারণাও করে চলেছেন। পাঠকও তৃপ্তি পাচ্ছেন স্মৃতির সুরভিসাগরে অবগাহন করতে পেরে।

পরিমল গোস্বামী রচিত তৃতীয় স্মৃতিগ্রন্থ

আমি যাঁদের দেখেছি

একুশ জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নতুন পরিচয়

তেইশ খানা ফোটোগ্রাফ ও অন্যান্য চিত্রসহ মূল্য বারো টাকা

'আমাদের সারা জীবনের কথাই যেন এতে ধরে দেওয়া হয়েছে।'



'একটি বিলুপ্তপ্রায় কালকে পরিমলবাবু ধরে রেখেছেন।'



'কঠিন সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করেছেন।'



'কথাশিল্পীর নিপুণতায় দেখা এবং জানা।'



'অনেক নতুন কথা নতুন ছবির রঙীন প্রলেপন।'



'জীবন চরিতের ছোট গল্প।'



'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এটি একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ।'



'শ্রেণীসাদৃশ্যে গার্ডনার কিংবা চেস্টারটনের সঙ্গে···মিল আছে।'



'একই সঙ্গে দ্রষ্টা এবং ইতিহাসস্রষ্টার পরিচয়।'



'সর্বদোষমুক্ত প্রাঞ্জল গদ্য রচনায় আজকের দিনে
বাংলাদেশে তাঁর জুড়ি প্রায় নেই।'



'দা ভিঞ্চির ছবির মানুষগুলির মতো লেখকের এই চরিত্রগুলিও
আত্মতায় স্পষ্ট, স্বাতন্ত্র্যে সুচিহ্নিত।'

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,

…প্রবহমান জীবনের মধ্যে যাঁদের ব্যক্তিত্ব আমাদের নাড়া দেয়, সহজ চোখে নিজের সংস্কৃতিপূত মন দিয়ে তাঁদের সেই ব্যক্তিত্বকে ধ'রে দেবার চেষ্টাকে প্রথমতঃ একটা অত্যাবশ্যক সামাজিক উপকার বলবো। "আমি যাঁদের দেখেছি" বইখানিতে…মিত্রবর শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী আমাদের আজকালকার সামাজিক আর বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের যে আলেখ্য দিয়েছেন সেটার উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করবেন, আর তার দ্বারা যে আমরা এই উপস্থিত কালে নিজেদের অনেকটা জানতে পারবো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।…যাঁদের তিনি দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলকেই আমিও দেখেছি, আর কতকগুলি ব্যক্তিকে অতি ঘনিষ্ঠভাবেও দেখেছি। নিজের মন দিয়ে হৃদয় দিয়ে বিচার ক'রে বলছি, পরিমলবাবুর সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই আমি একমত, আর যাঁদের কথা তিনি বলেছেন তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশন বা রূপায়ণ (ঠিক মূল্যায়ন বলবো না) অতি নিপুণ ভাবে আর সহানুভূতির সঙ্গেই তিনি করেছেন। আমাদের সারা জীবনের কথাই যেন এতে ধরে দেওয়া হয়েছে। Contemporary life and personalities আমাদের সমসাময়িক বা জীবৎকালের চিত্র, আমাদের সময়কার নামী আর কৃতী পুরুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যার মধ্য দিয়েই যুগের সংস্কৃতির প্রকাশ, তা পরিমলবাবুর বই থেকে সুন্দরভাবে উপভোগ্য-ভাবে পাওয়া যাবে—প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সঙ্গে পরিচয় তো হবেই, পরোক্ষভাবে লেখককেও বুঝতে সমর্থ হবো, আর তাঁর ব্যক্তিত্বের, তাঁর দর্শনশীল মানসনেত্র আর প্রদর্শনশীল আলোকচিত্র দেখতে পেয়েও তাঁর সাধুবাদ করব। বইখানির documentary value অর্থাৎ সাময়িক জীবনের নজীর প্রকাশন, এর একটি বিশেষ মূল্য আছে, আর সে দিক থেকে এই বইয়ের একটি মর্যাদা চিরকাল থাকবে।…

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী,

…খুব ভাল লাগল, অনেক কিছু জানতে পেরেছি তাঁদের সম্বন্ধে, যাঁদের সঙ্গে মিশেছি।…

জ্যোতির্ময়ী দেবী,

"বইখানা যেন জীবনচরিতের ছোট গল্প। ভার নেই জীবনচরিতের, কিন্তু জীবনের সুখ-দুঃখের মোহবেদনা-আশাহতাশা-আনন্দের সারটুকু সব আছে।"

লীলা মজুমদার,

…বইটা একটা সোনার খনি। এর মূল্য দিনে দিনে বাড়বে বই কমবে না। এসব কথা কে-ই বা জানে আজকাল, আর তোমার ঐ stark, bare, beautiful way-তে বলতেই বা পারে কজন ?…

ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (আকাশবাণী, ৩১শে মে, ১৯৬৯)

…একটি বিশেষ কারণেও এই বইটির দুর্লভ মূল্য আছে। এমন কয়েকজনের কথা পরিমলবাবু বলেছেন, জীবিত কালেও যাঁদের খ্যাতি একটি ছোট পাঠক গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাঁদের কথা আমরা প্রায় বিস্মৃত হয়েছি অথচ তাঁদের কথা বাদ দিলে গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্য ও সমাজের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। ইতিহাস লেখকেরা সম্পূর্ণ কর্তব্য পালন করেন নি। পরিমলবাবু সেই ত্রুটি গ্রন্থে ঢেকে দিতে চেষ্টা করেছেন।

দেশ

· বর্তমান গ্রন্থে তিনি যে মানুষগুলির স্মৃতি-আলেখ্য রচনা করেছেন তাঁদের অধিকাংশ নামই আমাদের কাছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক একটি অধ্যায়ের সমতুল।…নিপুণ আলোকচিত্রশিল্পী লেখক যেমন এঁদের প্রত্যেকেরই এক বা একাধিক দুর্লভ আলোকচিত্রের সমাবেশে বইটিকে আকর্ষক করে তুলেছেন ঠিক তেমনি ভাবেই যেন আবিষ্কার করেছেন প্রতিটি ব্যক্তিবীক্ষার এক আশ্চর্য ফোটোগ্রাফিক অ্যাংগেল।·· পরিমল গোস্বামী ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিচারণের সূত্রে সেই অমূল্য জীবন কাহিনী-গুলিকে বিবৃত করে এবং বহু প্রাচীন রচনার অংশ বিশেষ মধ্যে মধ্যে উপহার দিয়ে একটি কঠিন সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আগামী দিনে আলোচ্য পর্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই অমূল্য উপহার শ্রদ্ধার সঙ্গেই গৃহীত হবে।

কৃষ্ণ ধর

· ·যশস্বী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষকে তিনি কাছে থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। কথাশিল্পীর নিপুণতায় সেই দেখা এবং জানাকে শুধু ব্যক্তিগত আলাপ-চারিতায় সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি সম-সাময়িক ইতিহাসের দর্পণে রূপান্তরিত করেছেন।…

অমৃত

…অনেক নতুন কথা নতুন ছবির রঙীন প্রক্ষেপণ অতি রমণীয় এবং সহজেই মনকে টেনে নেয়।…সবগুলি আলোচনাই তথ্য ভারাক্রান্ত জীবন-

স্মৃতি না হয়ে হয়েছে মনীষী চরিত্রচিত্রের অভিনব অ্যালবাম। আচার আচরণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, চেনা মানুষকে যেন তা আরও নতুন করে তোলে। জীবনের অনেক খুঁটিনাটি তুচ্ছ ঘটনা, যার মধ্যে চরিত্রের বিশিষ্ট দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা অনিবার্য ভাবেই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। আর সবশেষে যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার তা হল লেখকের অননুকরণীয় ভাষা।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের এটি একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে এমন অদ্ভুত চমৎকার বই বাঙ্গলা ভাষায় কদাচিৎ দেখা যায়। এই বইয়ের অনেকগুলি বিশেষত্ব আছে। যেমন প্রথমতঃ সমসাময়িক বাঙ্গলা দেশের যে সমস্ত সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, লেখক ও শিল্পী (অভিনেতা) প্রভৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে লেখক এসেছিলেন এবং যাঁদের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ধারণা আছে, এই বইতে তেমন ২১ জনের কাহিনী আছে। দ্বিতীয়তঃ এগুলি ঠিক নিয়মিত জীবনচরিত নয়, জীবনের বিভিন্ন দিকের চিত্র এবং এই চিত্রগুলি বিভিন্ন ঘটনা ও গল্প উপলক্ষে লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তৃতীয়তঃ লেখক তাঁর এই জীবনচিত্রগুলিতে কোন প্রখ্যাত ব্যক্তিকেই সাধু বা মুনিঋষিরূপে দেখাতে চান নাই—রক্তমাংসের মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করেছেন। আমাদের দেশে নিঃসন্দেহে লেখকের পক্ষে এটা সৎসাহসের এবং জীবন সম্পর্কে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পুস্তকে বর্ণিত প্রত্যেকটি প্রতিভাশালী মানুষই তাঁর আপন ব্যক্তিচরিত্রের স্বাতন্ত্র্যে ও ঔজ্জ্বল্যে যেন এক একটি নক্ষত্রের মত ফুটে উঠেছেন। আলোচ্য বইয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ না করলে এর অভিনবত্বের পরিচয় সম্পূর্ণ হবে না। সেটা হলো—লেখকের স্টাইল, অন্য যে কোন সাহিত্যিকের তুলনায় যা একেবারে স্বতন্ত্র। যে হিউমার এবং লঘু ও চাপা ব্যঙ্গরস তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে, তাতে তাঁর স্টাইলকে একটা নতুন প্রাণ দিয়েছে। "আমি যাঁদের দেখেছি" বইটির বিষয়বস্তু অবশ্যই সীরিয়াস, কিন্তু লেখকের রচনাশৈলী এমন তীক্ষ্ম, স্বচ্ছ, লঘু এবং সরস যে, মনে হয় পাখীর ডানায় ভর করে লেখাগুলি মনের দিগন্তে উড়ে চলেছে।···

নারায়ণ চৌধুরী

···'আমি যাঁদের দেখেছি' নামক অপূর্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে লিখিত ব্যক্তিক রেখাচিত্রমূলক বইটিতে লেখকের যে গুণ আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে

তা হল তাঁর চিত্তের প্রসার, ঔদার্য, বন্ধুবাৎসল্য, এবং সর্বোপরি নানা বিচিত্র ও বিরুদ্ধ প্রকৃতির বড়ো মানুষদের নিয়ে একসঙ্গে চলবার ক্ষমতা।

আজ থেকে কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীর সময় সীমায় আবির্ভূত ও বিগত বাংলাদেশের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মানুষের বৃত্তান্ত ধরা আছে এই স্মৃতি-গ্রন্থে। গ্রন্থটির প্রধান আকর্ষণ নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক—যাঁদের নিয়ে বই তাঁদের সবাই সংস্কৃতি-জগতের লোক—কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্যও বড়ো কম নয়। দৃশ্যতঃ একের সহিত অপরের সংযোগবিহীন, কিন্তু কার্যতঃ পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত, এই বিচ্ছিন্ন খণ্ড চিত্রগুলির মধ্য দিয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করলে বাংলাদেশের গত এক শতাব্দীর একটি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ছবি গড়ে তুলতে পারেন। লেখকের খুঁটিনাটির প্রতি সযত্ন অনুসন্ধিৎসা এবং সাল-তারিখ ইত্যাদির তাক-লাগানো পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ বইটিকে প্রায় দলিল-মূল্য দিয়েছে, যদিও খতিয়ে দেখতে গেলে এটি একটি রসের বই।···

রসের বই, কেননা মানব-চরিত্রায়ণ এই বইয়েয় মুল লক্ষ্য। তাঁর অ্যালবামে গ্রথিত এক-একটি স্মৃতি-চিত্রণের মাধ্যমে লেখক বিচিত্র চরিত্রের মেলা বসিয়েছেন এই ৩১২ পৃষ্ঠার সুপাঠ্য বইটিতে। শ্রেণীসাদৃশ্যের বিচারে গার্ডনার কিংবা চেস্টারটনের চরিত্রায়ণগুলির সঙ্গে লেখকের এই গুলির মিল আছে। তবে পরিমল গোস্বামীর তথ্যনিষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক শব্দচেতনা এই দুই ইংরেজ রম্য-লেখকের চাইতেও অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।···

গ্রন্থ **পরিক্রমা,**

···গ্রন্থটির মধ্যে একই সঙ্গে দ্রষ্টা এবং সচেতন ইতিহাস স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গতার হৃদ্য আস্বাদনের পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। যাঁরা ইতিহাস-সচেতন তাঁদের জন্যও পরিমলবাবু সাল তারিখের যথাযথ উল্লেখ করেছেন—যা পরবর্তীকালের গবেষকদের নিকট নিঃসন্দেহে পাথেয় হিসাবে গণ্য হবে। পরিমলবাবু বিভূতিভূষণের চরিত্রের দুটি বিপরীত সত্তাকে যেভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন তা তুলনা রহিত। একান্ত-সুহৃদ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর স্মৃতি-চিত্রণের আপাত-নিরাসক্ত ভঙ্গীর মধ্যেও লেখকের অশ্রুসজল হৃদয়টি পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের যাঁরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তাঁদের জীবনের অনেক বেদনাময় কিম্বা কৌতুককর ঘটনা লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বিরাট ব্যক্তিত্ব কিন্তু অধুনা প্রায়-বিস্মৃত দু'একজন লেখক সম্পর্কে পরিমলবাবুর বেদনাভরা উক্তি পাঠককে নাড়া না দিয়ে পারে না···

সুধীরকুমার চৌধুরী

···দেখার মত করে দেখতে হলে, উঁচু থেকেও নয়, নীচের থেকেও নয়, কতকটা সমকক্ষতার স্থান থেকে দেখতে হয়, লেখক সেটা জানেন। এবং তাঁর দেখবার ক্ষমতাতে যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সে সম্বন্ধেও তিনি অবহিত। নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখক বলছেন 'আমার মনে হয় বাইরের লোক হিসাবে আমি তাঁকে যেভাবে বুঝতে পারি অন্য কেউ ঠিক তেমন পারেন না'—এই ধরনের কথার মধ্যে আত্মম্ভরিতা নেই, যা আছে তা হল এই আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয়। 'আমি যাঁদের দেখেছি' বইয়ের যে 'আমি'—তিনি এই আত্মপ্রত্যয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। যাঁদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে লিখবার এই আত্মপ্রত্যয়-জাত অধিকার অর্জিত করে তবে তিনি কলম ধরেছেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ি সম্বন্ধে রচনাটিতে লেখক বলছেন—

আমি যে কজন ব্যক্তিকে একটু বেশি নিবিড়ভাবে দেখেছি, তাঁরা সবাই আমার চোখে কোনো-না-কোনো দিকে স্বতন্ত্র। তাঁরা সাধারণের চেয়ে ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগেনি, স্বতন্ত্র, এইমাত্র।

···যাঁদের নিয়ে বই, তাঁদের মধ্যে কবি-সাহিত্যিকদের সংখ্যা বেশি কিনা, কিংবা কেন, এ বিচার অনাবশ্যক। নিজে কাব্যরসিক ও সাহিত্যিক বলে লেখক তাঁদের সংস্পর্শে বেশি এসেছেন এবং বইটিতে তাঁরাই সেই কারণে গরিষ্ঠ।··

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

আমি আবার বলছি সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকবার সুযোগ পেলে তাঁকে কি এ রকম করে পেতাম? আমার টুকরো একটুখানি দেখা, আর-এক টুকরো দেখার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে পুরো দেখা। অনেকগুলি খণ্ড দেখা ও পাওয়ার মিলনে সমগ্রের অনেকখানি বিস্তার।

এই একটুকরো একটুখানি দেখার সঙ্গে আর একটুকরো দেখা মিলিয়ে রবীন্দ্রচরিতের একটি দিকে এমন একটি আলোকপাত করেছেন যাতে চমৎকৃত হতে হয়।···

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রসঙ্গে লেখক লিখছেন—

আমাকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাউকে আবিষ্কার করতে হয়নি। আমার কাছে যাঁরা নিজগুণে প্রকাশিত হয়েছেন শুধু তাঁদেরই আমি দেখেছি। বিচিত্র লোকের হাটে ঠেলাঠেলি করে প্রবেশ করিনি, তবু যা দেখেছি তা বিচিত্র।

চরিত্রগুলির মধ্যে এই বিচিত্রতা আছে বলেই বইটি এত উপভোগ্য হয়েছে। যে মানুষগুলিকে নিয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক আকাশ একদিন ঝলমল করত তাঁদের অনেকেই উপস্থিত এ বইয়ে, কিন্তু এটা লক্ষ্য করার

মত যে তাঁদের কেউ একজন আর-একজনের মত নয়। সাদৃশ্য যাঁদের মধ্যে লেখক দেখেছেন তাঁদের মধ্যেও অমিল দেখেছেন বেশি।…

জীবনীকারের কাজকে বলা হয়েছে ungentle art, নির্বিচারে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করলেও কেউ তাঁদের দোষ দিতে পারে না…কিন্তু 'আমি যাঁদের দেখেছি' বইটির লেখকের কাছ থেকে ungentle কিছু আশা করা বৃথা। মানুষকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখা যত সহজ, দেখানো তত সহজ নয়, 'এ সম্বন্ধে সব কথা ত বলা হল না যদি এই ভাব পাঠকের মনে থাকে। তাঁর দেখা প্রতিটি মানুষকে নিয়ে লেখক সেই দুরূহ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছেন। এটা তিনি পেরেছেন কতটা মানুষগুলির গুণে আর কতটা তাঁর নিজের গুণে, সেটা বলা সহজ নয়। ধরে নেওয়া যাক দুদিকের গুণেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

মানুষগুলি খুব বেশি স্বতন্ত্র বলেই তাঁদের পক্ষে লেখকের ব্যবহার, অর্থাৎ তাঁদের নিয়ে আলোচনার গতিপ্রকৃতিও আলাদা ধরনের। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি।

কাজি নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে…'বিদ্রোহী' কবিতাটি কেন এলোমেলো, কেন তাতে বাড়াবাড়ি সে বিষয়ে লেখক যা বুঝেছেন তা খুব জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্যগুলি খুবই প্রণিধানযোগ্য।…

অপর দিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে রচনাটির প্রায় সবটাই নিছক চরিত্রচিত্রণ। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর সুসম্পূর্ণ নিটোল ও পরম উপভোগ্য রচনা আর কোথাও পড়িনি। লেখার গুণে বিভূতিভূষণ মানুষটি যেন বইয়ের পাতায় জীবন্ত হয়ে বিচরণ করছেন। মানুষটিকে ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা জানতেন তাঁরাই অনুভব করবেন, বইটিতে যাঁকে পাওয়া যাচ্ছে তিনি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না, এবং তিনি আদ্যোপান্ত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুই প্রান্তবর্তী দুরকমের রচনার কথা বলা হল। এর মধ্যবর্তী অন্য রচনাগুলিতে কম বেশি বিভিন্ন পরিমাণে আছে ব্যক্তিগত পরিচয়-সূত্রে চরিত্র বিশ্লেষণ, প্রতিভা-পরিচিতি, কৃতির মূল্যায়ন, কিছু কিছু উদ্ধৃতি ও প্রচুর প্রত্যক্ষ-করা ঘটনার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা। এইগুলির মধ্যে যেগুলি রসিয়ে বলবার মত সেগুলিকে লেখক যেরকম করে বলেছেন, সেরকম করে বলবার ক্ষমতা আজকের দিনে বাংলা দেশে খুব অল্প লেখকেরই আছে।…

এবার সর্বাঙ্গিকভাবে বইটি সম্বন্ধে দুটি কথা বলে শেষ করব। প্রথম কথা, মানুষ সম্বন্ধে প্রভূত interest—যে কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ নেই,

প্রখর স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মন, এবং ক্ষমাগুণ, যার থেকে নীর ত্যাগ করে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করবার প্রবৃত্তি জন্মায়, এই সব না থাকলে আলোচ্য বইটির মত বই লেখা যায় না। দ্বিতীয় কথা, সর্বদোষমুক্ত প্রাঞ্জল গদ্য রচনায় পরিমলবাবু সিদ্ধহস্ত, এ বিষয়ে বাংলা দেশে আজকের দিনে তাঁর জুড়ি প্রায় নেই।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

দীর্ঘকাল বাদে এমন একটি বই পড়লাম যাতে উপন্যাসের মনোজ্ঞতার সঙ্গে প্রবন্ধের মনীষার মেলবন্ধন ঘটেছে। প্রকৃতি-বিচারে 'স্মৃতিচিত্রণ'-জাতীয় রচনা হলেও চিত্রিত লেখক ও মনীষীদের সম্পর্কিত নানা তথ্যে এটি ইতিহাস গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতি নিয়ে যাঁরা গবেষণা বা আলোচনা করবেন, এই বই তাঁদের বিশেষ সহায়ক হবে। আলোচ্য বইটি ইতিহাস আরও এক কারণে: এতে এমন দুচারজনের চিত্র আছে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের কাছে যাঁরা অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত। বিহারীলাল গোস্বামী এবং বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট বাঙালীকে বিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে লেখক ঐতিহাসিকের কর্তব্য পালন করেছেন। অন্য পক্ষে শিশিরকুমার ভাদুড়ি ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো পরিচিত বাঙালীর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য তাঁর কলমে আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।···

'আমি যাঁদের দেখেছি' বইটির পাঠকের আনন্দজনক লাভ, প্রত্যেকটি চরিত্রই স্ব স্ব ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে তাঁর সামনে উপস্থিত। লেখকের এইখানেই সর্বাধিক কৃতিত্ব। দা ভিঞ্চির ছবির মানুষগুলির মতো পরিমল গোস্বামীর এই চরিত্রগুলিও আত্মতায় স্পষ্ট, স্বাতন্ত্র্যে সুচিহ্নিত।···

'আমি যাঁদের দেখেছি' একটি প্রাণবন্ত চিত্রশালা যে-চিত্রশালায় দোষে-গুণে গড়া এমন কয়েকজন খাঁটি মানুষের সাক্ষাৎ মেলে যাঁরা ক্রমশ দুর্লভ হয়ে আসছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে এই বিশিষ্ট বাঙালীদের সম্পর্কে বলা যায়, এখন আর খাঁটি বাঙালী জন্মে না, জন্মিবার যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাঙালীদের জন্য এই স্মৃতিচিত্র রচনা করে পরিমল গোস্বামী তাঁর কাছে আমাদের ঋণী করে রাখলেন।